গজমুক্তা

নারায়ণ সান্যাল

বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

"ওরা চুম্বনের কায়দাও জানে"

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় জাম্বো

"জাম্বো বার্নাল-সাহেবকে 'এপ্রিলফুল' করছে!"

আম্বোসেলীর পাগলা জগাই
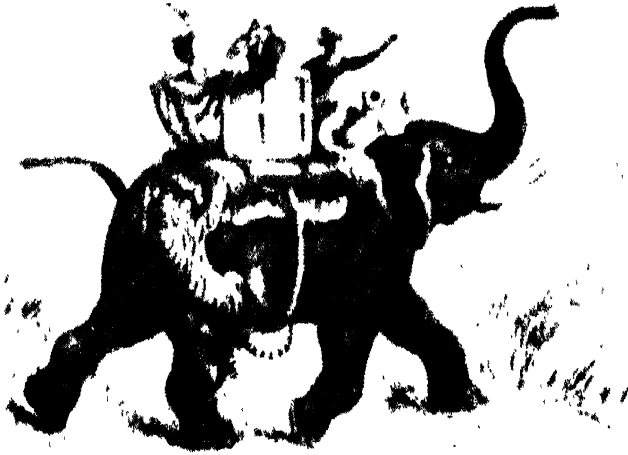
উইলিয়াম জার্ডিন-এর গ্রন্থে হাতীর ছবি

WHY PART WITH JUMBO

THE PET OF THE ZOO.
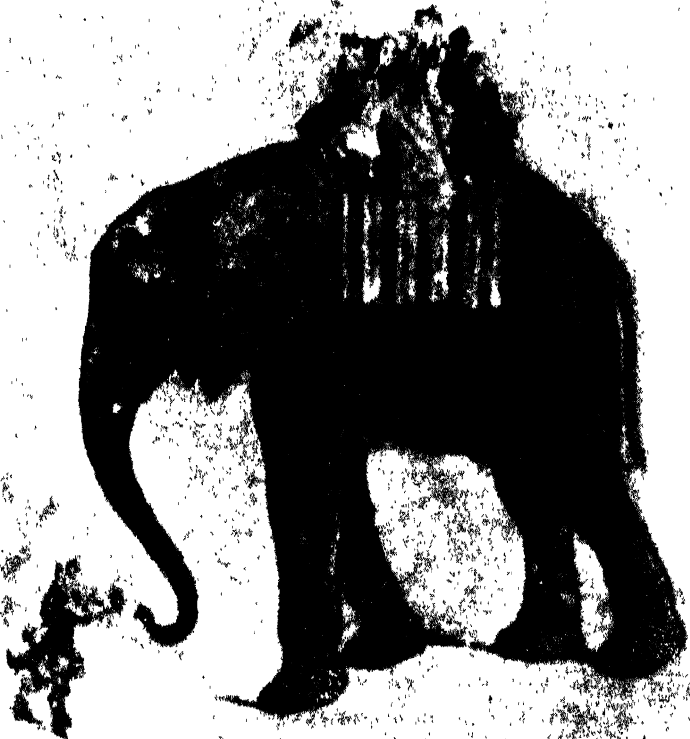
C. H. MACDERMOTT. E. J. SYMONS

'জাম্বো-বিদায়'-এর প্রতিবাদে প্রকাশিত কার্টুন

হাতী যে-কয়টি জীবনে দেখেছি তা চিড়িয়াখানায়, সার্কাসে অথবা মেলায় —সবই পোষা হাতী ; জংলীহাতীও যে না দেখেছি তা নয়, তবে সিনেমার পর্দায়। বাস্তবে নয়। ফলে জংলীহাতীর সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসা আমার ক্ষেত্রে নেহাৎ অনধিকার চর্চা। গহন অরণ্যে যারা হাতী ধরে, পোষ মানায়, সেই সব ফান্দী, দাইদার, মাঝি, জমাদারদেব জীবনের অংশীদার হবার সুযোগ আমি কখনও পাইনি। তাদের জীবনে জীবন যোগ করে হাসি-অশ্রুর ভাগীদার হবার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি। সে হিসাবে, বলতে পারেন, এ আমার নিছক 'সৌখিন মজদুরি'। এ-কথা প্রথমেই অকপটে স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

তবু প্রত্যক্ষ না-হলেও অপরের মাধ্যমে মাঝে মাঝে এমন সব পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ আসে যখন পাঁচজনকে ডেকে সে-কথা না বলা পর্যন্ত প্রাণটা শান্ত হতে চায় না। এমনই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সম্প্রতি। সে-কথা জানাতেই এই কলম ধরেছি। কাহিনীটা সংগ্রহ করেছিলাম নিতান্ত ঘটনাচক্রে একজন বিদেশীর কাছে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। সে-কথাই বলি :

অফিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ টেলিফোন করল সমব বাগচী। বললে, তার পরিচিত একজন ফরাসী ভদ্রলোক ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন— দু'দিন পরেই য়ুরোপ ফিরে যাচ্ছেন। সে-রাত্রে কলকাতার একটি বিখ্যাত নাট্যশালায় একটি ফরাসী ব্যালে নাচের অনুষ্ঠান হবার কথা। ঐ ভদ্রলোক সেটি দেখতে চান। সমর খোঁজ নিয়ে জেনেছে সমস্ত টিকিটই অগ্রিম বিক্রী হয়ে গেছে। ও জানতে চায়—ঐ ভদ্রলোকের জন্য আমি একটি টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারি কি না।

প্রথমতঃ সমর সম্পর্কে আমার জামাই, দ্বিতীয়তঃ এ-জাতীয় অনুরোধ সে ইতিপূর্বে কখনও করেনি এবং তৃতীয়তঃ ভদ্রলোক বিদেশী। তাই কথা দিতে হল—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত এই নাট্য-শালাটির মেরামতির দায়িত্ব ছিল আমার। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের ধারণা ঐ সূত্রে আমি নিশ্চয় কম্প্লিমেণ্টারি টিকিট পেয়ে থাকি। সেটা যে ভ্রান্ত ধারণা এ-কথা বলতে যাওয়া বৃথা—কারণ কেউ সেটা বিশ্বাস করবে না। মেনে নেবে, মনে নেবে না। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। অনুষ্ঠানটি সস্ত্রীক দেখব বলে অনেক আগেই দু'খানি টিকিট আমি

কেটে রেখেছিলাম। সমরের লাইন কেটে দিয়ে তাই বাড়িতে একটি টেলিফোন করলাম। আমার সমস্যার কথা খুলে বললাম—অনুরোধ করলাম, তাঁর টিকিটখানি দান করে যদি তিনি আমাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করেন। জানি, একটু মনঃক্ষুণ্ণ তিনি হবেনই—তবু বিদেশীর কথা চিন্তা করে নিশ্চয়—আর তাছাড়া সমর আমার জামাই তাঁরই সম্পর্কে। ফলে অনুমতি পাব এ বিশ্বাস ছিল। পেলামও তাই। এক কথাতেই উনি বললেন,—আমার টিকিটটা তুমি ওঁকে দিয়ে দাও।

আমি ধন্যবাদ জানাব কিনা বুঝে উঠতে পারি না। ইতস্ততঃ করে টেলিফোনে বলি, বাঁচালে আমাকে! তাহলে সমরকে ফোন করে দিই ?

—নিশ্চয়! ফরাসী ভদ্রমহিলাকে বঞ্চিত করা কিছুতেই চলে না।

আমি আঁৎকে উঠি। তাড়াতাড়ি বলতে যাই, ভদ্রমহিলা নয়, ভদ্রলোক।

কিন্তু তার আগেই ও-প্রান্তের টেলিফোন রিসিভারে ফিরে গেছে।

সমরকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম যে, একটি টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছে। সে যেন ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে সন্ধ্যা ছ'টার সময় প্রেক্ষাগৃহে চলে আসে। আমি অফিস থেকে সোজা যাব।

আলাপ হল মঁসিয়ে ক্যুভিয়ের সঙ্গে। অমায়িক আলাপী মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি মনে হল। ঠিক কত তা বুঝে উঠতে পারি না। বিদেশীদের বয়স আন্দাজ করতে প্রায়ই আমার ভুল হয়। চোখ দুটি নীল, চুলগুলি দীর্ঘ, ঘাড়ের কাছে পড়েছে. চোখে রিমলেস্ চশমা। ঠোট দুটি টুকটুকে লাল, পাতলা—মেয়েদের ঠোট বলে ভুল হয়। কিন্তু না। দিব্যি পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফও আছে।

প্রথম পরিচয়ে ফরাসী ব্যালে-নাচ সম্বন্ধে এমন সুন্দর ও মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন যে, আমার স্বতই মনে হল উনি এ-পথের পথিক। ব্যালে-নাচের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন, ফরাসী ব্যালে-নাচের উপর সে-দেশের লোক-সঙ্গীত ও মার্গ-সঙ্গীতের প্রভাব, বিভিন্ন নাচের মুদ্রার ব্যঞ্জনা এমন সুচারু বিশ্লেষণে উনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, আমি অভিভূত হয়ে প্রশ্ন করি, আপনি কি নিজেই ব্যালে-নাচে অংশ গ্রহণ করেন ?

উনি হেসে উঠে বলেন—না, না, আমি ডাক্তার, মানে চিকিৎসক।

দুটি নাচের মাঝখানে বিরতি হয়েছিল। ঘোষক জানিয়েছেন, দশ মিনিটের বিরতি। ভদ্রলোক বলেন, অনেকটা সময় আছে, চলুন আমরা 'বার'-এ গিয়ে বসি।

বললাম, দুঃখিত। এখানে কোনও আসবাগার নেই। কফি অবশ্য খাওয়াতে পারি, যদি তাতে রাজী থাকেন।

—তাই চলুন। অভাবে কফিই সই। আসলে ধূমপানের নেশা চেগেছে আমার।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে 'ফয়ারে' বেরিয়ে এসে বলি, মঁসিয়ে ক্যুভিয়ে, আপনি এমন সুন্দর বাঙলা শিখলেন কেমন করে?

হেসে বলেন, প্রায় চার বছর আছি আপনাদের এই ক'লকাতায়।

প্রশ্ন করলাম, কেমন লাগল আপনার ক'লকাতা শহরকে?

হেসে বলেন, 'ক'লকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'

রসবোধ আছে ভদ্রলোকের। জীবনানন্দের কবিতার ঐ ক্যাপশান দিয়ে কয়েকটি বড় বড় সাইন-বোর্ড সম্প্রতি টাঙানো হয়েছে শহর ক'লকাতায়। সেটা শুধু নজর করে মনে রেখেছেন তাই নয়,—কথার পিঠে আমাকে সময়মত শুনিয়েও দিলেন।

বিদেশী না হলে হয়তো কথার পিঠে আমিও বলতাম—হবে নয় মঁসিয়ে, ক'লকাতা প্রতি বর্ষায় এখনও 'কল্লোলিনী' হয়।

ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলি, ক'লকাতায় চার বছর ধরে কি করছেন?

—এসেছিলাম আন্তর্জাতিক রেডক্রশের চিকিৎসক হিসাবে। সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম আপনাদের ভাষাটা শেখার পর। ছিলাম ফরাসী কনস্যুলেটে। এখন সে কাজেও ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি।

আমি কৌতূহলী হয়ে পড়ি। ফরাসী ব্যালে-নাচ সম্বন্ধে ওঁর আলোচনা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না ভদ্রলোক এ্যানাটমি আর ফিজিওলজি ঘাঁটা মানুষ। কিন্তু এত স্বল্প-পরিচয়ে আর কোন অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করা অসৌজন্যমূলক হবে মনে করে কৌতূহল দমন করতে হল। ক্যুভিয়ে প্রসঙ্গান্তরে এসেছেন ততক্ষণে। 'ফয়ারে' কাচের ওপর আঁকা কতকগুলি ভারতীয় নাচের মুদ্রা ও ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর। আমার কাছে প্রশ্ন করে একে একে জেনে নিতে থাকেন—কোন্‌টা ভারতনাট্যম্, কোন্‌টা কথক, কথাকলি অথবা মণিপুরী। কী তাদের বৈশিষ্ট্য, কোন্ অঞ্চলে কোন্‌টি প্রচলিত।

ঘণ্টা বাজল। আমরা বিরতি-শেষে প্রেক্ষাগৃহে ফিরে এলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হলে মঁসিয়ে ক্যুভিয়ে আমাকে বিদায় জানাবার সময় বারে বারে করমর্দন করে বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকদিন পরে স্বদেশের নাচ দেখলাম। আপনারই সৌজন্যে। আপনার স্ত্রীকে আমার হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবেন—

অবাক হয়ে বলি, মানে?

—আমি জানি মঁসিয়ে সান্যাল—কীভাবে আপনি টিকিটখানি সংগ্রহ করেছেন। বাগচী আমাকে বলেছে—

কী কাণ্ড! সমরের যেমন বুদ্ধি! এ-কথা ওঁকে বলার কী দরকার ছিল?

বলেন, খবরটা এত দেরিতে পেলাম যে, প্রত্যাখ্যান করারও তখন সময় নেই। বুঝলাম, প্রত্যাখ্যান করলেও মিসেস্ সান্যাল 'হল'-এ এসে পৌঁছতে পারবেন না, সীটটা খালিই পড়ে থাকবে।

বাধা দিয়ে বলি, আরে না, না,—সে নিজেই আসতে চাইছিল না।

উনিও আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সৌজন্যের খাতিরে আর ডাহা মিথ্যে কথাটা না-ই বা বললেন, মঁসিয়ে সান্যাল।···আচ্ছা, থাক থাক। আর আপনাকে বিব্রত করব না। আসুন—

মনিব্যাগ খুলে একটি নামাঙ্কিত ভিজিটিং কার্ড আমাকে দিলেন।

হেসে বলি, বাঁচালেন! আপনি নিজে থেকে না দিলে আমাকে এটি চেয়েই নিতে হত! এটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার।

আমিও আমার কার্ড ওঁকে দিলাম। সেটা পকেটস্থ করতে করতে বলেন, প্রয়োজন তো ছিলই—ওটুকু না থাকলে প্রয়োজন হলেও আর যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে না।

বললাম, সেজন্য নয় মঁসিয়ে। আমার স্ত্রীর ধারণা হয়েছে আজ আমাকে যিনি নাচের আসরে সঙ্গ দিলেন তিনি মঁসিয়ে নন, মাদমোয়াজেল। এই কার্ডটা আমার দাম্পত্য রণাঙ্গনের ব্রহ্মাস্ত্র।

এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন ক্যুভিয়ে যে, গৃহপ্রত্যাগত জনস্রোত আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

ক্যুভিয়ে বলেন, এ নিশ্চয় বাগচীর লেগ-পুলিং। সে সম্ভবত আপনার স্ত্রীকে টেলিফোন করে এই ভ্রান্ত সংবাদটি দিয়েছে।

—হতে পারে। যাক, এখন আর আমার ভয় নেই।

ক্যুভিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ে বলেন, আমার একটি ছোট্ট অনুরোধ আছে। রাখবেন?

—বলুন, বলুন—নিশ্চয় রাখবার চেষ্টা করব।

—আমি আর দিন-চারেক পরেই পারীতে ফিরে যাচ্ছি। কাল সন্ধ্যায় আমি ফ্রি আছি। আপনি দয়া করে আমার এ্যাপার্টমেণ্টে একবার আসতে পারবেন? 'ব্যাচিলার্স-ডেন', না-হলে আপনাকে সস্ত্রীকই আসতে বলতাম।

—তা তো বুঝলাম; কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—আপনার হাতে ম্যাডাম সান্যালের জন্য সামান্য কিছু উপহার পাঠাতে চাই। না, না, তেমন কিছু নয়, খানকয়েক ফটো।

—ফটো তোলার বাতিকও আছে নাকি আপনার ?

—তা আছে। শুধু ফটো তোলা নয়, আরও অনেক বাতিক আছে আমার। লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ, জংলী জীবজন্তুর কণ্ঠস্বর টেপ-রেকর্ড করা ইত্যাদি। এক-কালে শিকারেরও বাতিক ছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছি। যে ফটোগুলি আপনাকে দেব তা-ও দুর্লভ সংগ্রহ। গভীর অরণ্যে টেলি-ফোটো লেন্সে তোলা। রীতিমত প্রাণ হাতে নিয়ে সেগুলি তুলেছি—আফ্রিকায়, বর্মায় ও ভারতবর্ষে।

—কি জাতের ফটো ? বিষয়বস্তু কী রকম ?

—ধরুন, বাঘের বাচ্ছা মায়ের দুধ খাচ্ছে, দুটি সিংহের লড়াই, চিতাবাঘ একঝাঁক গ্যাজেলকে তাড়া করেছে, কিংবা জেব্রা জেব্রানীকে প্রেম নিবেদন করছে। এ ছবি পয়সা দিয়েও আপনি কোথাও কিনতে পাবেন না।

—এমন সব দুর্লভ ছবি আমাকে দিয়ে দেবেন ?

—কী আশ্চর্য ! আমি তো নেগেটিভ দিচ্ছি না !

—সব ছবিই আপনি নিজে হাতে তুলেছেন ?

—সব। শুধু এই নয়—একটা অদ্ভুত ফটোর কপি আপনাকে দেব। আমার বিশ্বাস সেটি পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য ! গজমুক্তার।

—গজমুক্তার !!

—হ্যাঁ ! গজমুক্তা কাকে বলে জানেন ?

বলি, জানি। কিন্তু সে তো নিছক কবি-কল্পনা ! গজমুক্তার ফটোগ্রাফ আবার কি ?

—হ্যাঁ। সেই গজমুক্তারই ফটোগ্রাফ। আমি নিজে হাতে নিজের ক্যামেরায় তুলেছি।

হেসে বলি, মঁসিয়ে ক্যাভিয়ে ! আপনি ডাক্তার, আমি এঞ্জিনিয়ার। ও-সব সাপের মাথার মণি আর হাতীর মাথার মুক্তোর গল্প আপনার আমার জন্য নয়। আপনার মতো জঙ্গলে গিয়ে ফটো না তুললেও ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে আমার বেশ ধারণা আছে। আমিও এমন ট্রিক্ ফটোগ্রাফিতে—

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার হাতখানা টেনে নিয়ে তাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেন, জানি, আপনি বিশ্বাস করবেন না ! আমিও প্রথমটা বিশ্বাস করিনি। নিজে চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না ! সবকথা বলার সময়ও এখন নেই—কাল আসবেন,—বিস্তারিত করে সব বলব। অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতা

সম্প্রতি হয়েছে আমার! আজ শুধু এটুকুই বলছি,—ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি—এ ছবি আমি প্রকাশ্য দিবালোকে একবার মাত্র শাটার টিপে তুলেছি! এ্যাপার্চার: এগারো, টাইম ১/১২৫! আর নিজের ডার্করুমে, নিজে হাতে সরল পদ্ধতিতে ডেভেলপ করেছি, প্রিন্ট করেছি—এ-তে বিন্দুমাত্র ক্যামেরার কারসাজি নেই! বিশ্বাস করেন?

কেমন যেন রোখ চেপে গেল। বললাম, টেবিলের ওপর একটা ন্যাচারাল মুক্তাকে রেখেও তো আপনি ফটো তুলে দেখাতে পারেন—বলতে পারেন এটাই হাতীর মাথার ভিতর পাওয়া গেছে! প্রমাণ করবেন কি করে?

—সে দায় আমার। মুখের কথায় নয়, ফটো থেকেই প্রমাণ পাবেন ওটা ন্যাচারাল-মুক্তা নয়, আর্টিফিসিয়াল নয়—ওটা সেই কিংবদন্তীর গজমুক্তা।

এমন অভিভূতভাবে কথাগুলি উনি বললেন যে, আমি জবাব দিতে পারিনি। উনি যা বলছেন, তা অবিশ্বাস্য। গজমুক্তা যে নিছক একটা কবি-প্রসিদ্ধি এ সামান্য জ্ঞান আমার ছিল। কবি-প্রসিদ্ধিগুলি সবই গাঁজা এটাও জানা ছিল। অজগরের মাথায় মণি অথবা হাতীর মাথায় মুক্তাব অস্তিত্ব এটা বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না। আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তবে চখা আর চখী দু'জনে রাত্রে নদীর দুই পাড়ে যায় কিনা দেখবার জন্য একবার কিশোর বয়সে শোননদীর পাড়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করায় বাড়িতে ধমক খেয়েছিলাম মনে আছে। চাঁদনি রাতে দেখেছি তারা দিব্যি দু'জনেই এক পাড়ে রাত কাটাচ্ছে! সেই বয়স থেকেই বুঝে নিয়েছি কবিতায় বা সাহিত্যে ওগুলো দিব্যি চালানো যায়—বাস্তব জগতে ওদের মানা চলে না। কিন্তু এ ভদ্রলোক এমন দৃঢ়স্বরে এ-কথা বলছেন কেমন করে? অশিক্ষিত গাঁয়ের মানুষ নন। এই নাট্যশালার ধারে-কাছে যে 'বার' নেই সে-কথা আগেই বলেছি, ভদ্রলোক সুস্থ-মস্তিষ্ক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। তা-ছাড়া সন্ধ্যাকাল থেকে উনি যে মদ্যপান করেননি তার 'এ্যালেবি' আমি নিজে। তাহলে?

আমার হাতটা ধরাই ছিল ওঁর মুঠিতে। সামান্য একটু চাপ দিয়ে এবার সেটি ছেড়ে দিলেন। বললেন, আফিস-ফেরত সোজা চলে আসুন আমার এ্যাপার্টমেন্টে। আমার ফটো-এ্যালবাম দেখাব, আমার টেপ-রেকর্ডারে গণ্ডারেব গান শোনাব, আর ঐ গজমুক্তার ফটো কেমন করে তুলেছি সে গল্পও আপনাকে শোনাব।

এ দুর্লভ সুযোগ আমি গ্রহণ করেছিলাম সানন্দে। তারই ফলশ্রুতি আমার এই সৌখিন-মজদুরি।

কাহিনীর প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য কিন্তু হিংস্র শ্বাপদ-সমাকীর্ণ বনভূমি নয়, আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গীর একটি খানদানি হোটেলের বাতানুকূল করা ব্যাঙ্কোয়েট 'হল'। গোপন-উৎস থেকে বিচ্ছুরিত কৃত্রিম আলোয় ঝলমল করছে চারিধার। কক্ষে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশজন সুবেশ নরনারী—অভিজাত সম্প্রদায়ের। তাঁরা বসেছেন বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এক-এক টেবিল ঘিরে ছোট ছোট জটলা। সায়মাশের আয়োজনটা করেছেন একটি সর্বভারতীয় সংস্থা, যার সভ্য হচ্ছেন এই মহান উপদ্বীপের বিখ্যাত শিকারীর দল। বছরে একবার ওঁরা মিলিত হন, শিকার মরশুমের পরে—কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই অথবা বাঙ্গালোরে। এবার অধিবেশন হচ্ছে কলকাতায়। শিকারীদের সুবিধা-অসুবিধা, বন্যসম্পদ সংরক্ষণের আয়োজন, বন্যজন্তুর অবাধ শিকার নিয়ন্ত্রণ, মাইগ্রেটরি পাখিদের সম্বন্ধে নানান তথ্য ইত্যাদি গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তা ক্লাব-কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্য সরকারী দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে আঞ্চলিক কমিটিতে নানান বিষয় আলোচনা হয়—তা থেকে বাছাই করা কিছু বিষয় পুনরালোচিত হয় এই বাৎসরিক সমাবর্তনে। এ সংস্থার সভ্য-পদ লাভ করা বড় সহজ নয়। এককালে রাজা-মহারাজা, নবাব এবং সরকারী হোমড়া-চোমড়া ছাড়া আর কেউ সভ্যপদবাচ্য হতে পারতেন না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে আমলের অ-সভ্য শ্রেণীর লোকও বর্তমানে 'সভ্য' হচ্ছেন, কিন্তু তাও বড় সহজ নয়। প্রথমতঃ ব্যয়সাধ্য, দ্বিতীয়তঃ সুপারিশের প্রয়োজন। ফলে দরজা সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকা সত্ত্বেও রীতিমতো উচ্চকোটির জীব ছাড়া আর কেউ ও-পাড়ায় কল্কে পান না।

দু'দিনব্যাপী শিকার ও বনসম্পদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের পরে আজ এই সান্ধ্য ডিনার-টেবিলে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হবে। আহারান্তে মার্টিনী-সহযোগে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আড্ডা দেওয়াও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এর পোশাকী নাম নাকি 'গ্রুপ-সেমিনার'।

আমাদের ক্যামেরা যদি লঙশট ছেড়ে মিডশটে এগিয়ে আসে, তাহলে আমরা দেখব মেহগনি টেবিলটার চারদিকে জনা-আষ্টেক ভদ্রলোক এবং দু'জন ভদ্রমহিলা ঘন হয়ে বসেছেন। টেবিলটার উপর ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পানপাত্র, সোডার বোতল, বরফের পাত্র আর ছাইদান। অভ্যাগতরা সকলেই বিশিষ্ট লোক এবং বর্তমান ভারতের সব নামকরা শিকারী। ব্যতিক্রমই যে নিয়মের পরিচায়ক তার প্রমাণ হিসাবে আছেন ঐ দু'জন স্লিভলেস মহিলা। সকলের আগে নজর পড়বে বিশালবপু কর্ণেল চোপড়ার ওপর। দশাসই বলিষ্ঠ চেহারা,

রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ—এমনকি কাইজারি গোঁফ জোড়াও যেন রোদে পুড়ে ঝল্‌সে গেছে। কথা বলছিলেন তিনিই। বর্মা-চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে চোপড়া বলেন, আপনারা যা-ই বলুন, শিকারের 'থ্রিল' কিন্তু গত দু-তিন দশকে রীতিমত কমে গেছে। সারা সপ্তাহ জঙ্গল ঠেঙিয়ে একটা নম্বর, তিনটে স্নাইপ আর একজোড়া খরগোশ মারার মধ্যে কোন চার্মই নেই। বুনো হাতী, গণ্ডার, অথবা আর. বি.-র কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, লেপার্ড, বাইসন অথবা বেড়াল-মার্কা বাঘেরও সন্ধান মেলে না আজকাল। এই তো এ সিজনে নীলগিরি ফরেস্টে গিয়ে—

কথাটা তাঁর শেষ হল না। কথার মাঝখানেই নবাব-সাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছি না, কর্ণেল চোপরা। আপনাদের আমলে আপনারা চোখ-বুজে ফায়ার করেছেন আর জীবজন্তু মেরেছেন—প্রায় যে-রকম টিপ্ না-করেই ফায়ারিং স্কোয়ার্ড জনতার ওপর গুলি চালায়! এখন ওরা শুধু সংখ্যাতেই কমে যায়নি, অত্যন্ত ধূর্ত হয়ে উঠেছে। বন্যজন্তুর আদমসুমারি করলে দেখা যাবে ওদের লিটারেসি পার্সেণ্টেজ অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে গেছে! বন্দুকের নলটাকে ওরা সবাই চিনে ফেলে সন্ত্রাক্ষর হয়েছে। এখনই তো শিকারের মজা। একটা চিতার পেছনে অন্তত তিনটে দিন ঘুরতে হয়। ছাগল-বেঁধে মাচায় বসে থাকলে মহাপ্রভুরা তার ধারে-কাছেও আসবেন না। আজকের দিনে একটা আর. বি. ব্যাগ করা আগেকার যুগের তিনটে আর. বি.-র সমান। আমার তো মনে হয় এই টাইম-ফ্যাক্টারটাকে ইন্‌কর্পোরেট করে নূতনভাবে অল-ইণ্ডিয়া রেকর্ড রি-এ্যাডজাস্ট করা উচিত।

মুখটা লাল হয়ে ওঠে বৃদ্ধ কর্ণেলের। কারণ ছিল। সর্বভারতীয় আর. বি.-র রেকর্ডটা এখনও তাঁরই করায়ত্ব। আর. বি.—অর্থাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তিনিই সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক মেরেছেন বলে রেকর্ডে উল্লিখিত আছে।

নবাব-বাহাদুর নবীন শিকারী, কর্ণেল চোপড়া বৃদ্ধ। কিন্তু উভয়েই মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন সে-রাত্রে। ফলে আলোচনাটা একটা বিশ্রী পরিণতিতে শেষ হতে পারে আশঙ্কা করে রাজাবাহাদুর বলে ওঠেন, এ কথাটা কিন্তু আপনার ঠিক হল না নবাব-সাহেব! বন্যজন্তুরা যেমন এ্যালার্ট হয়েছে, মানুষও তেমনি নূতন নূতন পদ্ধতি খুঁজে বার করেছে। এখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জীপ যাবার দিব্যি সব রাস্তা তৈরী হয়েছে। গাড়িতে বসে স্পট-লাইট ফেলে অনেক মহারথী যেভাবে আজকাল শিকার করেন কর্ণেল-সাহেবের আমলে

সে-কথা চিন্তাই করা যেত না। হাতী ছাড়া জঙ্গলে ঢোকাই যেত না। না-কি বলেন কর্ণেল-সাহেব ?

কর্ণেল চোপড়া একগাল হাসলেন। বলেন, ওঁরা তো সে যুগের কথা জানেন না রাজাবাহাদুর !

বাইরের দুনিয়ায় যা-ই হোক, এ অভিজাত পরিবেশে রাজাবাহাদুর, নবাব-সাহেব ইত্যাদি সম্বোধন এখনও দিব্যি টিকে আছে। এ-ছাড়া যেন মেজাজ আসে না।

মিস্টার থাডানি বলেন, করেক্ট ! বন্যজন্তুই শুধু নয়, মানুষের অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। শিকারীরাও বুঝতে শিখেছে বুনো জন্তু-জানোয়ারের হ্যাবিটস্।

থাডানি সাহেব বনবিভাগের একজন অতিবড তালেবর, সরকারী অফিসার। তাঁব সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন কর্ণেল চোপডা। বলেন, নয় ? আমাদের আমলে আমরা তো রীতিমত অজ্ঞানের অন্ধকারে বাস কবতাম। এক্বার মনে আছে বর্ষার জঙ্গলে খবর পেলাম একটা অজগরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মাথায় নাকি মণি জ্বলে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনে আমার অতি প্রিয় থি সেভেন্টি-ফাইভ হল্যাণ্ড এ্যাণ্ড হল্যাণ্ড ডবল ব্যারেলটা নিয়ে তখনই দৌডালাম সেই সাপের সন্ধানে। সাপটা মারা পড়ল, কিন্তু মণির খোঁজ পেলাম না। আজ আপনারা কেউ ওভাবে ছুটবেন সাপের মাথার মণির খোজে ?

মিসেস্ থাডানি ছোট্ট খুকিটির মত খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন। বলেন, ও ! হাউ নটি ! আপনি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন আপনি সপ্তদশ-শতাব্দীর শিকারি ! মাপ করবেন কর্ণেল চোপডা, আপনাকে দেখে মনে হয় না দেড-দুশ' বছর বয়স হয়েছে আপনার।

—মানে ?

—আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ন্যাচারাল-সায়েন্স এত আণ্ডার-ডেভেলপ্‌ট ছিল না যে, একজন সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ বিশ্বাস করবে যে, সাপের মাথায় মণি থাকতে পারে !

ও-কোণায় এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজকুমার আচার্যচৌধুরী। এককালে নামবরা শিকারী ছিলেন। এখন ও-সব সখ আর নেই। বয়স দেখে বোঝা যায় না উনি আজও কেমন করে রাজকুমার রয়ে গেছেন ; কিন্তু সেটাই তাঁর পরিচয়। এখানে সবাই ওঁকে মেজকুমার বলে জানে। শিকার করা ছেড়ে দিয়েছেন চার দশক আগে, তবু আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন।' চুপচাপ

বসে শুনছিলেন এতক্ষণ। এবার হঠাৎ বলে ওঠেন, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিসেস্ থাডানি! আমাকে আজও যদি কেউ বলে যে, সে সাপের মাথায় মণি দেখেছে তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়াব সেই সাপের পেছনে—

—তা দৌড়াবেন, কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে নয় নিশ্চয় যে, সাপটার মাথায় মণি আছে! সাপের লোভেই দৌড়াবেন—

—তা বলা যায় না। হাতীর মাথায় যদি গজমুক্তা থাকতে পারে, তাহলে অজগরের মাথাতে 'মণি' থাকাই বা অসম্ভব হবে কেন?

নবাব-সাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান! আপনার যুক্তিটা ঠিক আমার মগজে ঢুকছে না। আগে হিসাব করে নিই আপনিই বা ক-পেগ চড়িয়েছেন, আর আমিই বা ক-পেগ চড়িয়েছি!

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। হাসির বেগটা কমলে নবাব-সাহেব বলেন, হাতীর মাথায় গজমুক্তা থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করেন আপনি?

মেজকুমার সংক্ষেপে শুধু বলেন, করি।

—আপনি নিজের চোখে ঐ আজীব-বস্তুটা দেখেছেন? ঐ—গজমুক্তা?

—না। কিন্তু মাথায় গজমুক্তা ছিল এমন হাতী আমি নিজে হাতে শিকার করেছি!

—বলেন কি! তা হাতীটাকে মেরেও আপনি দেখতে পেলেন না যে, তার মাথায় ঐ আজীব-বস্তুটা আছে কি না?

—দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা দেখবার সুযোগ আমার হয়নি।

—তবে কেমন করে জানলেন যে, তার মাথায় গজমুক্তা ছিল?

—আমার স্বর্গগত পিতৃদেব আমাকে সে-কথা বলেছিলেন।

নবাব-সাহেব একটু অসহিষ্ণুর মত মাথা নাড়েন। কিন্তু এতদূর এগিয়ে এভাবে আলোচনাটা থামতে দিতে পারলেন না তিনি। বললেন, উইথ অল্-রেস্পেক্ট টু য়োর লেট-ল্যামেণ্টেড ফাদার, স্যার, তিনিই বা কেমন করে জানলেন যে, ঐ মৃত হাতীটার মাথায় ঐ বস্তুটি ছিল?

মেজকুমার একটু ইতস্ততঃ করে বলেন, তিনি ছিলেন তাঁর আমলে একজন বিখ্যাত শিকারী, এবং হাতীর বিষয়ে সর্বভারতীয় অথরিটি।

—ভেরি ইণ্টারেস্টিং! কেস-হিস্ট্রিটা শোনা যাক।

—বলবার মতো কিছু নয়। তবে শুনতে যখন চাইছেন তখন বলি। আমাদের বাগানে একবার একটা একদন্তের অত্যাচারে অবস্থা খুব চরমে

উঠেছিল। দলছুট্ গুণ্ডা হাতী। বহু লোককে জখম করেছিল। সরকার সেটাকে 'প্রক্লেমড্-এলিফেণ্ট' বলে ঘোষণা করলেন।

মিসেস্ থাডানি প্রশ্ন করেন, একদন্ত মানে কি? হাতীটার কি একটা দাঁত ছিল?

কর্ণেল চোপড়া বুঝিয়ে দেন, যে হাতীর বাঁ-দিকের দাঁত নেই, শুধু ডান দিকেরটা আছে তাকে বলে 'গণেশ', আর যার ডানদিকের দাঁতটা ভেঙে গিয়ে শুধু বাঁ-দিকেরটা অবশিষ্ট আছে তাকে বলা হয় 'একদন্ত'—

আচার্যচৌধুরী এ কথোপকথনে কান দেননি। একভাবে বলতে থাকেন, জন্তুটার পেছনে দীর্ঘদিন ঘুরতে হয়েছিল আমাকে। বহুবার ভুল খবর পেয়ে বৃথাই ছুটোছুটি করেছি বন-জঙ্গলে। যা-ই হোক, শেষপর্যন্ত যেদিন সেটার মুখোমুখি হলাম, সেদিন আমার শিকারী সঙ্গীসাথীরা আর কেউ ছিল না— একমাত্র সঙ্গী ছিল আমার পোষা হাতীর মাহুত ইলিম সর্দার। বাবার আমলের লোক। অত্যন্ত বিশ্বস্ত আর সাহসী। তিনটি বুলেটে একদন্তটা ধরাশায়ী হল। শেষ বুলেটটা যখন তার কানের পাশে গিয়ে বিঁধল, তখন সে আকাশের দিকে শুঁড় তুলে যেভাবে আর্তনাদ করল তাতে মনে হল সে যেন অন্তিম প্রার্থনা জানাচ্ছে।

রাজাবাহাদুর টিপ্পনী কাটেন, রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙও তাই বলেছেন। মৃত্যু-সময়ে শুঁড় ওপরে তুলে শেষ-বৃংহণে হাতী তার অন্তিম প্রার্থনা জানায়—

এবারও এ মন্তব্যে কর্ণপাত না করে আচার্যচৌধুরী বলেন, জন্তুটা 'এলিফ্যান্স ম্যাক্সিমাস্' হিসাবে যথেষ্ট বড়, বারো ফুটের চেয়েও উঁচু। মৃত দৈত্যটাকে ঘিরে গ্রামবাসীরা যখন আনন্দে নাচছে তখন ইলিম সর্দার মুখটা আমার কানের কাছে এনে বলে, একটা জিনিস নজর করেছেন কর্তা? হাতীটার ওপর নিশ্চয় দেবতার নজর আছে—ঐ ছ্যাহেন ওর পিতমটার পানে।

বিস্মিত হয়ে দেখি—সত্যিই মৃত হস্তীটার গজকুম্ভে এইমাত্র কে যেন একটা নীল বৃত্ত রচনা করেছে। কপালের ঠিক মাঝখানে নিটোল গোল, ঠিক আংটির মত। বহু হাতী দেখেছি জীবনে, আমাদের হাতীশালেও তখন গোটা পঁচিশ হাতী ছিল—কিন্তু এমন অদ্ভুত গজচক্র কোনও হাতীর কপালে কখনও দেখিনি। আমাকে ঐভাবে হাতীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে কৌতূহলী জনতার অনেকেই ব্যাপারটা কী তা জানতে চাইল। ইতিমধ্যে আমি অনেকটা সামলে নিয়েছি। দেবতার দৃষ্টির কথা ওদের কাছে বলা চলে না। তাহলে ঐ একটিমাত্র গজদন্তও কেটে নিয়ে যেতে পারব না। তাই—'ও কিছু নয়'

বলে সরে এলাম। ফরেস্ট রেঞ্জারকে খবর পাঠানো হয়েছিল—তার লোক এসে অনুমতি দিলে তবে দাঁতকাটা শুরু হবে। অগত্যা সে-রাত্রে আমরা সেই গ্রামেই থেকে গেলাম। গভীর রাত্রে ইলিমকে নিয়ে আবার সেই মৃত জন্তুটাকে দেখতে গেলাম। আশ্চর্য ! সেই নীল দাগটা আরও স্পষ্ট, আরও নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে ওর কপালে। ইলিম আমার কানে কানে বললে, কর্তা ! আমি হলপ খায়ে কইতে পারি, ইয়ার পিতমের ভিংরি মুক্তা আছে ! আমারে বুড়াকর্তা কইছিল, যে-হাতীর পিতমে মুক্তা আছে তেঁনার মিত্যু হইলে পিতমে গজচক্কর ফুটে ওঠে।

সে যা-ই হোক, আমি ব্যাপারটা চেপে যাই। এসব কথা কাউকে বলিনি। দাঁতটা কেটে নিয়ে ফিরে এলাম তার পরের দিন। আগেই বলেছি, আমার বাবা হস্তিতত্ত্ব নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। মূল সংস্কৃত পুঁথি ঘেঁটে পাঁচ খণ্ডে গজায়ুর্বেদ-সংহিতা তিনি বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর আমলে হস্তিতত্ত্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন সর্বভারতীয় অথরিটি। তাই সমস্ত ব্যাপারটা বাবামশাইকে চিঠি লিখে জানালাম। সে-সময় তিনি ক'লকাতায় ছিলেন। তিনি অবিলম্বে আমাকে উত্তরে জানালেন—'তুমি যে লক্ষণের কথা লিখিয়াছ, তাহাতে অনুমান হয় ঐ হস্তীর গজকুম্ভে দুর্লভ গজমুক্তা আছে। এক-লক্ষ হস্তীর ভিতর একটি হয় ঐরাবৎ বংশীয়, এবং একলক্ষ ঐরাবতের ভিতর এক-টির মাথায় গজমুক্তা জন্মায়। এ অতি দুর্লভ সম্পদ। তুমি ভাগ্যবান, তাই ঐ মহামূল্যবান সম্পদের সন্ধান পাইয়াছ। গজমুক্তার বিবরণ আমি প্রাচীন পুঁথিতে দেখিয়াছি, কখনও তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই নাই। পত্র-প্রাপ্তিমাত্র তুমি ঐ হস্তীর মস্তকটির ভিতর সাবধানে গর্ত করিয়া দেখিবে। অনুসন্ধানের ফলাফল আমাকে জানাইও। গজমুক্তা পাইলে তাহা অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে।'

আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তখনই ছুটে গিয়েছিলাম সেই গ্রামে। এবার আমার সঙ্গে ছিলেন একজন শল্য-চিকিৎসক। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের যাবতীয় যন্ত্রাদি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের আশা পূর্ণ হল না। দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমরা ঐ গ্রামে পৌছবার আগেই ফরেস্ট রেঞ্জার গ্রামবাসীদের সাহায্যে মৃতজন্তুটাকে মাটিচাপা দিয়েছিলেন। সে-কথা আবার বাবামশাইকে চিঠি লিখে জানালাম, জানতে চাইলাম কবর খুঁড়ে জন্তুটাকে বার করব কিনা ! উত্তরে তিনি বারণ করলেন। কারণ ছিল। আমাদের ও-অঞ্চলে হাতী-ধরা, হাতী-পোষা এবং হাতী চালান দেওয়ার ওপর হাজার হাজার লোকের জীবন নির্ভর করে। একদন্তটা ছিল ঐরাবৎ শ্রেণীর হস্তী। এটা সবাই জেনে ফেলেছিল।

ঐরাবৎ হচ্ছে হস্তিকুলে বর্ণ-ব্রাহ্মণ। হাতীকে ওরা ভালবাসে, হাতীর নামে লোকগাথা বানিয়ে দলবেঁধে গান করে, হাতীকে পূজা করে। তাই সদ্য কবর দেওয়া ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর ঐ হাতীকে মাটি খুঁড়ে তুললে গ্রামবাসীদের সেন্টিমেণ্টে আঘাত লাগবে। দেশের রাজা হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীদের এইসব সেন্টিমেন্টকে আমার পিতৃদেব শ্রদ্ধা করতেন। যা-ই হোক, প্রায় পাঁচবছর পরে বাবামশাই আমাকে নিয়ে সেই গ্রামে আসেন। ততদিনে গ্রামের সাধারণ লোক প্রায় ভুলেই গেছে কোন নির্জন মাঠে একটা হাতীকে কবর দেওয়া হয়েছিল। লোক লাগিয়ে মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা হল। আশ্চর্যের কথা, আমরা মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলাম—এই দীর্ঘ পাঁচ বছরেও হাতীটা সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে! চামড়া-মাংস সব অটুট! পচনকার্য শুরুই হয়নি। যেন ডিস্‌ইনফেক্ট করে ওর চামড়াটা দিয়ে কোন দক্ষ ট্যাক্সিডার্মিস্ট একটা স্টাফ্‌ট হাতীর মডেল মাটিতে পুঁতে রেখেছে। গজকুম্ভে সেই চক্রটা তখনও আছে—যদিও সেটা আর নীল রঙের নয়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হয়ে গেছে। আমি জিদ ধরলাম—ওর মাথাটা কেটে স্কালের ভিতরে দেখতে হবে সত্যিই কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু বাবামশাই তাতে রাজী হলেন না। বললেন, এ হস্তী দেবতার অংশে জাত। এ হচ্ছে সুদুর্লভ ঐরাবৎ বংশীয় বর্ণ-ব্রাহ্মণ। একটি সংস্কৃত শ্লোকও তিনি বলেছিলেন, আজও সেটা আমার মনে আছে। বলেছিলেন :

যে কুঞ্জরা পাণ্ডুরা সর্বদেহা সুদীর্ঘশুণ্ডাঃ সিতপুষ্পদন্তাঃ
অলোমসা অল্পভুজো বলাঢ্যমহাপ্রমাণ লঘুপুষ্টলিঙ্গা
বিস্তীর্ণদানাস্তনুলোম পুচ্ছা ঐরাবতস্যাভিজন প্রসূতাঃ ॥

বলেছিলেন, এ সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন। এর দেহাবশেষ মাটিতে মিশে যেতে শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল সময় লাগবে। তার পূর্বে ঐ হস্তীর মৃতদেহে আঘাত করা অমঙ্গলের কাজ হবে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে আমি থাকব না, কিন্তু তুমি থাকবে। তুমি এইস্থানে এসে মাটি খুঁড়ে দেখবে—গজমুক্তা পাও কি না। যদি পাও, তবে সেটি সযত্নে রাখবে। সেটি কখনও বিক্রয় করবে না, বা কোন অলঙ্কারে বসিয়ে কোন নরমানুষ যেন সেটা দেহে ধারণ না করে এটা দেখবে। ঐ মুক্তাটি একটি মুকুটে বসিয়ে সেই মুকুটখানি আমাদের কুলদেবতার মাথায় বসিয়ে দেবে। আর এই পরমধার্মিক হস্তিপ্রবরের কিছু অস্থি নিয়ে মকরসংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেবার আয়োজন করবে—

মিসেস্ থাডানি বলেন, পঁচিশ বছর কি এখনও হয়নি?

মেজকুমার ম্লান হেসে বলেন, হয়েছে। কিন্তু পিতৃ-আদেশ আমি পালন করতে পারিনি। এলাকাটা বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে। আমি আমার প্রার্থনা জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলাম, অনুমতি পাইনি—

নবাব-বাহাদুর বলেন, মাপ করবেন কুমার-বাহাদুর, আপনার গল্পটি রোম্যান্টিক হতে পারে, কিন্তু এ-থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।

আচার্যচৌধুরী বলেন, আমার গল্পটা এখনও শেষ হয়নি নবাব-সাহেব। আমার পিতৃদেব দীর্ঘদিন স্বর্গলাভ করেছেন। ইতিমধ্যে আমি সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে আমার এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম। নাম করলে আপনারা কেউ কেউ হয়তো তাঁকে চিনবেন। তিনি এ ক্লাবের সদস্য নন—তবু ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত হস্তিশিকারী। তবে রাইফেল দিয়ে তিনি হাতী মারেন না, ফাঁস দিয়ে—

বাধা দিয়ে কর্ণেল চোপড়া বলেন, আপনি কি আসামের গৌড়পুরের লালচাঁদ বরগোঁহাইয়ের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, লালচাঁদজী!

—আমি আগেই বুঝেছি। তাঁকে কখনও দেখিনি, তবে তাঁর বীভৎস ফাঁসি-শিকারের কথাটা শুনেছি। এ-ও শুনেছি যে, ঐভাবে হাতী ধরা এখন নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আচার্যচৌধুরী চুপ করে যান। তাঁর মুখটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে।

রাজাবাহাদুর বলেন, এটাকে বীভৎস পদ্ধতি বলছেন কেন? ফাঁসি-শিকারের পদ্ধতিটাই বা কি?

কর্ণেল চোপড়া বলেন, জেম্স্ ব্রুস-এর 'ব্লু-নাইল' ভ্রমণ কাহিনী পড়েছেন? তাতে অনেকটা এই ধরনের নৃশংসভাবে হাতী-ধরার একটা বর্ণনা আছে। যে আদিবাসীরা ঐভাবে হাতী ধরত তাদের নাম এ্যাগাগীয়ার্স (Agageers)। লালচাঁদ ঠিক কী-ভাবে হাতী ধরত জানি না, তবে মোটামুটি শুনেছি এ পদ্ধতিতে জঙ্গলে একটা ফাঁদ পেতে রাখা হয়। তার কি একটা কায়দায় সেই ফাঁসটা বন্য-হস্তীর গলায় আটকে যায়। তখন দু'দিক থেকে দুটো পোষা হাতী ঐ ফাঁসের দড়ি ধরে টানতে থাকে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যখন বন্যহস্তীটা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে তখন সবাই মিলে তাকে খুঁচিয়ে মারে—

মিসেস্ থাডানি তাঁর লিপস্টিক্-রঞ্জিত ঠোঁট দুটি উল্টে বলেন, ঈস! মা গো! আইন করে এভাবে হাতী শিকার করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

কর্ণেল চোপড়া বলেন, আইন করে বন্ধ করা হয়েছে কিনা জানি না, তবে শুনেছি, এভাবে ঐ অঞ্চলে হাতী শিকার করা বন্ধ হয়ে গেছে।

আচার্যচৌধুরী বলেন, পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা আত্যন্ত ভ্রান্ত, কিন্তু উপসংহারটি আপনি ঠিকই বলেছেন। এভাবে হাতী ধরা বন্ধ হয়ে গেছে বটে। আইনের জন্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে—

রাজা-সাহেব বলেন, আমরা কিন্তু মূল কাহিনী থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছি! আপনি বলছিলেন, আপনার বন্ধু লালচাঁদজীকে ঐ গজমুক্তার কথা আপনি জানালেন, তারপর?

—লালচাঁদজী আর তাঁর দাদাই বোধহয় আজকের ভারতবর্ষে হস্তী বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খবর রাখেন। একজনের প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান, একজনের থিয়োরেটিক্যাল। দু'জনেই আসামে গৌড়পুরে তাঁদের নির্জন অরণ্যাবাসে থাকেন। সভ্যজগতে তাঁদের যাতায়াত একেবারেই নেই। তবু হাতীর বিষয়ে কেউ যদি কোন শেষ মীমাংসা করতে চান তবে তাঁকে যেতে হবে ঐ হস্তিতীর্থে। সেই লালচাঁদ হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু। কিশোর বয়স থেকে আমরা দু'জন একসঙ্গে শিকার করেছি। আমার বাবাকে লালচাঁদ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। তাই তাকে সবকথা খুলে লিখলাম, জানতে চাইলাম—'গজমুক্তা' সম্বন্ধে তার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কি না—

আচার্যচৌধুরী হঠাৎ কেমন যেন উদাস হয়ে যান। শুভ্র কেশগুচ্ছের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বাঁ হাতে পানপাত্রটা মুখে তোলেন। মিসেস্ থাডানির বোধহয় সবুর সইছিল না, প্রশ্ন করেন, তিনি জবাবে কী লিখলেন?

এক চুমুক পানীয় গ্রহণ করে আচার্যচৌধুরী একটি সিগারেট ধরালেন। ধীরে সুস্থে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, সে-কথা বললেও তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না, শুধু শুধু উপহাস করবেন আমাকে আর আমার বন্ধুকে—

মিসেস্ থাডানি কিন্তু নাছোড়বান্দা। ছোট আবদেরে খুকিটির মত বলে ওঠেন, না, এখন আমরা ওকথা কিছুতেই শুনছি না। তিনি কি জানালেন বলুন—

—লালচাঁদ আমার চিঠির জবাবে লিখেছিল, তোমার বাবা ছিলেন গজায়ুর্বেদ সংহিতার ভাষ্যকার। এ-বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। যে-হেতু তথ্যগুলো ধূসর পাণ্ডুলিপিতে সংস্কৃতে লেখা তাই সেগুলিকে অবিশ্বাস করতে হবে এমন কোন যুক্তি নেই। গজমুক্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি জানতে চেয়েছ। তোমার একদন্তের মাথায় গজমুক্তা ছিল কি না আমি জানি না। তবে ও জিনিস কবি-কল্পনা নয়—নিছক বাস্তব। আমি সারাজীবনের সাধনায় তার সন্ধান পেয়েছি। তুমি যদি দেখতে চাও, তোমাকেও দেখাতে পারি। চলে এস এখানে। অন্তত মাস-তিনেক থাকতে হবে। সাধনা করতে হবে। অনধিকারীকে ও-জিনিস

দেখানো মানা। একেবারে কৈশোরকালে তোমার সঙ্গে শিকারে হাতেখড়ি হয়েছিল আমার। তোমার বাবার কাছেই। মনে পড়ে? এ গজমোতির মালা তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আমি তৃপ্তি পাব। আসবে?

আবার চুপ করে যান বৃদ্ধ শিকারী।

নবাব-সাহেব তাগাদা দেন, গিয়েছিলেন আপনি?

আবার এক চুমুক পানীয় গ্রহণ করে বৃদ্ধ হেসে বলেন, না! তবে আমি বিশ্বাস করি—লালচাঁদ আমাকে মিছে কথা লেখেনি।

—গিয়ে দেখে এলেন না কেন?

বৃদ্ধ ম্লান হাসলেন।

মধ্যরাত্রে অধিবেশন যখন শেষ হল তখন চৌরঙ্গী জনবিরল হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী গাড়ির আনাগোনা। বৃদ্ধ আচার্যচৌধুরী একটা খালি ট্যাক্সি ধরবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন, হঠাৎ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল একখানা মোটর। নেমে এলেন একজন বিদেশী ভদ্রলোক। বললেন, মঁসিয়ে চৌধুরী, আমরা একই টেবিলে নৈশ-আহার করেছি, তবু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দু'জনের পরিচয় হল না। আমার নাম জাঁ ক্যুভিয়ে—

বৃদ্ধ আচার্যচৌধুরী ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুশি হলাম।

—আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে আমার গাড়িতে উঠে বসুন। আপনাকে আমি পৌছে দিই।

বৃদ্ধ বলেন, না, না—এমনিতেই যথেষ্ট রাত হয়ে গেছে। আপনার আরও দেরি হয়ে যাবে—

ক্যুভিয়ে হেসে বলে, যাক। আমার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে জেগে নেই। তাছাড়া আপনার উপকার করবার জন্যই এ আমন্ত্রণ করছি না। আমার নিজেরও একটা গরজ আছে। আসুন আপনি।

অগত্যা আর দ্বিরুক্তি না করে বৃদ্ধ উঠে বসেন চালকের সীটের পাশে। ক্যুভিয়ে একটি সিগারেট অফার করে নিজেও একটি ধরায়। কোন্‌দিকে যাবেন জেনে নিয়ে স্টার্ট দেয় গাড়িতে।

বৃদ্ধ বলেন, আপনার নিজের গরজের কথা যেন কি বলছিলেন?

—হ্যাঁ। কিছু যদি মনে না করেন, আপনার কাছ থেকে আপনার বন্ধু লালচাঁদজীর ঠিকানাটা আমি জেনে নিতে চাই—

—সে কি! কেন? কি হবে তার ঠিকানা দিয়ে?

—আপনি কেমন করে কৌতূহল দমন করেছিলেন জানি না, আমি কিন্তু নিজে একবার সেখানে গিয়ে দেখে আসতে চাই—

বৃদ্ধ ড্যাস্‌বোর্ডের ছাইদানে সিগ্রেটের ছাইটা ঝেড়ে বলেন, কৌতূহল আমারও প্রচণ্ড ছিল, কিন্তু আমার উপায় ছিল না—

—উপায় ছিল না? কেন?

—আমি ছিলাম রাজকুমার। আর লালচাঁদ ছিল জমিদারের ছেলে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, ওর আসামে। তার জমিদারীর আয় এখন খুবই কমে গেছে—বস্তুত জমিদারী এখন নেইও—তবু তার ঘর-বাড়ি-দালান-কোঠা-হাতিশালা-ম্যাগাজিন রুম সবই আছে। আমার যা কিছু ছিল, মায় পৈত্রিক বাস্তুভিটাখানা পর্যন্ত এখন বিদেশী সরকারের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি। আমি নিঃস্ব, উদ্‌বাস্তু! এখন তার বাড়িতে অতিথি হওয়া—

ক্যুভিয়ে বাধা দিয়ে বলে, থাক ও-কথা। কিন্তু আপনি তখন বলেছিলেন—কর্ণেল চোপড়ার বর্ণনাটা আদ্যন্ত ভুল। কী-ভাবে হাতী শিকার করতেন ওঁরা?

গাড়ি তখন ময়দানের মাঝখান দিয়ে দ্রুতগতিতে চলেছে নিউ আলিপুরের দিকে। বাঁয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ডাইনে ঘোড়দৌড়ের ফাঁকা মাঠ। খোলা হাওয়ায় একটানা একটা বিষণ্ণ আর্তি। বৃদ্ধের ফেনশুভ্র চুলগুলি অবিন্যস্ত হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। উনি বলেন, আপনি নিজেই যখন লালচাঁদের অতিথি হতে যাচ্ছেন তখন স্বচক্ষে দেখে আসুন। তবে প্রথমেই একটা ভুল ভেঙে দিই। লালচাঁদ হাতী মারতে জঙ্গলে যায় না—হাতী ধরতে যায়। হ্যাঁ, ফাঁস দিয়েই সে হাতী ধরে, মানে ধরত। কিন্তু 'ল্যাসোয়িঙ' পদ্ধতিতে বন্যজন্তুকে বন্দী করায় তো সভ্যজগৎ কখনও আপত্তি করেনি। আমেরিকায় বাইসন আর বুনো ঘোড়া ল্যাসোয়িঙ করে এই সেদিনও তো—

বাধা দিয়ে ক্যুভিয়ে বলে, এসব কী বলছেন আপনি! ল্যাসো ছুঁড়ে কখনও হাতী ধরা যায়?

বৃদ্ধ বলেন, এ-প্রশ্নের জবাব আমি এখন দেব না। আপনি তো ওদের ওখানে যাচ্ছেনই। ল্যাসো দিয়ে হাতী ধরা অবশ্য স্বচক্ষে দেখতে পাবেন না—কারণ সেটা দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে গেছে। তা হ'ক, তবু দশ-পনের বছর আগেও যে এ পদ্ধতিটা প্রচলিত ছিল সেটা অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনতে পাবেন।

ক্যুভিয়ে বলে, এ তো বড় অদ্ভুত কথা!

—হ্যাঁ, অদ্ভুত। অত্যন্ত অদ্ভুত। সভ্যজগৎ এ-কথা আজও জানে না।

দেখুন, যদি বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পারেন তবে 'লাইফ', কিংবা 'ন্যাচারাল জিওগ্রাফি' ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ ছাড়তে পারবেন!

ক্যাভিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আর ঐ গজমুক্তা! ওটার কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন আপনি? এই বিংশ শতাব্দীর বৃদ্ধ বয়সে? মানুষ যখন চাঁদে পৌঁচেছে?

বৃদ্ধ হেসে বললেন, চাঁদের কথা জানি না। তবে এ দুনিয়ার অনেক রহস্য আজও যে জানা যায়নি এটুকু জানি! আপনাদের ফিলজফি যে স্বপ্ন আজও দেখেনি এ দুনিয়ায় তাও থাকতে পারে, মঁসিয়ে হোরাসিয়ো!

·

ছোট্ট ল্যাণ্ডিং-স্ট্রিপের ওপর পাক খেয়ে প্লেনটা যখন নামবার উপক্রম করল তখন ক্যাভিয়ে আর একবার নিজের অসহায় অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করে। আকাশপথে সে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে—কিন্তু এমন অবস্থা তার কখনও হয়নি। প্লেনে সে-ই একক যাত্রী। বাদবাকি লঙ্কার বস্তা! যাত্রীবাহী প্লেন নয়, মালবাহী সার্ভিস। সপ্তাহে একবার যায়, একবার আসে। ক'লকাতায় নিয়ে যায় চা, আর ক'লকাতা থেকে নিয়ে আসে আসাম অঞ্চলের নানান সওদা—এবার যেমন আসছে পাহাড়প্রমাণ লঙ্কার বস্তা! বসবার আরামদায়ক আসন তো দূরের কথা, একটা চামড়ার বেল্ট পর্যন্ত নেই। প্লেনটা এয়ার-স্ট্রিপ লক্ষ্য করে কাত হতেই ক্যাভিয়ের মনে হল এবার বুঝি লঙ্কাসমাধি হবে তার। দেবতার অসীম কৃপা—শেষ পর্যন্ত লঙ্কার বস্তাগুলি হুড়মুড়িয়ে ওর ঘাড়ে পড়ল না। নিরাপদে ভূমি স্পর্শ করল আকাশযান।

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে, রাইফেল আর ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই ক্যাভিয়ে দেখে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে দু'জন উপস্থিত হয়েছেন, সেই ফাঁকা মাঠে। একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ—ফতুয়া-গায়ে ভৃত্য শ্রেণীর লোক, এবং তার সঙ্গে একজন তরুণী! রীতিমত আধুনিকা। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে তার। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সুশ্রী। পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি যেন এখানে আসবে বলে তার ব্যালে-নাচের সাজ-পোশাক পাল্টে ঐ হাল্কা আকাশি-রঙের সিফনের শাড়িখানি জড়িয়ে এসেছে। খোলা মাঠের দুরন্ত হাওয়ায় তার আঁচলটা পতাকার মত উড়ছে পৎপত করে। হাতে একটা বেঁটে ছাতা, চোখে গগল্‌স্‌। ক্যাভিয়ে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। এই রকম একটি আধুনিকা তাকে অভ্যর্থনা করতে এয়ার-স্ট্রিপে আসবে এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই মেয়েটি দুটি হাত বুকের কাছে জড়ো করে মিষ্টি গলায় ইংরাজিতে বললে, আপনি নিশ্চয় মিস্টার ক্যাভিয়ে! আপনার চিঠি আসার আগেই বাবা জঙ্গলে চলে গেছেন, না হলে তিনি নিজেই আপনাকে রিসিভ করতে আসতেন।

ভারতীয় মহিলার সঙ্গে করমর্দনের পরিবর্তে যুক্তকরে নমস্কার করাই যে বিধেয় এটুকু প্রাচ্যরীতিজ্ঞান ছিল ক্যাভিয়ের। সে প্রতিনমস্কার করে পরিষ্কার বাঙলায় বললে, এই রৌদ্রে কষ্ট না করলেও পারতেন—একে পাঠিয়ে দিলেই হত।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! এমন সুন্দর বাঙলা শিখলেন কি করে?

—ঠিক যেভাবে আপনি ইংরাজি শিখেছেন!

পায়ে পায়ে ওরা চলে আসে নির্গমন-দ্বারের দিকে। মেয়েটির সঙ্গে যে বৃদ্ধ এসেছিল সে হাত বাড়িয়ে ক্যাভিয়ের সুটকেসটা নিয়ে নেয়। চলতে চলতে ক্যাভিয়ে বলে, বাঙলা দেশে প্রায় চার বছর আছি। একটা ভাষা শেখার পক্ষে সেটা যথেষ্ট সময়।

—আসামে এসেছেন কখনও এর আগে?

—না। আসামটা দেখা ছিল না। এই প্রথম এলাম।

—মণিকাকার সঙ্গে কত দিনের আলাপ?

—মণিকাকা? ও! মিস্টার আচার্যচৌধুরী? না, বেশি দিনের নয়। তবে তাঁর কাছেই আপনার বাবার কথা প্রথম শুনেছিলাম। আপনার একজন কাকাও আছেন শুনেছি—

—কাকা নয়, জ্যেঠামশাই। মেজ জ্যেঠামশাই। তিনি বাড়িতেই আছেন। বৃদ্ধ মানুষ, বাইরে বড় একটা আসেন না—না হলে তিনি নিজেই আসতেন আপনাকে রিসিভ করতে। তিনি আসতে চেয়েও ছিলেন, আমি দিইনি—

—শুনেছি তিনি খুব পণ্ডিত মানুষ—

মেয়েটি হেসে বললে, কী জানি! আমি তো অনেক পণ্ডিত দেখিনি, তবে মেজ জ্যেঠামশায়ের কাছে বিভিন্ন ভাষায় এত চিঠিপত্র আসে যে, মনে হয় পণ্ডিতসমাজে তাঁরও একটা আসন আছে—

—বিভিন্ন ভাষায় মানে? বিদেশী ভাষায়?

—হ্যাঁ। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনেকগুলি পিরিওডিক্যাল আসে তাঁর কাছে। কত দেশ-বিদেশের পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও

হয়। উনি কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে কখনও যাননি। গত বিশবছরের মধ্যে, মানে আমার জ্ঞানে তাঁকে আমি এই শহরের বাইরেও যেতে দেখিনি!

—খুব আশ্চর্য চরিত্র তো! কী নাম বলুন তো তাঁর?

—ওঁর নাম শ্রীওঙ্কারনাথ বড়গোঁহাই, সবাই ওঁকে পণ্ডিতজী বলে ডাকে।

—আর আপনার বাবাকে বলে লালচাঁদজী, নয়? কিন্তু তাঁর পুরো নামটা কি?

—শ্রীলালচাঁদ বড়গোঁহাই।

ক্যাভিয়ে এবার মৃদু হেসে বলে, এবার কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে, লালচাঁদজীর কন্যাটির কী নাম?

মেয়েটি লজ্জা পায়। হেসে বলে, সেটা আগেই আমার বলা উচিত ছিল। আমার নাম—কুহু। আসুন, এবার আমাদের হাতীতে উঠতে হবে।

ক্যাভিয়ে লক্ষ্য করে দেখে ইতিমধ্যে তারা নির্গমন-দ্বার দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। প্রকাণ্ড একটা মাদি-হাতী দাঁড়িয়ে আছে গাছের ছায়ায়। শুঁড় নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে আর আড়-চোখে ওদের লক্ষ্য করছে। তার গজকুম্ভে, কানের পাশে এবং শুঁড়ের ওপর লাল-নীল-সাদা-হলুদ রঙের বিচিত্র নকশা আঁকা। ওর পিঠে বসানো আছে একটা কাঠের বাক্স, গদি বিছানো। মোটা দড়ি দিয়ে বাক্সটা ওর পেটের সঙ্গে বাঁধা।

কুহু বললে, গণেশদাদু, তুমি দড়ির সিঁড়িটা নামিয়ে দাও।

বৃদ্ধ লোকটি স্যুটকেস হাতে এগিয়ে যায় হাতীটার দিকে। ওর শুঁড়ের ওপর একটা পা রেখে অবলীলাক্রমে উঠে যায় হাতীর পিঠে। স্যুটকেসটা গুছিয়ে রেখে জন্তুটার ঘাড়ের ওপর বসে দু'দিকে দু'পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে। কানের কাছে পায়ের চাপ দিয়ে বলে ওঠে, ধ্যাৎ পিছে, বৌমা বৈঠ্।

হাতীটা একটু পিছিয়ে সরে এসে সামনের পা মুড়ে বসে পড়ে। গণেশ ওপর থেকে লগবগে একটা দড়ির মই নিচে নামিয়ে দিল। ক্যাভিয়ে একটু ইতস্তত: করে। গাড়িতে চড়বার সময় সহযাত্রিণীকে আগে উঠতে দেওয়াই ভদ্রতা—কিন্তু এক্ষেত্রে সে-সৌজন্য দেখাতে গেলে মেয়েটি আবার ভেবে বসবে না তো যে, ক্যাভিয়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল? সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। কুহু বললে, নিন, উঠুন আপনি। আমি মই বেয়ে উঠলে বড়মা চটে যাবে।

বলেই, হস্তিনীর গজকুম্ভে একটা থাপ্পড় মেরে বললে: ছামেট! জুম্‌রাখ, বড়ামাঈ······

এবং পরমুহূর্তেই হাতীটার শুঁড়ে একটি পা রেখে অনায়াসে মেয়েটি উঠে গেল ওপরে, গুছিয়ে বসল হাওদায়। দড়ির মই বেয়ে ক্যাভিয়েও উঠে এল গুটি গুটি।

গণেশ দুর্বোধ্য ভাষায় হুকুম দিল, মাইল হ বৌমা! আগেৎ···

হস্তিনী এবার উঠে দাঁড়ায়। গজেন্দ্রগমনে হেলে-দুলে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। কাঠের রেলিংটা বাগিয়ে ধরে ক্যাভিয়ে প্রশ্ন করে, এঁর পরিচয়টা তো আমাকে দিলেন না?

—কে? গণেশদাদু? ও আমার দাদু, আমাদের হস্তিশালার কমাণ্ডার-ইন-চীফ। ঠাকুর্দার আমলের লোক। তিনিই ওকে 'সর্দার' খেতাব দিয়েছিলেন। ও যখন এ-বাড়িতে আসে তখন ওর বয়স ছিল আট-দশ বছর—এখন ওর বয়স—কত হবে গণেশদাদু?

—তা সাত-আট কুড়ি হলহিঁ বোধকরোঁ!

খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে কুহু। বলে, সাত-আট কুড়ি কত হয় জান, গণেশদাদু? দেড়শ' বছর!

বৃদ্ধ মাহুত দন্তহীন মাড়ি বার করে একগাল হেসে বলে, ময় কী জানিছোঁ দিদি; বয়সর কি আরু গাছ-পাথর আছে?

ক্যাভিয়ে বলে, কিন্তু এই হস্তিনীর নামটা কী? আপনি ওকে 'বড়ামাঈ' বলে ডাকলেন, অথচ গণেশদাদু ডাকলেন 'বৌমা' বলে—

কুহু বলে, আপনি ওকে 'গণেশ' বলেই ডাকবেন, গণেশদাদু বলতে হবে না আপনাকে—

—তা তো হবে না, কিন্তু হস্তিনীটিকে কী বলে ডাকব? 'বৌমা' না 'বড়ামাঈ'!

—সে আপনার যা ইচ্ছে। আমি ওকে ডাকি বড়ামাঈ, গণেশদাদু ডাকে বৌমা বলে আর আমার বাবা ডাকেন—'গিন্নি!'

ক্যাভিয়ে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। বলে, এমন অদ্ভুত কথা তো কখনও শুনিনি! আমাদের বাড়িতে একটা এ্যাল্‌সেশিয়ান ছিল। আমরা বাড়িসুদ্ধ তাকে ডাকতাম 'জ্যাক' বলে। ঐ জ্যাক নামেই সে সাড়া দিত। হাতীরও নাম থাকে, আমি শুনেছি—কিন্তু এক-একজন তাকে এক-এক নামে ডাকতে পারে এ আমি ভাবতেই পারি না।

কুহু বলে, হস্তী-তত্ত্ব বিষয়ে এই তাহলে আপনার প্রথম পাঠ!

—কিন্তু অতগুলো নাম কি ও মনে রাখতে পারে?

—না, তা পারে না বোধহয়। ঠিক জানি না। জেঠুকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমার তো ধারণা কুকুর যেমন তার নামটা চিনে নেয়, হাতীরা তা নেয় না। হাতীর নামকরণ করা হয় কথোপকথনের সময় নিজেদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ হাতীকে চিহ্নিত করতে। হাতী আমাদের ডাকে সাড়া দেয় শব্দ শুনে ততটা নয়, যতটা আমাদের গায়ের গন্ধে। ওদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল।

—কিন্তু শ্রবণশক্তিও নিশ্চয় আছে ওদের। আপনি তো এইমাত্র ছামট. ডুমরাট ইত্যাদি কীসব হুকুম দিলেন—

বাধা দিয়ে কুহু বলে, সর্বনাশ! অমন কথা বলবেন না! বড়ামাঈকে হুকুম দেবার অধিকার সে মাত্র একজনকেই দিয়েছে! তিনি আমার বাবা। আমি কিংবা গণেশদাদু যা বলি তা হুকুম নয়, বিনীত অনুরোধ মাত্র।

—বুঝলাম। আচ্ছা 'ছামট, ডুমরাট' মানে কি?

—'ছামট' মানে—উঠে দাঁড়াও। আর 'ডুমরাট' মানে—'লেজ নাড়িও না।' আপনি ওর পেছন দিকে ছিলেন, বড়মা তখন লেজ নাড়িয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। পাছে আপনাকে আঘাত করে বসে তাই বড়মাকে লেজটা না-নাড়াতে অনুরোধ করেছিলাম।

—আর গণেশদাদু যে অনুরোধগুলো করেছিলেন তার মানে কি?

—আপনি কি এক দিনেই হস্তী-অভিধানের সবকথা শিখে ফেলতে চান?

ক্যাভিয়ে হেসে বলে, আচ্ছা, ও প্রসঙ্গ থাক। আমি বরং সুবিধামত আপনার কাছ থেকে সবগুলো কথার মানে লিখে নেব। এখন বলুন, এই হস্তিনীর প্রকৃত নামটা কী?

কুহু বলে, নাম নিয়ে আপনার খুব কৌতূহল দেখছি! তখন থেকে শুধু সকলের নামগুলোই জানতে চাইছেন!

—না, মানে আমি ভাবছি একটা জীবকে আপনারা কেন এমন বিভিন্ন নামে ডাকছেন। মানুষের ক্ষেত্রে তো এটা হতেই পারে। আমি যাকে 'ড্যাডি' ডাকতাম, আমার মা তাঁকে ডাকতেন 'ডিয়ারি' বলে। আবার আমার ঠাকুর্দা তাঁকে ডাকতেন 'ওল্ড বয়' বলে। কিন্তু এ তিনটি সম্বোধনের অতীত তাঁর নিজস্ব একটা নাম ছিল। কিন্তু কোন জীবজন্তুর ক্ষেত্রে—

বাধা দিয়ে কুহু বলে, আসলে ঐখানেই ভুল হচ্ছে আপনার। আপনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না যে, এই হাতীটা আমাদের পরিবারভুক্ত একজন। আমার বাবার গোঁফ আছে, আমার তা নেই—তবু আমরা দু'জনেই এক পরিবারের। তেমনি বড়মার শুঁড় আছে—আমার অথবা বাবার তা নেই,

তবু আমরা তিনজনেই এক পরিবারভুক্ত। তফাৎ কিছু নেই। বড়মা আমাদের পোষা জীবমাত্র নয়। ওর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাত্র আট বছর বয়সে ও এ সংসারে এসেছিল। তখন আমার ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন। বাবার বয়স তখন কত হবে—এই ধরুন সতেরো-আঠারো। এইটিই তাঁর জীবনের প্রথম হাতিশিকার। মানে ঠাকুর্দা মারা যাবার পর একেই সর্বপ্রথম ধরেছিলেন বাবা নিজের হাতে। ওকে নিয়ে তিনি একেবারে মেতে উঠলেন। ফান্দাইত আর দাইদারদের সঙ্গে তিনিও সমস্তদিন ওর কাছে পড়ে থাকতেন। তাই দেখে ঠাকুরমা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এ যে দেখছি আমার ছেলের বউ এসেছে সংসারে! সেই ঠাট্টাই কাল হল। গণেশদাদু যেদিন বড়মাকে সাইঘর থেকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল—

বাধা দিয়ে ক্যুভিয়ে বলে, সাইঘর কাকে বলে?

—ধৃত হাতীকে যেখানে কুম্‌কি হাতীর সাহায্যে পোষ মানানো হয়, তাকে নানান বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। অর্থাৎ হাতীর নার্সারি-স্কুল আর কি। লেখাপড়া শেষ করে যেদিন লক্ষ্মীমেয়েটির মত বড়মা প্রথম এল এ-বাড়িতে সেদিন ঠাকুরমা ওকে শাঁখ বাজিয়ে বরণ করেছিলেন। শুধু ধানদূর্বা দিয়েই আশীর্বাদ করেন নি—নিজের গলার মালা খুলে ওর শুঁড়ে পরিয়ে দিয়ে বধূবরণ করেছিলেন। তিনি বরাবর ওকে 'বৌমা' ডাকতেন;—সেই সুবাদে গণেশদাদুও ওকে 'বৌমা' বলে ডাকে। আমার বাবা ওকে বরাবর ডেকেছেন 'গিন্নি' বলে!

ক্যুভিয়ের খুব অবাক লাগছিল। বিশালকায় একটা হস্তিনীকে বনেদী ঘরের একজন সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া মহিলা যে সর্বসমক্ষে পুত্রবধূর মর্যাদা দিতে পারেন—এবং সে-বাড়ির ছেলে তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে প্রকাশ্যে তাকে স্ত্রী-সম্বোধন করতে পারে, এটা তার কাছে একটা চমকপ্রদ সংবাদ। 'গিন্নি' শব্দটার অর্থ তার ভালমতই জানা ছিল। ক্যুভিয়ে এ-ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত দেখতে চায়। বলে, কিন্তু আপনার বাবা যখন সত্যিই আপনার মাকে বিবাহ করে আনলেন তখন আপনার বড়ামাঈ অভিমান করল না? আপনার মা ওকে ঈর্ষা করতেন না?

কুহু এক কথায় তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, আপনি ভুল করছেন। আমার বাবা আদৌ বিবাহ করেননি। তিনি চিরকুমার। সুতরাং ঈর্ষা অভিমানের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। সেটা বরং হয়েছে ছোটমাঈ ধরা পড়ার পরে। যার পিঠে চেপে উনি এবার জঙ্গলে গেছেন!

এক নিঃশ্বাসে ক্যুভিয়ের সমস্যার সমাধান করে দিয়ে কুহু তার বড়মাকে বলে ওঠে: মাইল ডেগ্‌, বড়ামাঈ!

তারপর গণেশের দিকে ফিরে ধমক দেয়, তুমি আজকাল একেবারে চোখে দেখতে পাও না, গণেশদাদু।

গণেশ তার নিদন্ত-হাসি হেসে বললে, চিন্‌হা বাট দিদি, ময় চকুত না দেখিছো তয় কী হয়? বৌমা ঠিকই ডেগ্‌ ডিঙায়ে চল্‌বই দিয়াছোন!

কুহু ক্যাভিয়ের দিকে ফিরে দেখে ভদ্রলোকের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ওর বিস্ময়ের অভিব্যক্তিটার হেতু ঠিকমত আন্দাজ করে উঠতে পারে না। তারপর অনুমান করে, বোধকরি ওদের কথোপকথনের অর্থ বুঝতে না পেরেই ভদ্রলোক অমন অবাক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাই বলে—'মাইল ডেগ্‌' মানে 'সামনে গর্ত আছে, দেখে চল'—আর গণেশদাদু আমাকে বলল 'চেনা রাস্তা দিদি, আমি চোখে না-দেখছি তাতে কি? বৌমা ঠিকই গর্ত ডিঙিয়ে যাবে, দেখে নিও।'

ক্যাভিয়ে কোন জবাব দিল না।

সমতলভূমি থেকে বেশ উঁচুতে একটি টিলার ওপর দুর্গের মত বাড়িটা। পাকদণ্ডী পথ বেয়ে হেলতে-দুলতে হাতীটা উঠে এল টিলার মাথায়। গাছ-পালায় ছাওয়া টিলার মাথাটা বেশ সমতল। তার ওপর অনেকদিনের সাবেক বাড়িটা। প্রকাণ্ড প্রবেশ-তোরণ, তার সামনে মরচে-ধরা অনেকদিনের পুরানো একটা ভারি কামান মাটিতে পোঁতা। কে জানে কোন অতীত দিনের রক্তারক্তির সে নীরব সাক্ষী! সিংহ-দরজার ওপর বড় বড় গজাল পোঁতা। দরজাটা এত প্রকাণ্ড যে, হাওদা সমেত হাতীটা অনায়াসে তার ভিতর দিয়ে উঠানে এসে থামল। পায়ে-চলা কাঁকরে পথটা চক্রাকারে সমস্ত চত্বরটাকে প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে এসেছে ঐ প্রবেশ-তোরণে। এই চক্রাকার পথের কেন্দ্রস্থলে ফুলের কেয়ারি করা একটা দ্বীপ। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ফুলগাছ আর বিশেষ নেই, অযত্নে মরে গেছে। বড় বড় কয়েকটা কামিনী-টগর-গন্ধরাজ-শিউলির ঝাড় টিকে আছে শুধু। দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে উঁচু একটা সিমেণ্ট বাঁধানো বেদীর ওপর প্রকাণ্ড একটা হাতীর মূর্তি। পাথরের। খোঁজ করলে ক্যাভিয়ে জানতে পারত, এটা স্বর্গতঃ সূর্যকান্ত বড়গোঁহাই-এর পাটহাতী বিমলার প্রতিমূর্তি।

তিনদিকে একতলা বাড়ি। টিনের চাল। কাঠের দেওয়াল। কাচের জানালা। প্রকাণ্ড তোরণটার ওপর এবং পাঁচিলের স্থানে স্থানে অনেক উঁচুতে গোল গোল ছিদ্র। প্রহরী দাঁড়াবার স্থান। একসময় এগুলি নিশ্চয় দুর্গের

ইন্দ্রকোষের মত ব্যবহার করা হত। দুর্গ অবরোধকারীদের পিছু হঠাতে। সংস্কারের অভাবে সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে বট-অশ্বত্থ আর ভেড়েণ্ডার গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এবার আর হাতীটাকে বসতে বলা হল না। বারে বারে ওঠা-বসা করা অতবড় জন্তুটার পক্ষে কষ্টকর। তাই হাতীতে ওঠা-নামার জন্য প্রাঙ্গণের একান্তে ইটের গাঁথনি দিয়ে একটা পাকা সিঁড়ি তৈরী করা আছে। বৌমা অথবা বড়ামাঈ সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। ওরা দু'জনে নেমে পড়ে সেই সিঁড়ির চাতালে। গণেশসর্দার নামে না। হাতীটাকে বলে: দেলে ভোঁর্!

যেন বিদায় সম্ভাষণ জানাবার উদ্দেশ্যেই হাতীটা শুঁড় তুলে ক্যুভিয়েকে মস্ত একটা সেলাম দেয়। ক্যুভিয়ে বোধকরি এজন্য প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয় মহিলা নমস্কার করলে করমর্দনের পরিবর্তে প্রতি-নমস্কার করতে হয়, এটুকু প্রাচ্য সৌজন্য জানা ছিল ক্যুভিয়ের; কিন্তু কোন ভারতীয় হস্তিনী,—বিশেষ করে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বড়ামাঈ যদি শুঁড় তুলে অভিবাদন জানায় তখন কী-ভাবে তাকে প্রত্যভিবাদন করা সৌজন্যসম্মত এটা ক্যুভিয়েকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। কিন্তু জঁা ক্যুভিয়ে জাতে ফরাসী। এটিকেটের প্রতিযোগিতায় মনুষ্যেতর কোনও জীবের কাছে হার স্বীকার করা তার ধাতে নেই। তাই দু' হাতে তার টেরিলিন প্যাণ্টের দুটি প্রান্ত ধরে রীতিমত ফরাসী ব্যালে-নাচের কায়দায় 'কার্টসী' জানিয়ে 'বাও' করল ক্যুভিয়ে সেই সোপান-মঞ্চের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে।

তা দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে কুহু।

কিন্তু অপ্রস্তুত হল না ক্যুভিয়ে। সেদিকে তার নজর নেই। সে অবাক হয়ে দেখছিল হস্তিনীটিকে। ওর স্পষ্ট মনে হল হাতীটাও হেসে ফেলেছে। তার ঠোঁটের কোণে, চোখের কোলে হাসি উপচিয়ে পড়ছে। আড়চোখে ক্যুভিয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে হেলতে দুলতে আর হাসতে হাসতেই যেন চলে গেল বৌমা, অথবা বড়ামাঈ!

আলাপ হল ওঙ্কারনাথ বড়গোঁহাইয়ের সঙ্গে। তাঁর খাস কামরাতে। ইংরাজি U অক্ষরের আকারে বাড়িটা তৈরী। স্বর্গত সূর্যকান্তের তিন পুত্র। বড় ছেলে প্রণবেশ গতায়ু। তিনি থাকতেন মাঝের মহলটায়। তাঁর স্ত্রী-পুত্র সকলেই কলকাতাবাসী। কালেভদ্রে দেশের বাড়িতে আসেন। তাই মাঝের মহলের অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ পড়ে থাকে। কিছু কিছু ঘর সংস্কারের অভাবে

অব্যবহার্যও হয়ে পড়েছে। প্রসারিত-বাহু বাড়ির আর দুটি মহলের নাম মেজ-তরফ আর ছোট-তরফ। দু' ভাইয়ের কেউই বিবাহ করেননি। ফলে এতবড় বাড়িটা প্রায় জনমানবহীন। সূর্যকান্তের মধ্যমপুত্র ওঙ্কারনাথজীর বর্তমান বয়স বোধকরি সত্তরের কাছাকাছি। পেয়ারাফুলি পাকা আমটির মত টুসটুসে। চুলগুলি ধবধবে সাদা। ব্যাকব্রাশ করা। চোখে কালো-ফ্রেমের মোটা চশমা। ধুতি আর ফতুয়া পরে একটা ইজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় কী একটা মোটা বই পড়ছিলেন তিনি। পাশে ছোট একটা টিপয়ে সিগারেটের টিন, ছাইদান, একখানা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস, একটি লাল-নীল পেন্‌সিল এবং এক কাপ উত্তাপ-হারানো উপেক্ষিত কফি।

পর্দা সরিয়ে ক্যাভিয়েকে নিয়ে কুহু প্রবেশ করতেই বৃদ্ধ হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লেন আরাম-কেদারা থেকে। চোখ থেকে চশমাটা খুলে ইজি-চেয়ারে রেখে প্রায় ছুটেই এলেন দ্বারের কাছে, খুলে-যাওয়া কাছাটা আঁটতে আঁটতে। ক্যাভিয়ের হাতখানা টেনে নিয়ে বারে বারে করমর্দন করে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষাতে বলতে থাকেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনি এসেছেন—

ক্যাভিয়ে ওঁর এই বিচিত্র সম্ভাষণে হেসে ফেলেছিল আর কি! কোনক্রমে হাসি চেপে ইংরাজিতে বলে, আমি ইংরাজি ও বাঙলা ভাষা জানি—

বৃদ্ধ সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না। ফরাসী ভাষাতেই বলে চলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনি এসেছেন, অথচ আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বিমান-বন্দর থেকে আমন্ত্রণ করে আনতে পারলাম না! রৌদ্রে বার হওয়া আমার একেবারে মানা। না হলে আমি নিশ্চিত···কুহুকে আমি বলেও ছিলাম··· মানে, ও কিছুতেই আমাকে···

কুহু বাধা দিয়ে বলে, জেঠু, আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। উনি দিব্যি বাঙলায় কথা বলতে পারেন, বুঝতে পারেন। হয় তুমি বাঙলায় কথা বল, না-হয় আমি চলে যাই—

ক্যাভিয়েও বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙলা ভাষাটা যদি আমাকে বলতে ও শুনতে সুযোগ দেন, তাহলে আমার অভ্যাসটা বেশি করে হয়।

বৃদ্ধ ওর হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলেন, এবার বাঙলাতেই—এ তো অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি ইংরাজি না জানেন তাহলে কুহু আপনাকে কি বলতে আপনি কী বুঝবেন! এ তো আরও ভাল হল! আহক, আহক—বহক!

কুহু বলে, ও জেঠু, উনি বাঙলাই শুধু জানেন, অসমীয়া ভাষা নয়—

কে কার কথা শোনে ?

বৃদ্ধ ক্যাভিয়েকে হাত ধরে টেনে এনে একটা কৌচে বসিয়ে দেন। নিজে ইজিচেয়ারে বসবার উপক্রম করতেই কুহু চীৎকার করে ওঠে, বস'না ! তোমার চশমা !

বৃদ্ধ কর্ণপাত করেন না। ধপ্ করে বসে পড়েন। যাদুকরের মত ক্ষিপ্র-গতিতে তাঁর তলদেশ থেকে কুহু হাতসাফাই করে চশমাটা বাঁচায়। বৃদ্ধ বলতে থাকেন, লালু এসে পড়বে দু'দশ দিনের মধ্যেই। আমাদের এখানে আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন কেউই বড় একটা আসে না। আপনি এসেছেন, খুব ভাল লাগছে আমার। মণির চিঠি আমি পড়েছি—শুনেছি আপনি হাতীর বিষয়ে কৌতূহলী। এ একটা গবেষণা করবার মত বিষয় বটে ! এ সম্বন্ধে প্র্যাকটিক্যাল যা কিছু জানতে চান তা লালু আপনাকে বলে দেবে। গণেশদাও অনেক খবর রাখে। আর 'প্রবোসিডিয়ান' সম্বন্ধে থিওরেটিক্যাল কোন আলোচনা থাকলে—

ক্যাভিয়ে প্রশ্ন করে, 'প্রবোসিডিয়ান' কাকে বলে ?

—'প্রবসস্' মানে শুণ্ড বা শুঁড়। প্রবোসিডিয়ান হচ্ছে হস্তিবংশ। মানে, শুধু আজকের জীবিত হাতীই নয়, অতীতকালের যে-সব জীব বর্তমান হস্তিবংশের পূর্বসূরী সেই সব ম্যামথ, ম্যাস্টডন, ডাইনোথেরিয়াম—এরা সকলেই প্রবোসিডিয়ান। এদের সকলেরই যে শুঁড় ছিল তাও নয়, তবু যেহেতু ল্যাটিন নামটা 'প্রবোসিডিয়ান' তাই আমি এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচন করেছি : মহাশুণ্ডিবংশ। আপনি হয় তো ঐ 'মহা' উপসর্গটি যোগ করায় আপত্তি করবেন ; কিন্তু আমার বক্তব্য 'মহা' বিশেষণটা আসলে 'শুণ্ডি' বিশেষ্যকে কোয়ালিফাই করছে না, করছে 'বংশ' বিশেষ্যকে। অর্থাৎ নামটা 'মহাশুণ্ডিবংশ' হলেও তার ভাবার্থ হচ্ছে 'শুণ্ডিমহাবংশ'। এতে নিশ্চয় আপনি আপত্তি করবেন না—

কুহু বলে, আমি ঘোরতর আপত্তি করব ! মিস্টার ক্যাভিয়ে এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন, মুখ-হাতও তাঁর ধোয়া হয়নি—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলে ওঠেন, এ তোমার অন্যায় কথা। 'শুণ্ডিবংশ' শব্দটা 'প্রবোসিডিয়ান' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু 'শুণ্ডিবংশ' শব্দটা শ্রুতিমধুর নয়। ষাট-সত্তর লক্ষ বৎসরব্যাপী অতবড় বংশাবলীতে আমি যদি একটা 'মহা' উপসর্গ যোগ করি, তাতে তোমার এমন ঘোরতর আপত্তি তোলা কিন্তু ঠিক নয় !

কুহু হেসে বলে, আমার 'উপসর্গ'টাও যে তোমাকে বোঝাতে পারছি না

জেঠু! মিস্টার ক্যুভিয়ে এইমাত্র এসে পৌছেছেন। ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে ওঁকে ওঁর ঘরে পৌছে দেব। তা তুমি এখনই ওঁকে এক নিঃশ্বাসে মহাহস্তিবংশের সাত লক্ষ বছরের ইতিহাস—

—জাস্ট এ মিনিট! জাস্ট এ মিনিট!—বৃদ্ধ দু'হাত তুলে কুহুকে থামিয়ে দেন। বলেন, 'মহাহস্তিবংশ' নয়, কথাটা 'মহাশুণ্ডিবংশ'। দ্বিতীয়ত ওটা সাত লক্ষ বছর নয়—

কুহু সে-কথায় কর্ণপাত না করে অনায়াসে ক্যুভিয়ের হাতটা ধরে বলে, আসুন আপনি। আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দিই।

ক্যুভিয়ে একটু চমকে ওঠে। কুহু যদি অভারতীয় হত তাহলে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু চার বছরের অভিজ্ঞতায় ক্যুভিয়ের মনে হল এই অনায়াস-ভঙ্গীতে একটি বিজাতীয় পুরুষকে হাত ধরে আকর্ষণ করাটা সে ঠিক প্রত্যাশা করেনি।

বৃদ্ধ পুনরায় উঠে দাঁড়ান। এক পা এগিয়ে এসে বলেন, একটা কথা যাঁচিয়ে, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী জীববিজ্ঞানী ব্যারন জর্জেস লিওপোল্ড ক্যুভিয়ের নাম শুনেছেন?

ক্যুভিয়ে বলে, তিনি আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের কাকা।

ওঙ্কারনাথজী প্রায় একটি চিতাবাঘের মত লাফ মারেন। ক্যুভিয়ের হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, আমি ঠিকই ধরেছি! আপনার অনুসন্ধিৎসা দেখে আমার তখনই মনে হয়েছিল আপনি ব্যারন ক্যুভিয়ের বংশের কেউ হবেন নিশ্চয়! কী সৌভাগ্য আমার! আজ আমাদের গৌড়পুর ধন্য হয়ে গেল! আমি আবার আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ব্যারন ক্যুভিয়ে!

ক্যুভিয়ে বৃদ্ধকে সংশোধন করে বলে, স্যার, আপনি ভুল করছেন। আমি ব্যারন নই। আমি সেই বংশের সন্তান বটে, তবে আমি সামান্য চিকিৎসক। আপনি আমাকে ডক্টর ক্যুভিয়ে বলেই ডাকবেন।

ক্যুভিয়ে কিন্তু পণ্ডিত ওঙ্কারনাথকে ঠিকমত চিনতে পারেনি। অভ্রান্ত পণ্ডিত ভুল বড় একটা করতেন না; কিন্তু যে ভুলগুলি করতেন তা শুধ্‌রে দেবার ক্ষমতাও কারও ছিল না। গরম কফি সময়মত খেতে ভুল হয়ে যেত তাঁর। মাছি-পড়া ঠাণ্ডা কফির কাপ উঠিয়ে নিয়ে যেত ওঁর খাস চাকর। চশমার উপর বসে পড়তে ওঁর দ্বিধা নেই। দক্ষিণ ও বাম পাদুকা যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ চরণে শোভিত হত দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার। তেমনি এ ভুলটাও বারে বারে প্রতিবাদ করে ভাঙতে পারেনি ডাক্তার ক্যুভিয়ে। যে মাসখানেক

সে ও বাড়িতে ছিল তার ভিতর পণ্ডিতজী তাকে বরাবর ব্যারন ক্যুভিয়ে বলেই সম্বোধন করেছেন। শেষ পর্যন্ত ক্যুভিয়েকেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। হাল ছেড়ে দিয়েছিল বেচারি।

সূর্যকান্ত বড়গোঁহাই রোজনামচা লিখতেন। বাংলায়। ওঙ্কারনাথজী সেটা ওকে পড়তে দিয়েছিলেন। আসামে হাতী-শিকার সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধের কাটিং ও বইও দিয়েছিলেন। ক্যুভিয়ে তা থেকে অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পেরেছিল। লালচাঁদজী জঙ্গল থেকে ফেরেননি, কবে ফিরবেন তার কোন ঠিক-ঠিকানাও নেই। তা হ'ক, দিন ওর ভালই কেটে যাচ্ছিল। গণেশ-সর্দার এবং কুহুও অনেক অতীত ইতিহাসের উপাদান জুগিয়েছে।

সূর্যকান্ত বড়গোঁহাই ছিলেন ও-অঞ্চলের একজন নামকরা জমিদার। ভূমি-রাজস্ব থেকে যতটা আয় ছিল তাঁর, তার চেয়ে অনেক বেশি উপার্জন ছিল হস্তি-ব্যবসায় থেকে। আজ থেকে একশ' বছর আগে মৈমনসিংহ, সুশঙ, গারো-পাহাড় এবং আসাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হাতী ধরার ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন অনেক বড় বড় জমিদার। গারো-পাহাড়ে লক্ষ্মীপুরের রাজাবাহাদুর, সুশঙের মহারাজা, নলডাঙার জমিদার প্রভৃতি ছাড়া আরও অনেক ব্যবসায়ী এবং ভূম্যধিকারী এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অত্যন্ত লাভজনক ছিল কারবারটি। গোঁয়ালপাড়া, বিজনি, গৌহাটি, শিলং, নওগাঁ, গারো-পাহাড়, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, তেজপুর, জোড়হাট, গৌরীপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হাতী ধরার আয়োজন ছিল একটা বড় ব্যবসায়। গারো-পাহাড়ের সরকারী খেদায় প্রতি বছর সত্তর-আশিটি হাতী ধরা পড়ত। সে-যুগে বনসম্পদ আহরণে, রাস্তা-নির্মাণের কাজে এবং নানান সরকারী কাজে হাতীর ব্যবহার ছিল ব্যাপক। বিদেশেও প্রচুর হাতী চালান যেত। ফলে দেশের ভিতর এবং বাইরে হাতীর যথেষ্ট চাহিদা ছিল। জি. পি. স্যাণ্ডারসন সাহেব যখন গারো-পাহাড়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্‌ হয়ে আসেন তখন তিনি হাতী ধরার সরকারী ইজারার আইনকানুন একেবারে আমূল সংস্কার করলেন। শিকারীদের অনেক সুবিধা করে দিলেন তিনি। ফলে বছরে প্রায় তিন-চারশ' হাতী ধরা পড়তে লাগল। ঢাকা শহরে একটি সরকারী পিলখানা খোলা হয়েছিল, তার নাম 'খেদা-অফিস'। সেখানে সে-আমলে বিক্রয়ের জন্য এবং চালান যাবার অপেক্ষায় সব সময়েই শতাধিক হাতী মজুত থাকত। হাতী ধরার মরশুমে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে কখনও পাঁচশ' পর্যন্ত হত। হস্তি-ব্যবসায়ে সরকারের তখন লাভও হত

যথেষ্ট। ক্যাভিয়ে একটি অতি প্রাচীন নথিপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করল: ঢাকার পলখানায় আজ থেকে আশি-নব্বই বছর আগে সরকারের বাৎসরিক গড় ব্যয় ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা। স্যাণ্ডারসন তাঁর সরকারকে রিপোর্ট করছেন যে, বছরে গড়ে চারশ' হাতী বিক্রী হচ্ছে। সে-আমলে হাতীর গড় মূল্য ছিল পাঁচশ' টাকা। অর্থাৎ বছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা গ্রস আয় ছিল। তার মানে হিসাব মত আজ থেকে একশ' বছর আগে হস্তি-ব্যবসায়ে এ অঞ্চলে সরকারের লাভের 'হার' ছিল শতকরা শতভাগ! দারুণ লাভের ব্যবসা, সন্দেহ নেই।

দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের এই পূর্বপ্রান্তে হাতী ধরার তিন-চার রকম কায়দা ছিল। পদ্ধতির ইতরবিশেষ অনুসারে তাদের নানারকম স্থানীয় নামও ছিল— কোট শিকার, খেদা শিকার, পরতালা শিকার, ইত্যাদি। এর মধ্যে দুটি পদ্ধতির ছিল বহুল ব্যবহার। খেদা এবং কোট। কোট-পদ্ধতি এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক জানি না, বোধহয় আইন করেই বন্ধ করা হয়েছে। অথবা শিকারীরা এ-পদ্ধতির অনিবার্য অসুবিধাগুলি প্রণিধান করে নিজেরাই সেটা ত্যাগ করেছে। কোট-পদ্ধতিটা আগে বলি:

অরণ্যের গভীরে যে বনপথে সাধারণত হস্তিযূথ যাতায়াত করে সেখানে কিছু দূরে দূরে কয়েকটি প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়। আট-দশ হাত চৌকো গর্ত। প্রায় ছোটখাট ডোবা। গভীরতায় অন্ততঃ আট হাত। ধারগুলো ঢালু নয়, খাড়া। একটি মাচা তৈরী করে গর্তটা ঢেকে দেওয়া হত এবং লতাপাতা ছড়িয়ে সেটাকে গোপন করা হত। বন্য হস্তীরা দল বেঁধে চলে, এক-একদলে ত্রিশ-চল্লিশ এমনকি শতাধিক হাতীও থাকে। অসতর্ক কোন বন্যহস্তী ঐ মাচার উপর পদার্পণ করা মাত্র গর্তে পড়ে যেত। দলের অন্যান্য হাতী ভয়ে ইতস্ততঃ পালাতে গিয়ে নিকটস্থ আর দু-একটি গর্তে পড়ে যেত। অমনি শিকারীর দল আগুন জ্বেলে ক্যানেস্তারা পিটাতে পিটাতে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হত। দলের অন্যান্য হাতী প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলে পোষমানা কুম্‌কি হাতীর সাহায্যে দড়ি বেঁধে ঐ বন্দী হাতীদের তোলা হত। প্রথমে তাদের স্থান হত একটি কাঠের খাঁচায়। তারপর নানান প্রক্রিয়ায় তাদের ক্রমশঃ পোষ মানানো হত।

এই কোট-পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, আট-দশ হাত গভীর গর্তে পড়বার সময় অধিকাংশ বন্দীই জখম হয়ে যায়। কখনও কখনও পতনজনিত আঘাতে মারাও যায়। কোনক্রমে প্রাণে বাঁচলেও দেখা যায়, তাদের পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। ফলে বাকি বন্দিজীবনে তাকে দিয়ে আর ভারি কোন কাজ করানো চলে না। গর্তের গভীরতা কম করে দেখা গেছে সে-ক্ষেত্রে

অন্যান্য বন্যহস্তীর সাহায্যে গর্ত থেকে বন্দী হাতী উঠে পড়ে গর্তের উপর। ফলে এভাবে হাতীধরার পদ্ধতিটা বন্ধ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটা হচ্ছে—খেদা-শিকার। খেদার নির্মাণ-কৌশল ও শিকারের কায়দা দেশভেদে কিছু আলাদা আলাদা। তবু মোটামুটি একই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষ, বর্মা, মালয়, সিংহল, কম্বোজ, শ্যামদেশে হাতী ধরা হত। সিংহলে সচারাচর এক-কামরার খেদা প্রস্তুত করা হয়, মহীশূরে দু'-কামরা এবং আসামের কোন-কোন অঞ্চলে তিন-কামরার খেদাও দেখা গেছে। আমরা এখানে দু'কামরার একটি খেদার বর্ণনা দিচ্ছি। যা থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা যাবে :

বনের একাংশে মোটা মোটা শালের খুঁটি পুঁতে একটা জায়গা চিত্রে বর্ণিত অংশের মত ঘিরে ফেলা হয়। তার প্রবেশমুখে (ক-চিহ্নিত) ফানেলের আকারে
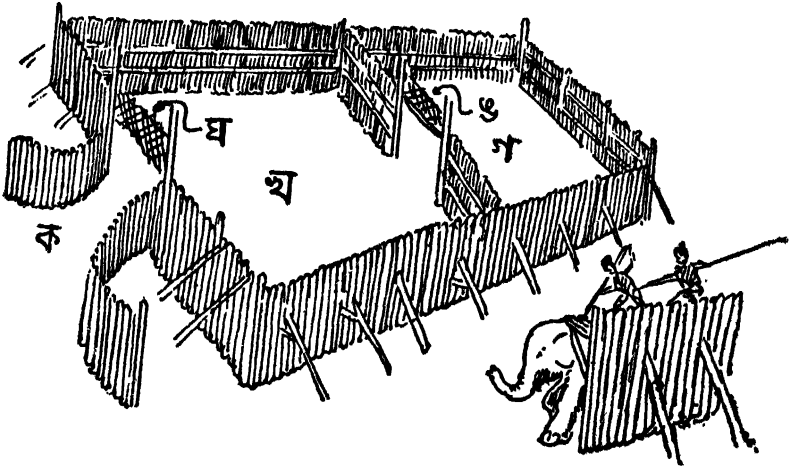
খেদা-শিকার

ক্রমশঃ সরু-হয়ে-যাওয়া একটা প্রবেশ-পথ থাকে। ঐ প্রবেশ-পথের উপর থাকে একটি শক্ত-বেড়া বা 'আগড়', যেটিকে উপরে উঠানো যায় অথবা নামানো যায় (ঘ-চিহ্নিত)। খ-চিহ্নিত খেদার প্রথম কামরা থেকে গ-চিহ্নিত দ্বিতীয় কামরায় যাবার পথে ঐ একই রকম আর একটি আগড় (ঙ-চিহ্নিত)। শিকারের প্রথম দিকে ঐ ঘ-আগড়টি তোলা এবং ঙ-আগড়টি নামানো থাকে। বন্যহস্তীর দলকে তাড়িয়ে নিয়ে এমনভাবে শিকারীরা এগিয়ে আসে যাতে দলের অনেকেই ঐ ফানেল আকারের প্রবেশ-পথ দিয়ে খ-চিহ্নিত অংশে ঢুকে পড়ে।

তখন প্রথম আগড়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যারা ভিতরে ঢুকেছিল তারা বন্দী হয়ে পড়ে।

প্রথম দু'-চারদিন বন্দীদের কোনভাবেই উত্যক্ত করা হয় না। জল ও আহার্যের অভাবে তারা ক্রমশঃ কমজোর হয়ে পড়ে। তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। বন্দীসংখ্যার হিসাব অনুসারে চার-পাঁচটি পোষমানা কুম্‌কি হাতীর পিঠে চার-পাঁচজন মাহুত ঐ খেদায় প্রবেশ করে। মাহুত ছাড়াও আর এক জাতের দুঃসাহসিক মানুষ কুম্‌কি হাতীর পিঠে লুকিয়ে খেদায় প্রবেশ করে। দেশভেদে তাদের নাম—ফান্দি, ফাঁশিয়াড়া, ফান্দাইত ইত্যাদি। মাহুত এবং ফান্দিরা থাকে একেবারে নেংটিসার। সর্বাঙ্গে হাতীর নাদ আর পাক মাটি লেপা! হাতীর ঘ্রাণশক্তি অবিশ্বাস্য রকমের প্রবল—চোখে না দেখলেও সে মানুষের গন্ধ হাওয়ায় পেয়ে বুঝতে পারে—লুকিয়ে মানুষ কাছে আসছে। ঐ পাঁক-মাটি সেই গায়ের গন্ধটা চাপা দিতে।

কুম্‌কি হাতীর পিঠে মাহুত আর ফান্দিরা নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে প্রথমটায়। কুম্‌কি হাতীর শিক্ষাও বড় অদ্ভুত। প্রথমটায় তারা এমন ভাব দেখায় যেন নেহাৎ আপন খেয়ালে তারা এসে পড়েছে ওখানে। আশপাশের গাছের ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে অন্যমনস্কভাবে চর্বণ করতে থাকে। ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। তারপর যেন হঠাৎ স্বজাতীয় কাউকে দেখতে পেয়ে বলে—এই যে, কী খবর? আপনারা কখন এলেন?

মাহুত কুম্‌কি হাতীর কানের পাশে চাপ দিয়ে একটি বিশেষ বন্য হাতীর দিকে তাকে চালিত করে। দুটি কুম্‌কি হাতী তখন সেই নির্বাচিত বন্যহস্তীর দু' পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারা ওর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। কুম্‌কি হাতী হচ্ছে মাদি হাতী—যার সঙ্গে প্রথম ভাব করবার চেষ্টা করে সেটা মদ্দা হাতী। ফলে কুশল পর্যায়ের পালা শেষ করে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক পাতানোর তাগিদ আসতে দেরি হয় না। এই অবসরে দুঃসাহসী ফান্দি কুম্‌কি হাতীর পিঠ থেকে নেমে পড়ে মাটিতে। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশটি বন্দীমাতঙ্গ যে ভূখণ্ডে নির্মম আক্রোশে ফুঁসছে সেখানে একেবারে নিরস্ত্র নেমে পড়ার সাহসটা বড় কম নয়। একেবারে নিরস্ত্র অবশ্য নয় সে, তার হাতে থাকে একগাছা কাছি। হরিণ অথবা মোষের চামড়া দিয়ে তৈরী অত্যন্ত দৃঢ় দড়ির ফাঁস। তার একপ্রান্ত ফান্দির হাতে, অপর প্রান্ত কুম্‌কি হাতীর বুকের সঙ্গে বাঁধা। অত্যন্ত সাবধানে কুম্‌কির দেহের আড়াল দিয়ে ফান্দি নিঃসাড়ে মাটিতে নেমে পড়ে এবং চিহ্নিত বন্যহস্তীর পিছন দিকের পায়ের কাছে সরে এসে অবসর খোঁজে। বন্দী হাতীর

মানসিক চঞ্চলতাটা স্বাভাবিক। মজা হচ্ছে, হাতী চঞ্চল হলেই সামনে পিছনে দুলতে থাকে—আর তাই বারে বারে সে দেহভার এ-পা থেকে ও-পায়ের উপর রাখে। ফলে বারে বারে পা মাটি থেকে তোলে ও নামায়। ফান্দি সুযোগমত ঐ ফাঁসটি বন্যহাতীর পিছনের পায়ে পরিয়ে দেয়। ব্যাপারটা ঐ জংলী হাতী ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই কুম্‌কি নিকটস্থ কোন গাছের ও-পাশে চলে যায় এবং গাছটাকে আলম্ব বা 'ফালক্রাম' হিসাবে ব্যবহার করে বন্যহাতীকে ঐ গাছের দিকে টেনে আনতে থাকে। দৃঢ় রজ্জুর একপ্রান্ত কুম্‌কির বুকে বাঁধা, ফলে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারে ; ও-প্রান্ত বন্দীর পিছনের পায়ে বাঁধা, ফলে সে তিনপায়ে ততটা জোর দিতে পারে না,—বেকায়দায় পড়ে সে হাত-পা ছুঁড়ে আস্ফালন শুরু করে। আর তার ফলে দ্বিতীয় ফান্দি তার অপর পায়ে, এবার হয়তো সামনের পায়ে দ্বিতীয় আর একটি ফাঁস পরিয়ে দেবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় কুম্‌কি তখন দ্বিতীয় গাছের সঙ্গে সেই রজ্জুটি জড়িয়ে দেয়।

বন্দীবীর এবার বাইবেল-বর্ণিত স্যামসনের মত আটক হয়ে পড়ে। একই উপায়ে একের-পর-এক কয়েকটি হাতীকে ধরা হয়। যেগুলিকে ধরলে লাভ হবে না, সেগুলিকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়ের কাজ—বন্দীহাতীকে পোষ মানানো। তার জন্য আছে দাইদার, সেবাইতের দল। ছেলে ও মেয়ে। তারা নানান কায়দায় ওদের পোষ মানায়, এমন কি গান গেয়ে এবং নেচে পর্যন্ত !

খেদা-প্রাচীরের উপরে চওড়া পাটাতন থাকে। তার উপর বর্শা ও ডাঙশ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরীর দল, যাতে বন্দীদল একযোগে দেহচাপ দিয়ে বেড়া না ভেঙে ফেলতে পারে। গ-চিহ্নিত দ্বিতীয় কামরাটা আছে কোন বিশেষ হস্তীকে দলচ্যুত করতে। কখনও কখনও বন্দীদলের দু'-একটি হাতী রীতিমত উন্মাদের মত আচরণ শুরু করে। তাকে তখন খোঁচা মেরে মেরে ঐ দ্বিতীয় কামরায় ঠেলে দিয়ে ঙ-চিহ্নিত আগড়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই খেদা-শিকার পদ্ধতির বিষয়ে কয়েকটি জিনিস তলিয়ে দেখার অপেক্ষা রাখে। প্রথমত, হাতী এত বুদ্ধিমান জীব হওয়া সত্ত্বেও মাহুত-চালিত কুম্‌কি হাতীর অস্তিত্বটা তারা বুঝতে পারে না। দল বেঁধে তারা কুম্‌কি হাতী অথবা তার চালককে আক্রমণ করে না। এমনকি প্রথম বন্যহাতীকে বেঁধে ফেলার পরেও ওরা কুম্‌কি হাতীর বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকাটা অনুধাবন করতে পারে না। তাছাড়া পোষমানা কুম্‌কি হাতী স্বজাতীয়ের এই নির্যাতনে কখনও বিদ্রোহ করেছে বলে শোনা যায় না। বুনো-হাতীকে ওরা এমন অদ্ভুতভাবে

তালিম দেয় যে, তারা বছরখানেক পরেই কুম্‌কি হাতীর চরিত্রে অভিনয় করতে রাজী হয়ে যায়। খেদা-ইতিহাসে স্পার্টাকাসের সন্ধান পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত। তৃতীয়ত, এইসব ফান্দিদের মজুরি অবিশ্বাস্য রকম কম। যে দুঃসাহসিকতা ওরা দেখায়—প্রাণের মায়া ত্যাগ করে—তার তুলনায় ওদের পারিশ্রমিক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খেদার ভিতর দলিত-পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করলে তাদের পরিবারবর্গকে অধিকাংশ সময়েই কোন খেসারত দেওয়া হত না। ওদের বীরত্ব এবং অসমসাহসিকতাটাকে কেউ যেন আমলই দিত না। বিখ্যাত হস্তীবিদ টেনেণ্ট-এর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে: "এইসব নিরক্ষর অজ্ঞাতপরিচয় ফান্দিদের দুঃসাহসিকতা স্পেনীয় মাটাডরদের তুলনায় শতাংশে বেশি—যদিও তাদের বীরত্বের কথা সভ্যজগৎ জানে না। বন্য বাইসনের সঙ্গে বুনো হাতীর দৈহিক ক্ষমতার কোন তুলনাই হয় না। তাছাড়া 'মাটাডর' একসঙ্গে একটি মাত্র বাইসনের মোকাবিলা করে, কিন্তু এই নিরস্ত্র ফান্দি যখন কুম্‌কি-সিঁড়ি বেয়ে খেদার এ্যাম্ফিথিয়েটারে নেমে আসে তখন তার চারপাশে অন্ততঃ পঞ্চাশটি বন্যহস্তী। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি এড়িয়ে ফান্দি স্বকার্যসাধন করে—যে-কোন একটি হাতী তাকে দেখতে পেলে তার অবধারিত এবং মর্মান্তিক মৃত্যু।"

টেনেণ্ট-সাহেবের বক্তব্যটি অসম্পূর্ণ। ট্র্যাজেডিটা মৃত্যুতেই শেষ নয়! তারপর তার পরিবার—স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অনাহার-মৃত্যুটাও আছে যবনিকা পতনের পরবর্তী পর্যায়ে।

শুধু কুম্‌কি হাতী নয়, ফান্দিদের ইতিহাসেও স্পার্টাকাস আজও অনাগত!

হাতীর বাজারে ক্রমশঃ মন্দা পড়ে আসতে থাকে। আগে বছরে যতগুলি হাতী সারা ভারতবর্ষে ধরা হত এখন তার চেয়ে অনেক অনেক কম হাতী ধরা হয়। তার কারণ শুধু এই নয় যে, ভারতবর্ষে বন্যহাতীর সংখ্যা কমে গেছে। তার আরও অনেকগুলি কারণ আছে। জাহাজে অথবা নৌকায় মাল বোঝাই করার কাজে আজকাল আর হাতীর প্রয়োজন হয় না। ক্রেনের সাহায্যে সে-কাজ করা হয়। বন থেকে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সভ্যজগতে চালান করার প্রয়োজনেও হাতীর ব্যবহার কমে এসেছে। অরণ্য অঞ্চলে বনপথের প্রসার হচ্ছে ক্রমশঃ—লরি যায় ও-সব এলাকায়। কাঠ-চেরাই-এর কল বসছে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা চালু হবার পর। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি আর বেশিদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় না। জঙ্গলের কাছে-পিঠেই চেরাই হয়ে যায়। সার্কাসের সংখ্যা যথেষ্ট কমে এসেছে, সিনেমা এবং টেলিভিসান চালু হবার পর। একমাত্র

বিদেশের চিড়িয়াখানাতেই ভারতীয় হাতী আজকাল চালান যায়। কিন্তু জাহাজে পাঠালে সময় এবং খরচ পড়ে বেশি। সবচেয়ে মুশকিল দীর্ঘদিন জাহাজে হাতীর খোরাক যোগাড় করা। তাই আজকাল বিদেশের চিড়িয়াখানায় যে-সব হাতী রপ্তানী করা হয় তারা যায় প্লেনে। এজন্য ছোট মাপের হাতীর চাহিদাই বেশি। হাতী সাড়ে ছ' ফুটের চেয়ে বেশি উঁচু হলে তা প্লেনের দরজা দিয়ে গলতে পারে না। অথচ এত খরচ-পত্র করে খেদা-শিকারে বাচ্চাহাতী যে ধরা পড়বেই এর নিশ্চয়তা কোথায়?

এ-ছাড়া আর একটি পদ্ধতিতে হাতী-শিকার করা হয়। হয় নয়, হত। তার ব্যাপক ব্যবহার ছিল না—মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারে সে পদ্ধতি ছিল সীমিত। তারই নাম—ফাঁসি-শিকার। খেদার তুলনায় এ পদ্ধতিতে একটা মস্ত সুবিধা এই যে, আয়োজন অপেক্ষাকৃত সামান্য এবং পছন্দমত একটি হাতীকেই ধরে আনা চলে। মাত্র দুটি কুম্‌কি হাতী এবং দু'জন মাত্র শিকারীর প্রয়োজন। একজন 'ফাঁসিয়াড়' এবং অপরজন তার 'সাকরেদ'। আর প্রয়োজন একগাছা অত্যন্ত শক্ত কাছির। না, আরও একটি জিনিস অপরিহার্য। ঐ দু'জন শিকারীর অদ্ভুত শিক্ষা এবং মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস।

সূর্যকান্ত বড়গোঁহাই নিজে হাতে ঐভাবে শিকার করতেন। তাঁর সাকরেদ ছিল ঐ গণেশ-সর্দার। গণেশ বস্তুত ছিল হেড-জমাদার। বিভিন্ন পদমর্যাদা-সম্পন্ন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সি. ইন. সি.-র যে সম্পর্ক—মাহুত, দাইদার, ফান্দি, কুলি, মাঝি, খিদমদগার বেষ্টিত এই হস্তি-ব্যবসায়ে হেড-জমাদারের ভূমিকাটাও তাই। কিন্তু লক্ষ্মণ-সর্দারের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর কর্তামশাইয়ের সঙ্গে সর্বাঙ্গে কাদামাটি মেখে গণেশ জমাদার যেদিন ফাঁসি-শিকারে প্রথম সাকরেদী করল, সেদিন কর্তা খুশি হয়ে তাকে খেতাব দিলেন: সর্দার। লক্ষ্মণ-সর্দারের শূন্য আসনে উন্নীত হল গণেশ। সে আজ যাট-বাষট্টি বছর আগেকার কথা। সেই থেকে হেড-জমাদার গণেশের নাম গণেশ-সর্দার।

সূর্যকান্ত গত হয়েছেন বাংলা ১৩৪২ সনে, ছাপ্পান্নো বছর বয়সে। গণেশ-সর্দারের বয়স তখন ছিল দু'-কুড়ি পাঁচ। আজ সে বিরাশি বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ঐ দু'জন প্রভু-ভৃত্য জোট বেঁধে ফাঁসি-শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। যতদিন না তাঁরা ফিরে আসতেন ততদিন বাড়ির লোক আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে প্রহর গুনত। সূর্যকান্তের পাট-হাতী ছিল বিমলা—ঐ যার প্রতিমূর্তি সসম্মানে রাখা আছে এ বাড়ির প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে, সিমেন্ট বাঁধানো বেদীর উপরে। যার চারপাশে এককালে সাজানো ছিল

ফুলের কেয়ারি। আর গণেশ-সর্দারের বাহন ছিল 'নাজনি'। সেও দেহ রেখেছে অনেক দিন। বিমলা আর নাজনি ছিল দুই বোন। প্রভু-ভৃত্য নেংটিসার অবস্থায় সর্বাঙ্গে হস্তীর নাদ আর পাঁক-মাটি মেখে ভূতের মত চড়ে বসতেন দুই বোনের পিঠে। সূর্যকান্তের ঘ্রাণশক্তি ছিল হাতীর মত। গহন অরণ্যের মাঝে বিমলাকে দাঁড় করিয়ে তিনি সোজা হয়ে বসতেন। বাতাসে গন্ধ শুঁকতেন। কথা বলা মানা, তাই বিমলার কানের পাশে চাপ দিয়ে তাকে অরণ্যের একদিকে চালিত করতেন। অনুগমন করত গণেশ তার নাজনিকে নিয়ে। অনিবার্যভাবে তাঁরা এসে উপস্থিত হতেন কোন হস্তিযূথের সামনে। বন্যহাতীরা সর্বদাই দল বেঁধে থাকে। এক-এক দলে বিশ-ত্রিশ, কখনও বা একশ' হাতীর মিছিল। সে দলের দলপতি চলে সবার আগে। মদ্দা নয়, সাধারণতঃ বৃহদায়তন কোন হস্তিনীই হয় দলের পরিচালিকা—তারই স্থান সর্বাগ্রে। শক্তিশালী কোন মদ্দা হাতী থাকে দলের পিছনে, সবার শেষে। মাঝখানে থাকে বাচ্চারা, এবং অল্পবয়স্করা। সূর্যকান্ত আর গণেশ তাঁদের পোষাহাতীর পিঠে লুকিয়ে ঐ হাতীর দলে ভিড়ে যেতেন। কখনও কখনও আট-দশ ঘণ্টা সুযোগের অপেক্ষায় তাঁদের দু'জনকে নিঃসাড়ে ঐ দলের সঙ্গে চলতে হত। আহার তো দূরের কথা, এক ফোঁটা জলও পান করতে পারতেন না। প্রকৃতির কোন আহ্বানে সাড়া দিতে পারতেন না। যেন যোগমগ্ন সন্ন্যাসী! তারপর সুযোগমত সূর্যকান্ত কোন বন্যহস্তীকে বেছে নিতেন। বিমলাকে সুকৌশলে চালিত করে তার একপাশে এসে হাজির হতেন; অপরদিক থেকে গণেশও নাজনিকে ভিড়িয়ে দিত। তারপর কোথাও কিছু নেই কর্তা বিকট 'দোহার' দিয়ে উঠতেন। দোহার আর কিছু নয়, বিকট চিৎকার! বুনো হাতীর ধর্মই হচ্ছে এই যে, ভয় পেলে সে শুঁড়টা উপরে তুলে ফেলে। এটা তার সহজাত সংস্কার—যাতে শুঁড় বেয়ে কোনো জন্তু তার মাথাটা আক্রমণ করে না বসতে পারে। ফলে ঐ বন্যহাতীটাও দোহার শ্রবণমাত্র শুঁড়টা উঁচু করে। পরক্ষণেই সূর্যকান্ত তাঁর হাতের ফাঁসটা ছুঁড়ে মারতেন ওর গণ্ডকুম্ভ লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য! ফাঁসটি হাতীর শুঁড়ের ভিতর গলে যেত এবং আটকে যেত। হাতীর শুঁড় খুব স্পর্শকাতর—বন্যহাতীটা মনে করত কোন লতাপাতা বুঝি তার শুঁড়ে জড়িয়ে গেছে! চমকে উঠে, সে ঐ লতাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করত। ইতিমধ্যে সূর্যকান্ত ঐ ফাঁসের অপর প্রান্তটা ছুঁড়ে দিতেন শাকরেদকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তমধ্যে গণেশ সেটা লুফে নিত এবং আটকে দিত নাজনির বুকে বাঁধা কাছিটার লোহার আঙটায়। এতক্ষণে বুনো হাতীটা হয়তো ভয় পেয়ে ছুটতে

আরম্ভ করেছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে তার সঙ্গে সমানতালে ছুটে চলা দু'পাশের দুটি হাতীর সঙ্গে সে বাঁধা পড়ে গেছে! তা সত্ত্বেও সে ছুটত প্রাণভয়ে। বনজঙ্গল ভেঙে দু'পাশের দুটি কুম্‌কি হাতীও ছুটতে থাকে একই গতিতে। কখনও কখনও পাঁচ-সাত ঘণ্টাও এইভাবে তিন-তিনটে হাতী এক-নাগাড়ে ছুটে চলত অরণ্যরাজ্যে প্রচণ্ড ত্রাসের সঞ্চার করে। যেন অতীত যুগের তিমি-শিকারী ওঁরা। দুই শিকারী অপূর্ব কৌশলে আঁকড়ে ধরে থাকত নিজ নিজ কুম্‌কির পিঠের কাছি। কিছুই তাদের করণীয় নেই এছাড়া। থামতে পারা যাবে না, পড়ে গেলেই অবধারিত মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত ঐ দুটি কুম্‌কি হাতীর সাহায্যে বন্দীকে জব্দ করা হত। তার কায়দাটাও বড় অদ্ভুত। দম নেবার জন্য বুনো হাতীটা যেই দাঁড়িয়ে পড়ে কুম্‌কি হাতী অমনি কোন শক্ত গাছের চারদিকে এক পাক ঘুরে আসে। বন্দী চলবার উপক্রম করতেই দেখে সে গাছের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গেছে। চীৎকার করে ওঠে তখন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কুম্‌কি দ্বিতীয় একটি গাছের চারদিকে ততক্ষণে পাক দিয়ে নেয়। এতক্ষণে ফাঁসিয়াড আর সাকরেদ মাটিতে নামবার সুযোগ পান। কারণ বন্যহস্তীটি তখন দুই গাছের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ!

শিকার-পদ্ধতিটা অবিশ্বাস্য, তবু আদ্যন্ত সত্য। কোন উর্বর মস্তিষ্ক ঔপন্যাসিকের মস্তিষ্ক এর গোমুখ নয়! বন্যহস্তী পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে থাকে—আফ্রিকায়, ভারতে, সিংহলে, বর্মায়, শ্যাম, কাম্বোজে। নানান পদ্ধতিতে নানান দেশে হাতীধরার কায়দাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি নিরস্ত্র মানবশিশু সামান্য একগাছি ফাঁসের সাহায্যে শুধুমাত্র হাতের কায়দায় একটি বন্যহস্তীকে বন্দী করার চেষ্টা অন্য কোথাও কখনও করা হয়েছে বলে শুনিনি। আসামের কয়েকটি পরিবারে সঙ্কীর্ণ পরিসরে এই ফাঁসি-শিকার যে এই সেদিনও টিকে ছিল তা জানা গেছে।

প্রশ্ন হতে পারে: আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে যখন হাতীর আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দার কোনও আভাসই ছিল না, তখন সূর্যকান্তের মত ধনী ব্যবসায়ী কেন এ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ফাঁসি-শিকারে যেতেন? এর চেয়ে অনেক সহজে তিনি খেদা-শিকারে একসঙ্গে অনেক হাতী ধরতে পারতেন। বস্তুত তা তিনি ধরতেনও। তাহলে স্বেচ্ছায় প্রতি বছর শীতের শেষে এ-ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি কেন হতেন তিনি—আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুর নিষেধ সত্ত্বেও?

এ-প্রশ্ন তাঁকে কেউ করেছিল কিনা জানা যায় না, তবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, নিতান্ত নেশার ঝোঁকেই এ-ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেন

তিনি। নেশার মত জঙ্গল তাঁকে টানত। এটা খেলাই ছিল তাঁর কাছে, শুধু খেলাই। মনে হয়, যে কারণে লোকে যুগ যুগ ধরে এভারেস্ট জয় করতে ছুটেছে, দক্ষিণ-মেরুতে প্রথম পদার্পণ করতে ছুটেছে, অথবা চাঁদের পথে মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছে—হয়তো সেই কারণেই এই মরণদোলায় দোল খেতে যেতেন সূর্যকান্ত গভীর অরণ্যে।

না! বোধহয় তুলনাটা ঠিক হল না। ঐসব অভিযানের পিছনে অর্থ-নৈতিক লাভের দিকটা ছেড়ে দিলেও আরও একটা প্রকাণ্ড লাভের আকর্ষণ ছিল। সেটা হচ্ছে—প্রচার। বিখ্যাত হওয়ার তাগিদ। অসংখ্য মৃত্যুবরণ-কারী শেরপাকে দুনিয়া ভুলে গেছে—সম্মান পাচ্ছেন তেনজিং নোরকে! রবার্ট ফ্যালকন স্কট অমর হয়ে আছেন দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাসে। সে লোভ কিন্তু ছিল না সূর্যকান্ত অথবা তার সাকরেদ গণেশ-সর্দারের। এই অসম-সাহসিক শিকার-পদ্ধতির কোন প্রচারের ব্যবস্থা তিনি করেন নি—শুধু তার ইতিহাসটুকু লিখে রেখে গেছেন হাতে-লেখা রোজনামচায়। উনি বলতেন, এটা ওঁর কাছে ধর্মের অঙ্গ। পূর্বপুরুষের তর্পণ!

শীতকালে সে আমলে অনেক বড় বড় শিকারী আসতেন ওঁদের বাগানে। সাহেব-সুবো, রাজা-মহারাজার দল। ভারি ভারি রাইফেল হাতে। মাচা বেঁধে বাঘ মারতেন, হাতীর পিঠে বসে হাতী মারতেন, আর বিল উজাড় করে মেরে নিয়ে যেতেন শীতালী পাখীর দল। সেখানে কিন্তু সূর্যকান্তকে বড় একটা দেখা যেত না। শিকার সেরে সাহেব-সুবোর দল ফিরে আসতেন সান্ধ্য-আসরে—সুরা আর নর্তকী নিয়ে শিকারীর দল মাতোয়ারা হয়ে যেত। সূর্যকান্ত সে আসরেও বসতেন না—যাবতীয় ব্যবস্থা করে সরে আসতেন। তখন হয়তো গণেশ-সর্দার ঘনিয়ে আসত। যেন বলত—'প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ/এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ। জগতে আমাদের বিজন সভা—কেবল তুমি আর আমি। সেথায় আনিও না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে, স্বামী!'

প্রতাপ রায়ের মতই হাসতেন সূর্যকান্ত এ বরজলালের কথায়!

সূর্যকান্তের জীবনে শেষ শিকারের কাহিনীটাও বিস্তারিতভাবে উদ্ধার করা গেল। তার কিছুটা পাওয়া গেল রোজনামচায়, কিছুটা ওঙ্কারনাথজীর, জবানীতে—আর বাকিটা পাদপূরণ করল গণেশ-সর্দার তার অসমীয়া মিশ্রিত স্মৃতিচারণে।

সেটা ইংরাজি ১৯৩৫ সাল। সূর্যকান্তের বয়স তখন পঞ্চান্ন, গণেশ-সর্দারের পঁয়তাল্লিশ। গণেশ বেশ কয়েক বছর ধরেই বলে আসছে—'কর্তা আর কেন?'

বয়স হল, এবার ছাড়ান দেন ও নেশা।' কিন্তু সূর্যকান্ত কর্ণপাত করতেন না। বলে বলে হার মেনেছেন সূর্যকান্তের স্ত্রী ভবতারিণী। তাঁর ছেলেরা তখন বড় হয়েছে। প্রণবেশের বিয়ে হয়ে গেছে, ওঙ্কারনাথ বই-পত্রের মধ্যে ডুবে আছে আর ছোট ছেলে লালচাঁদ তখন পনের বছরের কিশোর। বধূ হয়ে এ বাড়িতে আসা থেকেই ভবতারিণী কর্তাকে বারণ করে এসেছেন। এখন আর করেন না। হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

গণেশ-সর্দার তখন যেখানে থাকত—এখনও সেখানেই আছে—ঐ হাতিশালা সংলগ্ন কুটিরগুলির একটাতে। মাহুত আর ফন্দিয়ারদের একটা বস্তী। খান দশ-বারো টিনের চালা। তার সবচেয়ে ভাল ঘরটা ছিল গণেশ-সর্দারের। সংসারে তখন তার একমাত্র পুত্র পুণ্ড আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ময়না। পুণ্ডরীক ওর প্রথম পক্ষের সন্তান, বছর সাতেক বয়স তখন তার, আর ময়না সদ্য এসেছে ওর সংসারে। ওর চেয়ে বিশ বছরের ছোট। বস্তীর সকলেই ওকে বারণ করেছে, বলেছে বুড়োকর্তার বয়স হয়েছে। তিনি না হয় ক্ষ্যাপা মানুষ, গণেশ রাজী না হলে তিনি কেমন করে যাবেন ? বারণ তাকে করেছে সবাই—গণেশের বুড়ি মা, দীন মহম্মদ, তার ছেলে দিলদার, লক্ষ্মণের ছেলে মতিয়া এবং সদ্য-বিবাহিতা নববধূ ময়না। মায় ভবতারিণীও একবার তাকে আড়ালে ডেকে কথাটা বললেন। গণেশ মাথা নিচু করে রইল, জবাব দিল না। বস্তুত গণেশ সেবার স্থির করেই রেখেছিল বুড়োকর্তাকে সরাসরি আপত্তি জানাবে। কিন্তু মুশকিল হল সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে বসায়। কর্তা যদি ভেবে বসেন সদ্য-বিবাহিত গণেশ-সর্দার নিতান্ত স্ত্রৈণ বলেই এবার আপত্তি করছে ?

শিকারের মরশুম শুরু হয়েছে। গণেশ দুরু-দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করছে। কখন হঠাৎ ডাক আসে তার। সকাল-সন্ধ্যা ময়না ওকে পাখিপড়া করে শেখায়—কর্তামশায়ের লোক ডাকতে এলে সে কী বলবে। নববধূর স্বাস্থ্যটি নিটোল, কিন্তু তার জিহ্বাটিও ক্ষুরধার। বিশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও গণেশ-সর্দার ময়নার মন জয় করেছিল। ময়না মাহুত-পাড়ারই মেয়ে। তার ছেলে-বেলা থেকেই তাকে দেখে এসেছে গণেশ। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ঐ নাবালকটিকে রেখে মারা যাওয়ায় যখন সকলে বললে ময়নাকে বিয়ে করতে, তখন ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিল গণেশ। বয়সের তফাতের কথাটা ভেবে। বিয়ের পর ময়না কিন্তু বেশ মানিয়ে নিল। দীন মহম্মদের তাগড়াই জোয়ান ছেলেটা—ঐ দিলদার এসে মাঝে মাঝে বাঁকা রসিকতা করত বটে; কিন্তু ময়নাকে নিয়ে সুখীই হয়েছিল গণেশ-সর্দার।

বড়কর্তার কাছ থেকে আহ্বান আসার একটা বিশদ বর্ণনা দিল গণেশ-সর্দার। কথা হচ্ছিল ক্যাভিয়ের ঘরের সামনে বারান্দায়। ক্যাভিয়ে বসে ছিল একটি আরাম-কেদারায়, কুহুও শুনছে বসে গণেশ-সর্দারের স্মৃতিচারণ। গণেশের কথা মাঝে মাঝে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে উঠলে কুহু ভাষ্যকারের কাজ করছে। খালিগায়ে মেঝের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে অশীতিপর গণেশ প্রায় চল্লিশ-বছর আগেকার গল্প বলছে :

শেষ পর্যন্ত যা ভয় করেছিল তাই হল। শীতান্তে এক পাতা-ঝরার দিনে হঠাৎ আচমকা দক্ষিণা বাতাসের মত গণেশের কাছে এসে পৌছলো বড়কর্তার ডাক। জঙ্গলের ডাক। ষড়দন্ত-গজরাজের দ্বৈরথ সমরের আহ্বান! গণেশ তখন দাওয়ায় বসে নারকেলের পাতা দিয়ে একটা চাটাই বুনছে, ওর নববধূ ময়না ঘরের ভিতর কাঠের উনানে ভাত রাঁধছে আর ওর বুড়ি মা দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। এমন সময় এল বড়কর্তার ডাক। এল তাঁর খাস-চাকর কনকের মাধ্যমে। কনকের আবির্ভাবের একটি নিখুঁত বর্ণনা দিল গণেশ : কনক এটা অলপ লেতেরা বটে। গেঞ্জি আরু এটা হাপ্‌পেণ্ট পিন্ধি হাতত এটা চিনাবাদমর খোঙা লৈ কনক প্রবেশ করিলে। সি খোঙার পরা উলিয়াই বাদামর বাকলি গুচাই এটা-এটা কৈ খাই থকা দেখা যায়!

ক্যাভিয়ে অসহায়ের মত ভাষ্যকারের দিকে তাকায়। কুহু খিলখিল করে হেসে ওঠে। গণেশকে বলে, অত বিস্তারিত করে বলতে শুরু করলে গল্প শেষ হতে যে রাত কাবার হয়ে যাবে গণেশ-দাদু! চল্লিশ বছর আগে কনক গেঞ্জি পরে চিনাবাদামের খোলা ছাড়াচ্ছিল কিনা সে গল্প তোমায় করতে হবে না। তারপর কি হল বল?

গণেশ লজ্জা পায়। কাহিনী সংক্ষেপ করে। বলে :

কনককে দেখেই তার সব ভুল হয়ে গেল। পাখিপড়া করে ময়না যা শিখিয়েছিল তা ওর আর বলা হল না। রক্তের মধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত একটা উন্মাদনা এল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। চুপিসারে কনককে বিদায় করে সে উঠে পড়ে। এক নজর ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখতে যায় ময়না ব্যাপারটা টের পেয়েছে কিনা। তারপর মাথায় পাগড়িটা বেঁধে রওনা দিতে যাবে, হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ময়না। দু'হাতে দরজার দু'পাল্লা ধরে পথ আটকায়। গম্ভীরস্বরে বলে, ময় তোক বার বার মনা করিছোঁ নহয়?

গণেশ করুণস্বরে মিনতি করে, ময় কী করিম? কহ? দেউতা ডাকিছে, ময় নশুনিম কি?

তবু পথ ছাড়ে না ময়না। দুয়ার রুখে দাঁড়িয়েই থাকে। তার চোখ দিয়ে তখন আগুন বার হচ্ছে! সে বুঝে নিয়েছে কর্তামশাই আজ কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তার মরদকে! সেই মরণখেলা! গণেশ সাগরেদ না হলে বুড়াকর্তার যে খেলা হয় না! বুড়াকর্তার সখ থাকে তিনি যান না! ময়নার তাতে কি? কিন্তু এত লোক থাকতে গণেশের উপরেই বা তাঁর নজর কেন? না! পথ সে ছাড়বে না! যেতে দেবে না গণেশকে! মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে ওঠে, নহয়! নিদিম! নিদিম!

হঠাৎ ক্ষেপে গেল গণেশ। আচমকা চীৎকার করে ওঠে সে, ওলা! ওলা! এতিয়াই ওলা! ন-হলে বাঢ়নির কোবত তোর পিঠ এতিয়াই চিরলা-চিরলি করি দিম!

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ময়না। এতবড় কথাটা বলতে পারল গণেশ? প্রৌঢ় স্বামীর কাছে যৌবনবতী নববধূ এতদিন শুধু অনুনয়-বিনয় আর সোহাগের কথাই শুনে এসেছে। মাত্র মাস-ছয়েক সে এসেছে এ সংসারে। অল্পবয়সী স্ত্রীর মন পাবার জন্য এতদিন কী আকুতিই না ছিল ঐ গণেশের! আর সেই গণেশ-সর্দার আজ তাকে বলতে পারছে—দূর! দূর! দূর হয়ে যা এখান থেকে। না হলে সে নাকি ময়নার পিঠ প্রহারের চোটে ফালা ফালা করে দেবে!

কথা সরল না ময়নার মুখে। বাঁশের খুঁটি ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওপাশে একতাল গোবর নিয়ে দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিল গণেশের মা। বুড়ি চোখে ভাল দেখে না, কানেও ভাল শোনে না। তবু গণেশের উচ্চকণ্ঠ কানে গিয়েছিল তার। ওখান থেকেই বলে ওঠে—কী হৈছে? চিঞঁরিছা কিয়?

গণেশ এবার মায়ের দিকে ফিরে বলে ওঠে, কিয় চিঞঁরিছোঁ সি-কথা শুনিবি পিছৎ! এইক এতিয়াই ঘরর পরা দূর কর—এতিয়াই!

গোবরমাখা হাত দু'খানি মুছবারও অবকাশ পায় না ওর মা। এ কী হল? গণেশ তার বউকে তাড়িয়ে দিতে বলছে? ছুটে আসে সে। ব্যাপার কি? নববধূর সঙ্গে তার সম্পর্কটা এমন কিছু মধুর নয়। তবু এখন সে বধূর পক্ষ নিয়েই বলে, ময়নায়ে এনে কী গুণাহ্ করিলে যে, তারবাবে তয় তেওঁক ঘরর পরা বিদায় হৈ যাবলৈ কৈছা?

ততক্ষণে নিঃশব্দে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে ময়না। গণেশ-সর্দারের নির্গমন পথে আর সে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। স্বামীর ভয়াবহ মৃত্যুর আশঙ্কাতেই না সে বাধা দিতে এসেছিল? সে অপরাধ যদি ওর কাছে এতই গুরুতর মনে হয় যাতে তাকে 'ওলা—ওলা' পর্যন্ত বলা যেতে পারে, তখন আর ময়না বাধা দেবে না।

গণেশ ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মনে কিন্তু সে শান্তি পায় নি। তার বার বার মনে হয়েছিল এভাবে রাগারাগি করে চলে আসাটা তার ঠিক হয় নি। এ-বড় ভীষণ খেলা, বড় মারাত্মক খেলা। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। মনকে বিচলিত করতে নেই। সে তো দেখেছে! বড়কর্তা যাত্রার আগে তাঁর কুল-দেবতা 'মিত্রদেব'-এর স্থানে গিয়ে পুজা দেন। মা ভবতারিণী স্বহস্তে দেবতার মাঙ্গলিক দিয়ে সাজিয়ে দেন বড়কর্তাকে। কপালে দেন রক্তচন্দনের ফোঁটা, মাথায় ঠেকান কুল-দেবতার আশীর্বাদী নির্মাল্য। এ যে ধর্মের একটা অঙ্গ! আদিপুরুষ 'সোহুত্তর'-এর দেওয়া প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করছেন ওঁরা। বড়কর্তা সকলকে আদর করে, ভবতারিণীর কাছে বিদায় নিয়ে, শেষবার দেবতাকে প্রণাম সেরে শান্ত-সমাহিত চিত্তে রওনা দেন। অথচ সে ঝগড়া করে বেরিয়ে এল!

কাজটা ভাল হয় নি। রাগারাগি করতে নেই। চোখের জল ফেলতে মানা! প্রিয়জনের শুভেচ্ছা আর গুরুজনের আশীর্বাদই যে এই মরণখেলায় পাথেয়। গণেশ জানত, মুখে যতই রাগ দেখাক, ময়নার চোখ দুটিও অশ্রুসজল হয়ে থাকবে যতদিন না সে নিরাপদে ফিরে আসে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে চিরাগ জ্বালাবার সময় মাথাটা আর সে তুলতে চাইবে না! সিঁথিতে সিঁদুর পরবার সময় হাতটা তার কেঁপে যাবে! সারাদিন কাজের মাঝে আনমনা হয়ে যাবে। ওর অন্তরে প্রতিনিয়ত বাজতে থাকবে মাহুত-ঘরণীদের সেই অতি-প্রচলিত লোকগাথার অনুরণন: 'তুমি গেইলে কি আসিবে মোর মাহুত-বন্ধু রে!'

না! এ ভুল আর সে করবে না। গণেশের কী দোষ? সে তো আসতে চায়ই না! কিন্তু ঐ বড়কর্তার ডাকে যে তার সব ভুল হয়ে যায়! তাছাড়া দিলদার কেন তাকে নিয়ে অমন কদর্য রসিকতাটা করেছিল? কেন বলেছিল— বুড়োবয়সের কচিবউ পাহারা দিতে গণেশ-সর্দার এবার ফাঁসি-শিকারে যাবে না? কী ভেবেছে বেটা? দিনরাত ময়নার পিছন পিছন ঘুর-ঘুর করে! গণেশ কি লক্ষ্য করে নি নাকি? ফিরে এসে দিলদারকে সে একহাত দেখে নেবে!

কিন্তু ফিরে সে আসবে তো? যে অমঙ্গলময় যাত্রা হল এবার।

মনে আছে, সেবার ওরা গিয়েছিল টুকুরসোবাঙের ওদিকে, ময়নামতি ছাড়িয়ে। ইসলামবাজারকে ডাইনে ছেড়ে। প্রায় গারো-পাহাড়ের সীমান্তে। প্রতিবারের মতই সূর্যকান্ত মাঝে মাঝে হাতীর পিঠে উঠে দাঁড়ান। বাতাসে কী যেন আঘ্রাণ করেন, তারপর বিমলাকে চালিত করেন একদিকে।

সন্ধ্যাবেলা ওঁরা এসে পৌছলেন সারাঙের পারে। সারাঙ হচ্ছে একটা পার্বত্যনদী—গদাধর নদের শাখানদী। নদী এখানে অবশ্য আসলে একটা পার্বত্য ঝারোকা। উপলবন্ধুর নদীগর্ভে এক বিঘৎ জল আছে কি নেই। কিন্তু কী মিষ্টি সে জল! কী ঠাণ্ডা!

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গাছে গাছে ফিরে আসছে ক্লান্ত পাখির দল। তাদের কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে নদীতীর। সারাঙ নদী পাহাড়ের উপর থেকে ধা-ধা ধিন-ধা করে নাচতে নাচতে নেমে এসে এখানে ছোট্ট একটি জলপ্রপাতে একেবারে তেহাই-এর বোল তুলেছে। জলের শব্দে আর পাখির কাকলীতে সান্ধ্যসঙ্গীতের আসরটা জমেছে ভাল। গাছে গাছে কাঠবিড়ালীদের নাচ। এক জোড়া চিত্রল হরিণ জল খেতে এসেছিল—হঠাৎ বিমলাকে দেখতে পেয়ে ছুটে পালালো। একঝাঁক হুইসলিং টীল উড়ে গেল নদী-বক্ষ থেকে—নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আবার ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়ল জলে।

চুনট-করা ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবিতে যে জমিদার সূর্যকান্ত বড়-গোঁহাইকে সারা বছর দেখতে অভ্যস্ত আজ তাঁকে গণেশ-সর্দার দেখছে একেবারে নেংটিসার। সর্বাঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। হাতী দুটোকে খুলে দিলেন ওঁরা। এবার ওরা জল খাবে, জল নিয়ে গায়ে ছিটাবে আর বাঁশের-কোঁড় তুলে চিবাবে। নদীর ধারে ধারে সরু বাঁশের বন—বেত আর বাঁশ। আর আছে আসাম জঙ্গলের কৈঁদ, আসন, গামহার, পিয়ার, পইসার, পনহার ইত্যাদি।

গণেশ তার মাথার গমাছাটা মাটিতে পেতে সান্ধ্য-নামাজ পড়ল পশ্চিমমুখো হয়ে। তারপর পুঁটুলি থেকে শালিধানের চিড়ে আর আখের গুড়ের ডেলাটা বার করল। চিড়েটা ধুয়ে নিয়ে এল গামছায় বেঁধে ঐ সারাঙের জলে। একটা পাথরের উপর বিছিয়ে দিল খুলে। গুড়ের ডেলাটা দু'টুকরো করল। তারপর একই গামছা থেকে পরম্পরাক্রান্ত জমিদার সূর্যকান্ত আর তাঁর ভৃত্য গণেশ সায়মাশ শুরু করলেন 'চুঁরা-গুড়' সহযোগে। প্রথম প্রথম এ ব্যবস্থায় ঘোরতর আপত্তি জানাতো গণেশ—কিন্তু সূর্যকান্তও তাঁর জেদ ছাড়তেন না। ক্রমে তিনি গণেশকে এই জ্ঞান দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ফাঁসি-শিকারের আসরে উনি জমিদার নন—সেখানে ওঁরা দুই বন্ধু। যাত্রার আসরে অভিনয় করবার সময় অভিনেতাদের যেমন মনে রাখতে নেই আসরের বাইরে বাস্তব জগতে তাদের কী সম্পর্ক, এখানে এই ফাঁসি-শিকারের আসরেও তেমনি ভুলে থাকতে হবে ফাঁসিয়াড় হচ্ছেন প্রভু, আর সাকরেদ তাঁর বেতনভুক ভৃত্য। আদিপুরুষের নির্দেশে ওঁরা এসেছেন যজ্ঞ করতে—একজন ঋত্বিক, একজন তন্ত্রধার! তাই

চিড়াগুড় আহারান্তে সূর্যকান্ত যখন চুটকা বার করে দিলেন তখন অনায়াসে সেটা ধরিয়ে ফেলে গণেশ।

কিন্তু তার পরেই হল বজ্রপাত। বড়কর্তা বলে বসলেন, গণেশ, এবার আমাদের খেলায় ঠাঁই বদল হবে। তুই ছুঁড়বি ফাঁস, আমি তোর সাকরেদ!

চিড়ে খাওয়া শেষ হয়েছিল গণেশের ; কিন্তু মনে হল একটা চিড়ের পিণ্ড ওর গলায় আটকে গেছে। আজ সওয়া কুড়ি বছর সে সাকরেদী করে এসেছে! ফাঁস সে জীবনে কখনও ছোঁড়ে নি! আর কর্তা স্বয়ং উপস্থিত থাকতে সে কেন ফাঁসিয়াড় হতে যাবে? বলেও সে-কথা—কিয় দেউতা? ময় কী অপরাধ করিলোঁ?

—অপরাধের কথা না রে গণেশ। আমি বুড়ো হয়েছি—দু'কুড়ি পনের বয়স হল আমার। এর পর হয়তো আর আসতে পারব না। তাই বলে কি 'সোহুত্তর'-এর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়ে যাবে? তোকে শিখিয়ে দিয়ে যাই—তুই সুযোগমত কোন সাকরেদ যোগাড় করে নিবি।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় গণেশ, নহয়, নহয় দেউতা! ময় ন-পারিম। আপুনি মোক সি আদেশ ন-করিব! মোক নেমারিব দেউতা!

সূর্যকান্ত ওকে নানাভাবে বোঝাতে থাকেন ; কিন্তু গণেশও অটল। দেউতা উপস্থিত থাকতে সে কিছুতেই ফাঁসিয়াড় সাজতে রাজী নয়। অন্তত এ-বছর নয় ; এ-বছর তার মনটা চঞ্চল আছে। ঘরে ঝগড়া করে এসেছে—একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মনটা তার ভারাক্রান্ত। সূর্যকান্ত ওকে বোঝান—তাঁর অবর্তমানে গণেশকেই ফাঁসিয়াড় হতে হবে। ফাঁস ছুঁড়তে আর কেউ জানে না। চেষ্টা করলে সাকরেদ হয়তো গণেশ যোগাড় করতে পারবে, কিন্তু ফাঁসিয়াড় সে পাবে কোথায়? যড়দন্ত-গজরাজের কাছে যে কথা দেওয়া আছে শত্রুভাবে তাঁকে ভজনা করতে হবে!

গণেশ কিন্তু অনমিত। বারে বারে বলে, এ বছর নয়, আসছে বছর।

হা-হা করে হেসে ওঠেন সূর্যকান্ত। বলেন, হ্যাঁরে গণেশ, এইমাত্র না তুই বললি এরপর আর কখনও এ খেলা খেলতে আসবি না? তাহলে আবার আগামী বছরের কথা বলছিস যে?

গণেশ কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

রাত ঘনিয়ে আসে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমী হবে। এক প্রহর রাতে চাঁদ উঠবে। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যাবার পর এতক্ষণে শান্ত হয়েছে পাখির কলরব। সারাঙের তেহাই বোল কিন্তু একটানা বেজে চলেছে।

মুঠো মুঠো জোনাকি জ্বলছে বেতের ঝোপে। সূর্যকান্ত ইতিপূর্বেই বলেছেন বন্য হস্তীর সন্ধান পাওয়া গেছে। নদী পার হয়ে মাইল দুয়েক দূরে দল-ছুট একটা 'বাউরা' বিচরণ করছে। নদীর পারে তার পায়ের ছাপও পাওয়া গেছে। বেতের জঙ্গল ভেদ করে সে কোন্ পথে গেছে তা বোঝা গেছে। তার নাদিও পরীক্ষা করে দেখেছেন ইতিমধ্যে। স্থির হয়েছে রাত দ্বিতীয় প্রহর হলে তবে রওনা হবেন ওঁরা। হাত-ঘড়ি কারও নেই। না থাক, সূর্যকান্তের ঘড়ি টাঙানো আছে আকাশে। শীত শেষ হয়ে এসেছে। সূর্য এখন মকররাশিতে। সূর্যাস্তের কিছু পরেই সিংহরাশিকে দেখা গেছে গারো-পাহাড়ের মাথায় পুবের আকাশে উঁকি দিতে। ঐ সিংহরাশির মঘা নক্ষত্র যখন ঠিক মাথার উপরে উঠে আসবে তখনই যাত্রা করবেন ওঁরা। অর্থাৎ ঘণ্টা তিন-চার এখন ওঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। তারই আয়োজন করা হল। গণেশ একটা অর্জুন গাছের উপর উঠে ডালপালা ছড়ানো গাছের একটা খাঁজে শুয়ে পড়ে। নিজেকে বেঁধে দেয় গাছের ডালের সঙ্গে, ঘুমের মধ্যে না পড়ে যায়। বিমলা আর নাজনির বাঁধন খোলা থাকে। কোন বন্যজন্তু হঠাৎ আক্রমণ করলে তারা যাতে নিজে-রাই আত্মরক্ষা করতে পারে। এ অরণ্যে বাঘ বাইসন গণ্ডার সব রকম জীব আছে—কিন্তু একজোড়া হাতীর কাছে তারা ভিড়বে না সূর্যকান্ত কিন্তু কোনও গাছে উঠলেন না। অনায়াসে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে ঐ বিমলার পিঠে। তাঁর হাত আর পা দুটিকে ঝুলিয়ে দিলেন। ঐ ভঙ্গিতে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে নিদ্রায় অভ্যস্ত। গণেশ আজও ভেবে পায় না ওভাবে কেমন করে একটা মানুষ ঘুমাতে পারে!

মোট কথা, এইবারেই ঘটল দুর্ঘটনাটা। গণেশ মাত্র আঠারো বছর বয়স থেকে ওঁর সাকরেদী করছে—দীর্ঘ সাতাশ বছরে একবারও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। ক্বচিৎ কখনও বন্যহস্তী দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি। এবারও হত না—হল নিতান্ত দৈব-দুর্বিপাকে! দোষটা সূর্যকান্তের নয়, আজ চল্লিশ বছর পরেও সজল চক্ষে গণেশ স্বীকার করে ভুলটা তারই হয়েছিল!

শেষরাত্রে দাঁতাল হাতীটার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ওঁরা। মদ্দা হাতী; মস্ত, হয়েছে সে। দল-ছুট এ মদ্দা হাতীটা 'গুণ্ডা' কিনা বোঝা যায় নি—কিন্তু সে যে 'মদকল' তা গণেশও বুঝতে পেরেছিল, এমন কি হাতীটাকে অস্তমান কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদের আলোয় দেখবার আগেই। এ গন্ধ তার অতি-পরিচিত। ফলে বিমলা সহজেই তার সঙ্গে ভাব জমাতে পেরেছিল। আইন-মাফিক বিমলা আর

নাজনি ওর দু'পাশে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল ঠিকই। বড়কর্তার দোহার এবং ফাঁস ছোঁড়া হয়েছিল নির্ভুল। তারপর যথারীতি দৌড়ের প্রতিযোগিতা! তিনটি হাতী বনবাদাড় ভেঙে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা। দাঁতালটা যখন থামল তখন পুব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। জুঙ্কো তারা ডুব দিয়েছে আলোর বন্যায়। বিমলা যথারীতি একটা বিরাট গাম্‌হার গাছের চারিদিকে পাক দিয়ে আবদ্ধ করে বন্দীকে। গণেশও অত্যন্ত দ্রুতগতি নাজনিকে পাক দেওয়ায় আর একটা গাছের চারিদিকে। ঐখানেই ভুল হয়েছিল তার! আলো-আঁধারে গণেশ ঠাওর করে দেখে নি গাছটা পল্‌কা—ঘুণে খাওয়া! তার মোটা গুঁড়িটাই নজরে পড়েছিল তার—দেখতে পায় নি তার কাণ্ডটা উই পোকার আক্রমণে একেবারে ঝাঁজরা হয়ে আছে।

দাঁতালটাকে বন্দী করে দুজনেই ত্বরিৎগতি নেমে এসেছিল নিজ নিজ হাতীর পিঠ থেকে। আর তখনই দাঁতালটা দেখতে পেয়েছিল সূর্যকান্তকে। ভীমবেগে সে তেড়ে আসে ওঁকে থেঁতলে দিতে! সূর্যকান্ত পালাবার কোন চেষ্টা করেন নি—কারণ তিনি জানতেন দড়ির ও প্রান্ত বাঁধা আছে গাছের সঙ্গে; কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সে গাছটা উপড়ে পড়ল দাঁতালটার আকর্ষণে। নিমেষ মধ্যে ঘটল ঘটনাটা। হায়-হায় করে উঠল গণেশ—কিন্তু তার করবার কিছু ছিল না। কী করতে পারত সে? প্রাণ দিয়ে যদি প্রভুকে বাঁচানো যেত তবে অকাতরে তাই দিত গণেশ-সর্দার; কিন্তু কেমন করে সে রুখবে ঐ প্রভঞ্জনগতি দৈত্যটাকে?

গণেশ যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় নি, সেটাই পেয়েছিল বিমলা। মুহূর্তমধ্যে সে তার বিশাল দেহটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাতালটার গতিমুখের দিকে। সূর্যকান্ত নয়—দাঁতালটার জোড়া দাঁত দেড়-দু'হাত ঢুকে গেল বিমলার নরম তলপেটে!

তারপর মিনিটখানেক ধরে কী যে হল গণেশ তা জানে না। আন্দাজ করতে পারে মাত্র, পরবর্তী অবস্থাটা দেখে। সমস্ত বনভূমি তিনটে হাতীর তাণ্ডবে থর-থর করে কেঁপে উঠল। বড় বড় গাছ সশব্দে ভূতলশায়ী হল। সম্বিত্ত যখন ফিরে এল, তখন গণেশ দেখতে পেল—রক্তাক্ত দাঁতালটা চলে গেছে—তার গমনপথে রক্তের একটা ধারা। বিমলা মরণোন্মুখ, নাজনিও আহতা। আর ওর প্রভু সূর্যকান্ত প্রাণে বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু তার বাঁ পা-টা থেঁৎলে গেছে একেবারে।

সূর্যকান্ত প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ ঘা আর তাঁর সারে নি। বছরখানেক শয্যাশায়ী হয়ে থেকে তিনি চিরতরে চোখ বুজলেন। বিমলাকে

কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানেই। বনের মধ্যে সেখানেও আছে বাঁধানো বেদী। নাজনি অবশ্য সম্পূর্ণ সেরে উঠেছিল।

আঘাত গণেশও পেয়েছিল। প্রচণ্ড আঘাত! সেও অনাহত থাকে নি; —কিন্তু আঘাতটা সে পেল মোহনপুরে ফিরে আসার পর!

ওর বুড়ি মা ওকে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। পুণ্ড অবাক দুটি চোখ মেলে বসে ছিল দাওয়ায়। গণেশের স্ত্রী ময়না গৃহত্যাগ করেছে। মাহুত বস্তীর দিলদারও নিরুদ্দেশ!

সূর্যকান্ত খোয়ালেন বাঁ পা-টা আর গণেশ তার বুকের একটা পাঁজরা!

সে আজ সাঁইত্রিশ বছর আগেকার কথা। সেবার দ্বৈরথ-সমরে যডদন্ত-গজরাজেরই জয় হয়েছিল।

ক্যাভিয়েকে যে ঘরখানাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেটা বাড়ির এক প্রান্তে। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য চিহ্নিত কামরা। ঘরের লাগাও স্নানাগার। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে সময় যেন আটকে পড়ে আছে পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে। আধুনিকতার ছাপ নেই তার কোন অঙ্গে। ক্যাভিয়ে যেন অর্ধশতাব্দী আগেকার সামন্ততন্ত্রের ভারতবর্ষে এসে একটি রাজ-পরিবারে অতিথি হয়েছে। একখানি মেহগনি কাঠের কারুকার্যখচিত পালঙ্ক, একটি চিপেণ্ডেল টেবিল, খাড়া-পিঠ চেয়ারের উপর হরিণের চামড়ার আসন, দেয়ালে সৌখিন জাপানী ঘড়ি—যদিও সেটা অচল। আর কাচের আলমারিতে কিছু ইংরাজি ও বাংলা বই। আলমারিতে পা-তালা দেওয়া নেই। ইলেকট্রিক বাতি নেই, টেবিলের উপর ডোম-দেওয়া সেজ-বাতি। এ-ছাড়াও দরজার দু'পাশে দুটি মোমবাতির দেয়ালগিরি। খান-তিনেক বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে দেয়ালে। একটি শিকারের দৃশ্য, দ্বিতীয়টি সূর্যকান্ত বড়গোঁহাইয়ের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। তৃতীয়টি একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতীর। ক্যাভিয়ে ঘুরে-ফিরে ছবিগুলি দেখে, আলমারির বইগুলি নাড়াচাড়া করে। গ্রন্থ-সঞ্চয়নের বৈচিত্র্য নিয়ে একটু গবেষণাও করে। ইংরাজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে—মানুষকে চেনা যায় তার সঙ্গীদের পরিচয়ে। ক্যাভিয়ের ধারণা কোন ফরাসী প্রবচনটা তৈরি করলে সেটা দাঁড়াত—মানুষকে চেনা যায় তার বান্ধবীর পরিচয়ে! ওর এক জার্মান-বন্ধুর মতে—দুটোর কোনটাই ঠিক নয়, কোন একটা অচেনা মানুষকে যাচাই করতে হলে তার বইয়ের আলমারিটা ঘেঁটে দেখ! ওর জার্মান-বন্ধুর কথা ঠিক হলে বলতে হবে এই গ্রন্থগুলি যিনি সঞ্চয়ন করেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণাই

করা যায় না। খানকতক সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী, কণ্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলার নিয়ম, নটিক্যাল এ্যালম্যানাক, একখণ্ড ডনকুইক্সোট, ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশান আর অবনদার 'ক্ষীরের পুতুল' পাশাপাশি সাজানো। ঘরের পুবের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা কাচের জানালা। সেখান দিয়ে তাকালে শ্যামল বনভূমির অনেকটা নজরে পড়ে। সানুদেশের অনেকটা বনভূমি পাড়ি দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় কী একটা নদীর নুড়িবিছানো জল-চিক-চিক আভাসে—তারপরে গাঢ় সবুজ বনভূমি গিয়ে মিশেছে গারো-পাহাড়ের নীলিমায়। যেন পুবের দেয়ালে ওটা জানালা নয়—তেলরঙে-আঁকা একটা নিসর্গ-চিত্র। ঘরের ছাদটা টিনের—এ অঞ্চলে সব বাড়িই করোগেট টিনের। ভূমিকম্পের এলাকা। তবে ঘরের ভিতর থেকে টিনের চালাটা টের পাওয়া যায় না—কাঠের চৌখুপি-কাটা একটা সিলিঙে ঢালু ছাদটা আড়াল করা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আরাম-কেদারায় বসে ছিল ক্যাভিয়ে। দিন-তিনেক আছে সে এখানে। কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করে। লালচাঁদের কোন খবর নেই। তবে যে-কোন দিন তিনি বাগান থেকে নাকি ফিরে আসতে পারেন। ক্যাভিয়ের হাতে একখানা বইও ছিল, যদিও সে বইয়ে মন বসেনি তার। খোলা জানালা দিয়ে দিগন্ত-অনুসারী বনভূমির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল সে। তিল তিল করে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে নিচের অরণ্যভূমে। গৃহ-প্রত্যাগত পাখির কাকলীতে সেখানে সান্ধ্যবন্দনার মুখর আয়োজন। অদ্ভুত এই দেশটা—ভাবছিল ক্যাভিয়ে। চেনা-জানা দুনিয়া ছেড়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে একদিন ভারতবর্ষে এসেছিল, কিন্তু প্রবাস-জীবনের অধিকাংশই তার কেটেছে শহরাঞ্চলে। শিকারের বাতিক ছিল এককালে। অরণ্যভূমি তার কাছে অজ্ঞাতরাজ্য নয়—আফ্রিকার বিভিন্ন অরণ্য-অঞ্চলে এক সময়ে দিনের পর দিন ঘুরে মরেছে। কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে মাচার উপর, তাঁবুতে অথবা কাঠের-তৈরী অরণ্য-আবাসে। তারপর শিকারের নেশা ছুটে গেছে একদিন। নূতন নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে: আরণ্যক জীবনের রহস্যকে আলোকচিত্রে ধরে রাখার খেয়াল হয়েছিল। আরণ্যক শব্দকে সে বন্দী করতে চেয়েছিল তার টেপ-রেকর্ডারে। সেও আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বড়লোকের ছেলে—আর্থিক সঙ্গতি তার ভালই। উপার্জনের প্রয়োজনে সে চাকরি করতে আসে নি। এসেছিল দুনিয়াটাকে দেখতে। অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ক্যাভিয়ে বসে বসে ভাবছিল তার কথা। এ কী দুরন্ত কৌতুহল তার? এভাবে অনিমন্ত্রিত আসাটা কি তার তরফে অসৌজন্যমূলক

হয়েছে? একেবারে বিনা পরিচয়ে এ রকম উপযাচক হয়ে কেন সে এল এখানে? কেন? 'ল্যাসোইং'-করে হাতী ধরার কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল বলে? না কি গজমুক্তার হাস্যকর গালগল্পটায় তার হিমালয়ান্তিক কৌতূহল সৌজন্যের বাঁধ ভেঙে ফেলেছিল? এখানে এসে কিন্তু আজ আবার তার নূতন নূতন কৌতূহল জাগছে। ঐ পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে কৌতূহল, ঐ বৃদ্ধ গণেশ-সর্দার সম্বন্ধে কৌতূহল। আর হ্যাঁ—ঐ মেয়েটির সম্বন্ধেও—

গৃহস্বামীর সঙ্গে আজও তার দেখা হয়নি বটে, তবে পণ্ডিতজী এবং লালচাঁদের কন্যা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মেয়েটি কি সত্যই লালচাঁদের কন্যা? সে তো নিজেই বলেছে লালচাঁদ বড়গোঁহাই অকৃতদার। অবিবাহিত। তাহলে? মেয়েটি কি তাঁর—? কিন্তু তাহলে সে কি অমন অবলীলাক্রমে ও-কথা অমনভাবে বলত? ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কোন গূঢ়তত্ত্ব কি তার অজানা রয়ে গেছে আজও?

—এখনও বসে বসে বই পড়ছেন?

চম্‌কে ওঠে ক্যুভিয়ে। বলে, আসুন আসুন!

দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি—কুহু। বৈকালী প্রসাধন সেরে এসেছে সদ্য, বেশ বোঝা যায়। চুলটা বেঁধেছে অদ্ভুত ঢঙে, আর খোঁপায় দিয়েছে অচেনা একটা সাদা ঝুমকোফুলের গুচ্ছ। কমলা-রঙের একটা শাড়ি পরেছে, ঐ রঙেরই জ্যাকেট। দ্বারের বাইরে থেকেই বলে, আমি ঘরে এসে কী করব? এখন কি ঘরে বসে থাকার সময়? চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক।

—চলুন, চাঁদনি রাতও আছে।

—আসুন তাহলে। না, বন্দুক নেবার দরকার নেই, আমরা বেশি দূর যাব না।

ক্যুভিয়ে বেরিয়ে আসে আহ্বান মত। পায়ে পায়ে ওরা নেমে আসে প্রাঙ্গণে। সিংদরজাটা পার হবার আগেই ঝাঁকড়া-চুলো ছোট্ট একটা মেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কুহুর হাঁটু দুটো। দুর্বোধ্য অসমীয়া ভাষায় যা বলল তাতে মনে হল তার বক্তব্য: দিদি, আম্মো বেই-বেই যাব।

বছর-চারেকের ফুটফুটে মেয়েটি। গায়ের রঙ মিশ কালো, কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল। চোখে-মুখে কথা। মাথায় লাল ফিতে বাঁধা, লাল রঙেরই একটা ছোট্ট শাড়ি পরেছে—ফ্রক নয়, শাড়ি। আবার লালরঙেরই কোন তরল পদার্থ দিয়ে ওর ঐ ছোট্ট পায়ের পাতায় বর্ডার দেওয়া। রঙটা শুকিয়ে গেছে। দু' কানে মাকড়ি, কপালে টিপ।

কুহু তার বোধগম্য ভাষায় বললে, তুমি যে জুতু পর নি বুবু। তুমি হাঁটতে পারবে কেমন করে ?

—তবে কোলে নাও !

ক্যাভিয়ে কৌতুহলী হয়ে বলে, মেয়েটি কে ?

—আমার ছোট বোন, বুবু। ভারি দুষ্টু।

বুবু ঠোঁট উল্‌টিয়ে বলে, দিদি দুষ্টু।

ক্যাভিয়ে কোলে তুলে নেয় বাচ্চাটাকে। বলে, ঠিক বলেছ, দিদি দুষ্টু।

অচেনা মানুষটার কোলে উঠতে বুবু কোন আপত্তি করে না। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় সে পরমুহূর্তেই। বলে, তম্‌হে বাঘ মারিবলৈ পার ?

ক্যাভিয়ে বুঝতে পারে প্রশ্নটা। বলে, পারি। যদি বাঘটা আমাকে কামড়াতে আসে।

—না-হিলে নেপার ?

—না বুবু! যে বাঘ কামড়াতে আসে না, তাকে আমি মারতে পারি না।

—বুড়াদাদা পারে।

ক্যাভিয়ে কুহুকে প্রশ্ন করে, বুড়োদাদাটা কে ?

—বাবার একজন মাহুত। বুবুর সঙ্গে তার খুব ভাব। দিন-রাত শিকারের আজগুবি গল্প শোনায়।

টিলার উপর বাড়িটা। পাকদণ্ডী পথটা আড়াই প্যাঁচে জড়িয়ে ধরেছে টিলাটাকে একটা বুনো লতার মত। পাকদণ্ডী পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওরা নেমে আসে সমতল ভূমিতে। টিলাটার ওপাশ দিয়ে প্রায় চক্রাকারে ঘুরে একটা নদী বয়ে গেছে অনেক নিচ দিয়ে। নদী নয়, নদ। গদাধর নদ। তিন দিকেই নদীর বেড়া—একমাত্র চতুর্থ দিকে সভ্যজগতের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে পড়ে আছে একটা পায়ে-চলা পথ। দু'পাশে পাতা-ঝরা গাছের সারি। শালই বেশি—কেঁদ, গাম্‌হার, মহুয়া, শিমুল, আমলকিও আছে। আর আছে অসংখ্য অর্কিড। লতায়-পাতায় জড়ানো নাম-না-জানা গুল্ম।

ক্যাভিয়ে চলতে চলতে বলে, সেদিন লক্ষ্য করলাম পণ্ডিতজী গণেশ-সর্দারকে উল্লেখ করতে বললেন 'গণেশদা'। আচ্ছা, এটা কেন ? গণেশ-সর্দার তো আপনাদের বেতনভুক শ্রেণীর। আমার ধারণা ছিল সম্মান জানাতেই বয়ঃ-জ্যেষ্ঠকে 'দা' যোগ করে উল্লেখ করা হয়।

কুহু জবাবে বলে, ওটা ভাষাতত্ত্ব থেকে ঠিকই শিখেছেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলে আরও নতুন নতুন তথ্য পাবেন। আমাদের

বাড়িতে যে বুড়ি ঝি আছে, তাকে আমি ডাকি 'সরি-দিদু' বলে, বাবা ডাকেন 'সরি-মাসি' বলে। 'সরি' তার নাম—কিন্তু 'মাসি' শব্দটা যোগ করে বাবা তাকে আপন করে নিয়েছেন। সেও আমার ঠাকুর্দার আমল থেকে মাইনে-করা মেড সার্ভেন্ট।

ক্যাভিয়ে বলে, বুঝলাম। আচ্ছা, এই বুবুর মা কোথায়?

কুহু ইংরাজিতে জবাব দেয়, বুবু পিতৃমাতৃহীন, অনাথ।

একটু অবাক হয়ে ক্যাভিয়ে বলে, কিন্তু এই যে তখন বললেন—বুবু আপনার বোন? বোন নয় তাহলে, কাজিন?

—না, আমার সঙ্গে ওর রক্তের কোন সম্পর্কই নেই। পাতানো সম্পর্ক। একটা গ্রাম থেকে বাপি ওকে নিয়ে এসেছিলেন। গুণ্ডা হাতীর আক্রমণে একই রাত্রে ওর বাবা-মা মারা যায়। হাতীটা মারতে গিয়েছিলেন বাপি। সে কাজ সেরে ফিরে এলেন বুবুকে সঙ্গে করে।

ক্যাভিয়ে এবার সাহস করে প্রশ্ন করে, আর আপনার মা?

কুহু ইংরাজিতেই জবাব দেয়, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। বছর পনের-কুড়ি আগে মায়ের মৃত্যুশয্যা থেকে আমাকেও একদিন কুড়িয়ে এনেছিলেন তিনি, কন্যার মত মানুষ করেছেন। সেই সম্পর্কেই আমি বুবুর দিদি।

এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলে, এখানে এমন একা একা থাকতে ভাল লাগে আপনার? সময় কাটে কেমন করে?

অবাক দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে কুহু বলে, ওমা, একলা থাকতে যাব কোন্ দুঃখে? বাবা আছেন, জেঠু আছেন—গণেশ-দাদু, বড়মা, ছোটমাঈ আছে। ঝি, চাকর, মাহুত ইত্যাদিও বড় কম নয়। দু' বেলায় অন্তত পঁচিশটা পাতা পড়ে এখনও। এতগুলো লোকের দেখ্ ভাল করাটা কি সহজ কাজ? সারাদিনে একটু সময় পাই না, আর আপনি বলছেন: সময় কাটে কেমন করে!

ক্যাভিয়ে তার প্রশ্নটাকে কী ভাষায় পেশ করবে বুঝে উঠতে পারে না। স্বদেশে ঐ বয়সী ফরাসী মেয়েদের সে দেখেছে—তাদের জীবনযাত্রা অন্যরকম। দেখেছে দূর প্রাচ্যে, কলকাতা শহরে, এমন কি আফ্রিকাতেও। বাবা, জেঠু, গণেশ-দাদু আর একজোড়া হাতী দিয়ে একটা বিশ বছরের মেয়ের জীবন যে ভরিয়ে তোলা যায় না, এ সত্য কি বোঝো না ও? বোধ দিয়ে না হলেও বুদ্ধি দিয়ে? পরিচয় আর একটু গাঢ়তর হলে, অথবা মেয়েটি ভারতীয় না হলে এ প্রশ্ন সরাসরিই করত ক্যাভিয়ে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে বললে, আপনার সমবয়সী ছেলেমেয়ে তো একটিও দেখছি না?

—না, তা নেই। তা না-ই বা থাকল?

কী করে ওকে বোঝানো যায়? বিংশ শতাব্দীতে তো 'মিরাণ্ডা' আর সম্ভব নয়। ঘুরিয়ে আবার বলে, শহরাঞ্চলে যান না? কলকাতায়, তেজপুরে কিম্বা শিলঙে।

—খুব কম গেছি। একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। একটুও ভাল লাগে নি। দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। সবচেয়ে কষ্ট হত যান্ত্রিক শব্দে। সমস্ত দিন এত শব্দ যে কানে তালা লেগে যায়। আর ভীড়! চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ! উঃ! ফিরে এসে বেঁচেছি! প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনদিন শহরে যাব না।

ক্যাভিয়ের দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল জানতে ঐ বিশ বছরের মেয়েটির মনের আয়নায় কখনও কি কোন ছায়াপাত ঘটেনি? বাবা, জেঠু, গণেশ-দাদু আর হাতী ছাড়া আর কাউকে কি সে কখনও ভাল বাসেনি? কেউ কি কখনও তার রক্তরাঙা কর্ণমূলে প্রথম প্রেমের কথা কেঁপে-ওঠা-গলায় বলেনি? কিন্তু সে কৌতূহল চরিতার্থ করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রশ্ন করে, পড়াশুনা করেছিলেন কোন্ স্কুলে?

—না, স্কুলে কোনদিন পড়িনি আমি। এখানে স্কুল কোথায়? যেটুকু লেখাপড়া হয়েছে তা জেঠুর কল্যাণে। উনিই একাধারে আমার অঙ্ক-ইংরাজি-বাঙলা-ভূগোল-ইতিহাসের মাস্টার।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পাকদণ্ডী পথে নেমে এসেছে পাহাড়ের নিচে। বড় বড় পাথর এড়িয়ে, ছোট ছোট পাথর ডিঙিয়ে ওরা এগিয়ে আসে গদাধরের জলধারার কাছাকাছি। খুব চওড়া নয় নদটা। চেঁচিয়ে কথা বললে এপার-ওপার কথা বলা চলে। কালচে নীল জলধারা—স্রোত বেশ প্রবল। গভীরতা কত তা বোঝা যায় না। বেশ ঘূর্ণিপাক আছে জলে। জলের মাঝে মাঝে জেগে আছে পাথর, দু'পাশ দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল। নিরবচ্ছিন্ন কলতান উঠছে একটা। ক্যাভিয়ের মনে হল নদীটা যেন এই মেয়েটিরই উপমান—উচ্ছল, প্রাণবন্ত, খেয়ালী,—অথচ ওর গভীরে কোথায় যে কোন অদৃশ্য পাথরের বাধা আছে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বোধকরি তাই ও অত উদাসীন, আন্‌মনা। বলেও অনেকটা সে-কথা, নদীটা অনেকটা আপনার মত, নয়?

কুহু প্রশ্নটাকে অন্যভাবে নিল। বললে, এটা নদী নয়, নদ। গদাধর।

কোল থেকে নেমে বুবু নুড়ি কুড়াতে থাকে। ক্যাভিয়ে একটা সমতল

পাথর দেখে বসে। পকেট থেকে ধূমপানের সরঞ্জাম বার করে। কুহু বসে না। একটু দূরে একটা পাথরে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে বলে, আপনার বুঝি খুব শিকারের নেশা ?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্যুভিয়ে বলে, হাঁা, আপনার বাবার মত।

কুহু প্রতিবাদ করে। বলে, ভুল হল আপনার। আমার বাবার একেবারেই শিকারের নেশা নেই। শিকার মানে তো বন্যজন্তু হত্যা করা ? বাবা তা একেবারেই করেন না। জঙ্গলে সম্বর, হরিণ, খরগোশ—এমন কি বাঘের দেখা পেলেও গুলি ছোঁড়েন না। তাঁর নজর শুধু হাতীর উপর। তাও গুলি করে মারতে নয়, তাকে জীবিত ধরে আনতে। আপনার মত শিকার তাঁর পেশা নয়, হাতী ধরা তাঁর নেশা।

ক্যুভিয়ে বলে, আপনারও ভুল হল কুহু দেবী। শিকার আমার পেশা নয়। আমি চিকিৎসক। শিকার মানে যদি বন্যজন্তু হত্যা করা হয়, তবে সেটা আমার নেশাও নয়।

—কিন্তু মনিকাকা তো লিখেছিলেন—আপনি শিকারী।

—উনি ঠিকমত জানতেন না। তবে জঙ্গলে যাবার নেশা আমার আছে। অরণ্যকে আমি ভালবাসি। সেদিক থেকে আপনার বাপির সঙ্গে আমার চরিত্রের খানিকটা মিল আছে। আমিও যখন জঙ্গলে বন্যজন্তুর সম্মুখীন হই তখন গুলি ছুঁড়ি না। আমি চাই তাদের জীবিত ধরে রাখতে—তবে সশরীরে নয়। আমার ফটো এ্যালবামে, আমার মুভি ক্যামেরায় আর টেপ-রেকর্ডারে !

—ভারি অদ্ভুত তো !

এ-কথায় মেয়েটি আগন্তুকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শিকারীদের সে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। নানান দেশের নানান জাতের শিকারী। শিকারীর বীরত্ব আর পৌরুষকে সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এমন আজব-শিকারীর কথা সে কখনও শোনেনি, যে জঙ্গলে যায় বন্দুক হাতে, অথচ ফিরে আসে ফটো নিয়ে। অরণ্যকে সেও ভালবাসে। অরণ্যের বুকেই সে মানুষ। কিন্তু সে ভালবাসে অরণ্যের আদিমতাকে, অরণ্যের ভয়াল ভ্রূকুটিকে সে ভয় করে—ভালও বাসে। মাঝে মাঝে লালচাঁদের সঙ্গে গভীর অরণ্যরাজ্যে সে প্রবেশ করেছে। মনে হয়েছে কী এক অজ্ঞাত রহস্যঘন রাজত্ব লুকিয়ে আছে ঐ সামনের গাছ-গুলোর পেছনেই। ছুটে দেখতে গেছে সাহসে বুক বেঁধে—মনে হয়েছে রহস্যটাও পিছিয়ে গেল পরের সারির গাছের পিছনে। তাকে ধরা যায় না। নিঃসন্দেহে সে রহস্যটা ভয়াল—তাকে ভয় করে কুহু। তবু ভালও বাসে। অনেকটা যেন

ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগার মত। কিন্তু সে তো কুন্থুর নিজস্ব ধ্যান ধারণা। ছেলেবেলা থেকে সে যে-সব শিকারীদের দেখেছে তারা ওসব অরণ্যের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা আসে, শিকার করে, মাংস রেঁধে খায়। আবার চলেও যায়। হয়তো যাবার সময় নিয়ে যায় কিছু হরিণের চামড়া, বাঘের নখ, কচিৎ কখনও হাতীর দাঁত। এ লোকটা নাকি তা করে না। স্রেফ্ ছবি তুলে আনে জঙ্গলে গিয়ে, জীবজন্তুর কণ্ঠস্বরকে বন্দী করে আনে তার টেপ-রেকর্ডার যন্ত্রে। আজব লোক তো!

কুন্থু প্রশ্ন করে, এতে কী লাভ!

—লাভ-লোকসানের কথা নয়। এই আমার খেয়াল। শিকারীর চেয়ে আমাকে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হয়। আমাব হাতে থাকে ক্যামেরা, কাঁধে বন্দুক। হঠাৎ আক্রান্ত হলে হাত বদল করতে করতেই শেষ হয়ে যেতে পারি! একবার আফ্রিকার উগাণ্ডা অঞ্চলে প্রায় সে-অবস্থাই হয়েছিল। ব্যাঘ্রজননী বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, আমি তাঁর ফটো নিচ্ছি। হঠাৎ বাঘিনীটা আমাকে দেখতে পায়। সেবার প্রাণ নিয়ে ফিরেছিলাম অনেক কষ্টে।

—কিন্তু শিকার করাতেই বা আপনার আপত্তি কিসের?

—তাহলে অনেক কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হয়। এককালে আমিও শিকারী ছিলাম। এখন সে সখ মিটে গেছে। এখন বরং বেদনা পাই, লজ্জা পাই, যখন দেখি সভ্যজগতের মানুষ বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গলে চলেছে বীরত্ব দেখাতে!

—বুঝিয়েই বলুন না সব কথা! সময়ের তো অভাব নেই।

—তা নেই। কিন্তু তাহলে আপনাকেও বসতে হয়। বসুন না ঐ পাথরটার উপর। একটু অপেক্ষা করুন, আমার রুমালটা পেতে দিই। না হলে আপনার শাড়িটা নোংরা হয়ে যাবে।

—থাক, থাক, তার দরকার নেই—আপনার রুমালটাও তো নোংরা হয়ে যাবে!

ক্যুভিয়ে কী-একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সামলে নিল। কোন য়ুরোপীয় মহিলাকে অনায়াসেই ও-কথা বলা যায়। এ ধরনের 'কম্প্লিমেণ্টস্' কোন ফরাসী, ইংরাজ অথবা জার্মান কুমারী-মেয়ে খুশিমনেই গ্রহণ করবে; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেচারির যেটুকু জ্ঞান হয়েছে তাতে সে ভরসা পেল না ঐ কথা-ক'টা প্রকাশ করে বলতে। নীরবে সে রুমালটি পেতে দিল। কুন্থু বসে।

…মনে আছে, এইখানে জঁা ক্যুভিয়েকে থামিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু কথাটা কী? কী কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন আপনি?

ক্যুভিয়ে হেসে ফেলেছিলেন। যা বলেছিলেন তার ভাবার্থটা এই: মঁসিয়ে সান্যাল, আপনি এঞ্জিনিয়ার, আমি ডাক্তার। ও-সব রোম্যান্টিক কথাবার্তা আপনার আমার জন্য নয়। সেদিন সেই গদাধর নদের একটানা কুলুকুলু আবহ-সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে, সেই অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত কনে-দেখা-আলোর রঙে রঙ মিশিয়ে আমার কণ্ঠে যে-কথা স্বতঃউৎসারিত হতে হতে মাঝপথে থেমে গিয়েছিল তা নিঃশেষে হারিয়েই গেছে। ফুটলে বনেই সে ফুলটা ফুটত। তা ফোটেনি। এখানে ফোটাতে গেলে সেটাকে মনে হবে সাজানো কথার কাগজের ফুল। কথাটা বৃথাই লজ্জা পাবে এই এ্যাপার্টমেন্টের ড্রইংরুমে!

আমি বলি, তা ঠিক! থাক তবে সে-কথা।

—আপনিই বলুন না! অমন একটা পরিবেশে কী কথা বলতে পারতেন আপনি?

হেসে বলি, আমার মুখে যে সেটা আরও মেকি মনে হবে। আপনার তবু সেই অরণ্যচারিণীর একটা স্মৃতির সম্বল আছে, আমার তাও নেই। আমি নেহাৎ কথা-সাহিত্যের সুরে সুর মিলিয়ে কিছু সাজানো কথা বসিয়ে দেব হয়তো!

—সুতরাং এ প্রসঙ্গ থাক।

—কিন্তু একটা প্রশ্ন! আপনি কি সেই ধূলোমাখা 'রুমালটি সাফা করিয়েছিলেন? না কি—সেই সন্ধ্যার না-বলা কথার ম্লানিমাচিহ্ন সমেত রুমালটা তুলে রেখেছেন বাক্সে।

কুভিয়ে আমাকে ছদ্মতাড়না করে বলেছিলেন, মঁসিয়ে, আপনি এসেছেন ল্প শুনতে! আমিও কিছু কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াই নি! এভাবে বারে বারে ধা দিলে আমি আমার জবানবন্দী এখানেই শেষ করব কিন্তু!

আমি হাত দুটি জোড় করে বলি, আই বেগ য়োর পার্ডন, স্যার।

গদাধরের ধারে, সেই নির্জন সন্ধ্যায় ক্যুভিয়ে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা একে একে বলে গিয়েছিল মেয়েটিকে, দীর্ঘ সময় ধরে। আত্মমগ্ন ভাবে।

ডক্টর জঁা ক্যুভিয়ের পিতামহ ব্যারন জুলিয়ান ক্যুভিয়ে ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের একজন বিখ্যাত শিকারী। সারাজীবনই তাঁর কেটেছে

আফ্রিকার অরণ্য-অঞ্চলে—উগাণ্ডা আর টাঙ্গানাইকায়। সেখানে ছিল তাঁর জমিদারী—প্ল্যানটেশান। এ ছাড়া হাতীর দাঁত চালান দিতেন, য়ুরোপের বাজারে। সারাজীবনে সহস্রাধিক হাতী মেরেছিলেন ভদ্রলোক! সিংহও প্রায় হাজারের কাছাকাছি! মিলানে ছিল ওঁদের 'শাটু' বা দুর্গ-প্রাসাদ। ওঁর পূর্বপুরুষ নেপোলিয়ানের সৈন্যদলের সঙ্গে নাকি ইটালীতে এসেছিলেন—আর ফিরে যাননি। তখন থেকেই ঐ ব্যারন খেতাব। বছরে একবার ক্যাভিয়ে-পরিবারের সকলে দলবেঁধে তাঁদের আফ্রিকার প্ল্যানটেশানে যেতেন। শিকারের উদ্দেশে। হত্যা-উৎসবে মেতে উঠত পরিবারের সবাই—মায় আত্মীয়-বন্ধুরাও। ঠাকুর্দা মারা যাবার পরে বাবাও ঐ ব্যবস্থাটা রেখেছিলেন। বালক বয়সে জঁ। ক্যাভিয়েও গিয়েছে বাবার সঙ্গে। দেখেছে অরণ্যকে, অংশ নিয়েছে বন্যজন্তু শিকারে। তারপর দেহেমনে সে বড হল। পডতে গেল ডাক্তারী—বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। এরপর একদিন ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়ে এল—তখনও একবার আফ্রিকায় গিয়েছিল সে বন্ধুদের সঙ্গে শিকার করতে। ফিরে এসে যোগদান করল আন্তর্জাতিক রেডক্রশে—ডাক্তার হিসাবে। ফরাসী উপনিবেশে দূরপ্রাচ্যে বিদ্রোহ দমনের জন্য যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল সেখানে পাঠানো হল তাকে। সৈনিক হিসাবে নয়, ফরাসী সরকারের তরফেও নয়—রেডক্রশের ডাক্তার হিসাবে। এল চীন সমুদ্রের ধারে পূর্ব-এশিয়ায় ফরাসী উপনিবেশে। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই ওর জীবনদর্শনে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। দেশে থাকতে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশানের মাধ্যমে যেটাকে এশিয়াবাসী অশিক্ষিত বর্বরদের অমানুষিক অত্যাচার বলে বুঝেছিল, অকুস্থলে এসে দেখল সেটা কালা-মানুষদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম! আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত ফরাসী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঐ রোদে-পোড়া কালো কালো মানুষগুলোর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। ওদের না আছে সমরাস্ত্র, না-কোন সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা! থাকার মধ্যে আছে শুধু অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা! ওরা মরবে তবু হার মানবে না। ক্যাভিয়ে এসেছিল সমরাঙ্গণে আর্তদের সেবা করতে—অথচ এসে দেখল সেটা মোটেই যুদ্ধক্ষেত্র নয়, একটা ব্যাপক নরমেধ যজ্ঞ! গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে গেরিলা-বাহিনীর সৈন্যদের ধরে আনা হত, হত্যা করা হত। কিন্তু সৈন্য কোথায়? শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদল বেয়নেট উঁচিয়ে যাদের ধরে আনত তারা নিতান্ত গাঁয়ের মানুষ—টোকা-মাথায় চাষী আর মৎস্যজীবী! প্রচার-পুস্তিকার মাধ্যমে জেনেছিল, এইসব নিরক্ষর মেহনতী মানুষই রাত্রের অন্ধকারে গেরিলা-বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হয়তো তাই—কিন্তু

প্রবলের বিরুদ্ধে এ-ছাড়া তারা লড়বেই বা কেমন করে? ক্যাভিয়ে সেজন্য ওদের দোষ দিতে পারেনি। ওদের ভাষা সে বুঝত না. কিন্তু ওদের বক্তব্য সে বুঝে নিয়েছিল ঠিকই।

টাঙ্গানাইকা-উগাণ্ডা অঞ্চলে জঙ্গল ঘেরাও করে যেভাবে ওর বাবা অথবা ঠাকুর্দা বন্যজন্তু শিকার করতেন তার সঙ্গে এই যুদ্ধের কোনও পার্থক্য নেই। সেই একইভাবে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দল গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে এগিয়ে যেত, একই ভাবে বন্যজন্তুর মত দলবেঁধে পালাবার চেষ্টা করত অর্ধউলঙ্গ কালো-মানুষের দল। একই মৃত্যুর বিভীষিকা ওদের চোখে, একই মৃত্যু-যন্ত্রণার আকৃতি। কেমন যেন প্রচণ্ড একটা দুঃখবাদ গ্রাস করল তাকে। কিছুই তার ভাল লাগত না। ফরাসী সেনাবাহিনীর জন্য নানারকম আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল—ফরাসী ডাক্তার হিসাবে সে আনন্দের ভোজে থাকত তার আমন্ত্রণ। কিন্তু নাচ-গান-ডিনার-পার্টি. নারীসঙ্গ কোন কিছুই তার ভাল লাগত না। নগরকেন্দ্রিক জীবনের হৈ-হুল্লোড়ের প্রতি তার তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মাল। অরণ্য-অঞ্চলের একান্তে নিরিবিলিতে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে বলে লম্বা ছুটি নিয়ে সে চলে এসেছিল ভারত-ভূখণ্ডে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে ঘুরল কয়েক মাস। তারপর কি জানি কেন ভাল লেগে গেল এ দেশটাকে। ভারতবর্ষেই আছে আজ পাঁচ বছর। রেডক্রশের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল ফরাসী কনস্যুলেটে, কলকাতায়।

ইতিমধ্যে ছুটিছাটায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অরণ্য-অঞ্চলে গিয়েছে সে। অরণ্যই ওর একমাত্র আকর্ষণ। শিকারীদলের সঙ্গেই যেতে হয়েছে. যদিও শিকার করতে নয়। গিয়েছে বন্যজন্তুর জীবনযাত্রাকে তার ফটো-এ্যালবামে ধরে রাখতে, অরণ্যের কল-কোলাহল টেপ-রেকর্ডারে বন্দী করে আনতে। অদ্ভুত পাগল মানুষ সে।

যৌবনের সায়াহ্নে এসে, এই চল্লিশ বছর বয়সে সে জীবনের নিঃসঙ্গতাকে প্রথম অনুভব করতে শুরু করেছে। এতদিনে তার মনে হয়েছে নোঙর ফেলার সময় হয়েছে বুঝি বা। জীবনে বহুবার বহুজাতের নারীর সান্নিধ্যে এসেছে ক্যাভিয়ে—বিভিন্ন দেশের. বিভিন্ন ধরনের মেয়ে। অতীত জীবন হাতড়ে মাঝে মাঝে মনে হয়—তাদের কেউই ওর এই নিঃসঙ্গতাকে, এই নৈরাজ্যকে ভরিয়ে তুলতে পারত না। তারা সব একই ছাঁচে ঢালা। অর্থ-বৈভব-বিলাসের ভিতর দিয়ে তারা জীবনকে ভোগ করতে চায়। ভালই হয়েছে—ক্যাভিয়ে তাদের কারও সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেনি। তাদের 'জ্যাজ' ওর বরদাস্ত

হত না,—ওর বাঁশী বেসুরো ঠেকত তাদের কানে। অরণ্যপ্রান্তে নির্জন-কুটিরে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে—কিছু হাঁস-মুরগী-গরু-ঘোড়া আর এ্যালসেশিয়ান নিয়ে, শহর থেকে দূরে একান্তবাসীর মত থাকতে তারা রাজী হত না, রাজী হলেও সুখী হত না। এ ভালই হয়েছে!

অবশ্য এই শেষ অনুভূতির কথাগুলো ক্যাভিয়ে ওভাবে বলেনি সেই একান্ত-সন্ধ্যায় স্বল্প পরিচিতা ঐ ভারতীয়-মিরাণ্ডাকে। তবু যেটুকু বলেছিল তাতেই হঠাৎ কুহু বলে বসে, এদিক থেকে, জানলেন, আপনার সঙ্গে আমার চরিত্রের খুব একটা মিল আছে! আমারও ঐ কৃত্রিম শহুরে জীবন একদম বরদাস্ত হয় না!

জঁা ক্যাভিয়ে আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, এ-কথায় তাঁর রোমাঞ্চ হয়েছিল। কী একটা কথা তৎক্ষণাৎ বলতেও চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই কুহু বলে ওঠে, বুবু, জলের অত কাছে যেও না, এদিকে সরে এস।

নিজেই উঠে গিয়ে বুবুকে জলের কিনারা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে।

ক্যাভিয়ের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কথার পিঠে কথা বলা এক, আর পরে সেটা সাজিয়ে বলা আর এক জিনিস। তাছাড়া এতশীঘ্র ও-জাতীয় কোন কথা তার পক্ষে বলাটা বোধহয় শোভনও হত না। মেয়েটিকে আরও গভীরভাবে, আরও নিবিড় করে বুঝে নিতে হবে। হাজার হ'ক কুহু ওর চেয়ে বিশ বছরের ছোট! বিশ বছর! গণেশ-দাদুর চেয়ে ময়না কত ছোট ছিল যেন?

প্রসঙ্গটা বদলে বলে ওঠে, আপনাদের এখন তো একটিমাত্র হাতী আছে, তাই না? শুনেছি, আগে অনেক ছিল?

কুহু পাথরের আসনে ফিরে এসেছিল। হাওয়ায় রুমালটা উড়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। ঝেড়ে-ঝুড়ে সেটাকে পেতে আবার বসে বলে, এখনও আমাদের বারোটা হাতী আছে।

—বারোটা! বলেন কি! কোথায় তারা?

—বড়মাঙ্গীকে তো আপনি দেখেছেন। ছোটমাঙ্গীকে নিয়ে বাবা জঙ্গলে গেছেন। এছাড়া আরও দশটি হাতী দেওয়া আছে বিভিন্ন গ্রামের সর্দারদের। অতগুলো প্রাণীকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা তো বড় সহজ নয়। ব্যয়সাধ্য তো বটেই। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো আছে—জঙ্গলের ভিতর গ্রামে। এক-এক গ্রামপ্রধানের কাছে এক-একটি। ওরা তাদের খাওয়ায়, সেবা-যত্ন করে, কাজও করায়। জঙ্গলে খাওয়ানোব খরচটা কম—তারা লতাপাতাই খায়। কোন ভাড়া এজন্য তারা দেয় না—সর্ত শুধু এই যে, বৎসরান্তে বাবা যখন খবর পাঠান, তখন তারা হাতী আর গ্রামের লোক নিয়ে হাজির হয় খেদা-শিকারের জন্য।

খেদা-শিকারের শেষাশেষি বাবা যেতেন তাঁর সখের শিকারে। ঐ ফাঁস-শিকারে। সেখান থেকে তিনি ফিরে এলেই হত মরশুমের সমাপ্তি।

ক্যুভিয়ে বলে, ফাঁসি-শিকার শুনেছি আজকাল বন্ধ হয়ে গেছে। কতদিন বন্ধ হয়েছে?

—তা প্রায় বিশ বছর। যেবার ঐ শিকারে গিয়ে আমার বাবা মারা যান।

—আপনার বাবা? মানে?

—আমার জনক। লালচাঁদজীর পালিতা কন্যা তো আমি!

ক্যুভিয়ে ইতস্ততঃ করে বলে, আপনার বাবা, মানে, কে ছিলেন তিনি?

—ঐ গণেশ-দাদুর একমাত্র পুত্র। তাঁর নাম ছিল পুণ্ডরীক!

ক্যুভিয়ে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। এতদিন তার ধারণা ছিল গণেশ-দাদুকে কুহু 'দাদু' ডাকে সৌজন্যের খাতিরে। ঐ পুণ্ডরীক নামটাও তার অজানা নয়। গণেশ-সর্দার সেদিন বলছিল, মনে আছে, এই পুণ্ডরীককে সাত বছরের রেখে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। সেই পুণ্ডরীকেরই সন্তান তাহলে এই কুহু?

—আপনার বাবাও তাহলে ফাঁসিয়াড ছিলেন?

—না! তিনি জীবনে একবারই মাত্র ফাঁসিয়াড হতে চেয়েছিলেন! পারেননি! তাঁর সেই প্রথম শিকারই হচ্ছে শেষ শিকার। জীবিত ফিরে আসতে পারেননি জঙ্গল থেকে।

ক্যুভিয়ে মর্মাহত হয়। বলে, আমাকে সব কথা বলবেন?

—বলব, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় নয়। এমন সুন্দর একটি সন্ধ্যা সেই মর্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটকের জন্য আসেনি।

সুন্দর সন্ধ্যা! তাই তো! এতক্ষণে চারিদিকে নজর পড়ে ক্যুভিয়ের। পশ্চিমাকাশের লালিমা নিঃশেষে মুছে গেছে। পুব আকাশে শুক্লপক্ষের আধভাঙা চাঁদটা তার গায়ে-হলুদের আসর থেকে উঠে এসে যেন বাসরঘরের দ্বারের কাছে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়েছে। রূপালী সাজে ঝলমল করছে। আর সেই রূপালী চাঁদ শতখণ্ড হয়ে আছড়ে পড়েছে গদাধরের জলে। এক জোড়া ধূসর রঙের খরগোশ আকন্দ ঝোপের ওপাশ থেকে কান-খাড়া করে ওদের দেখছে। বিরলপত্র শিমুল গাছের নিচু ডালে বসে আছে একটা মাছরাঙা। মাঝে মাঝে ঝুপ-ঝাপ নেমে পড়ছে খরস্রোতা গদাধরের জলে! যে অর্জুন গাছটার তলায় ওরা বসেছিল তার মগডাল থেকে আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠল একটা ময়ূর—ক্যাঁও, ক্যাঁও, ক্যাঁও। ময়ূরটাকে দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু তার সান্ধ্যবন্দনার অনুরণন ছড়িয়ে

পড়ল আকাশে বাতাসে। কেমন যেন উদাস হয়ে যায় মনটা। বুবু তার দিদির কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কুহু তার আঁচলটা বিছিয়ে দিয়েছে ওর গায়ের উপর—হিম না লাগে। ক্যাভিয়ের মনে হল কমলারঙের শাড়ি পরা ঐ মেয়েটি আজ বনলক্ষ্মীর প্রতীক। সে যেন আঁচল বিছিয়ে আড়াল করতে চাইছে তার বন-সম্পদকে সভ্য মানুষের অত্যাচার থেকে।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই একটা আর্ত চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল বনভূমি—ক্যাঁ-ও, ক্যাঁ—ও!

সশব্দে এসে পড়ল ওদের সামনে বাণবিদ্ধ ময়ূরটা। একটু ঝটপটানি, দু'একবার আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ, তারপর নিথর হয়ে গেল পাখিটা।

বুবুকে কোলে নিয়ে কুহু উঠে দাঁড়ায়। ক্যাভিয়েও ছুটে আসে—কিন্তু তার আগেই জঙ্গল থেকে বার হয়ে আসে অর্ধনগ্ন একটা আরণ্যক প্রাণী। তুলে নেয় ময়ূরটাকে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসে। লোকটার বয়স বছর চব্বিশ-পঁচিশ। অত্যন্ত সুগঠিত শরীর, যেন বাটালি দিয়ে খুদে বার করা। ক্ষীণ কটিদেশ, চওড়া বুক আর পেশীবহুল সবাবয়ব।

কঠিন কণ্ঠে কুহু বলে ওঠে, আবার তুমি এখানে পাখি মারছ?

লোকটা ময়ূরটাকে হাতে নিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফিরে তাকায়। একগাল হাসে। ঝকমকে একসার দাঁত বার করে বলে, পাখি না মারলে খাব কি?

—চন্দন! বাজে কথা বল না! তোমাকে আমি এর আগে বহুবার সাবধান করে দিয়েছি! বলেছি—পাখি মারতে চাও জঙ্গলে যাও। মোহনপুরে পাখি মারা বারণ।

—কিন্তু আমি যে মোহনপুরেই থাকি! আমার পেটটাও যে মোহনপুরেই থাকে, মেমসাহেব!

—মেমসাহেব! তোমাকে কতবার বলেছি না—আমাকে দিদিমণি বলে ডাকবে?

—তাই কি পারি মেমসাহেব? আপনি সাহেবকুঠিতে থাকেন—'দিদিমণি' কেমন করে ডাকি! তা সে যাই হোক—আমার পাখি-শিকার যখন বন্ধ করে দিচ্ছেন তখন আমার জন্যেও হাঁড়িতে দু'মুঠো করে চাল নেবেন। দু'বেলা প্রসাদ পেয়ে আসব মেমসাহেবের হেঁসেলে!—সেলাম সাহেব। সেলাম মেমসাহেব!

নিথর হয়ে যাওয়া ময়ূরটাকে হাতে ঝুলিয়ে শিস্ দিতে দিতে জঙ্গলের মধ্যে

মিলিয়ে গেল মিশ্‌কালো মানুষটা! নিথর হয়ে যাওয়া আর একটা ময়ূরের দিকে দ্বিতীয়বার সে ফিরে তাকালো না!

সন্ধ্যার সুরটা নিঃশেষে কেটে গেছে। ক্যাভিয়ের মনে হল কুহু রাগে থরথর করে কাঁপছে তখনও। বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। বলে, চলুন, ফেরা যাক।

—এ লোকটা কে?

কুহু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে, একটা জানোয়ার।

—জানোয়ার তো বটেই। তবু লোকটার পরিচয় কি?

—ও আমাদের চেরাই-কলের মজুর। মাসকয়েক হল এসেছে লোকটা। এর আগেও ওকে বারণ করেছি এখানে পাখি মারতে। শোনে না—

—তাহলে আপনার বাবাকে বলে ওকে তাড়িয়ে দিলেই পারেন!

—তাই করব এবার। লোকটার স্পর্ধা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

পণ্ডিতজী ওকে হাতীর বিষয়ে অনেকগুলি বই পড়তে দিয়েছিলেন। যতই পড়ছে ততই এই বিশালায়তন জীবটির প্রতি শ্রদ্ধাটা বাড়ছে। হাতীর মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বড, কিন্তু কোন জীবের বুদ্ধিবৃত্তি নাকি তার মস্তিষ্ক বা ব্রেন-ম্যাটারের আয়তনের উপর নির্ভর করে না—দেহের অনুপাতে মস্তিষ্কটা কত বড তার উপরই সেটা নির্ভরশীল। সে হিসাবে হাতীর বুদ্ধি খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। অথচ মাঝে মাঝে তারা বিস্ময়কর বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে। ধরা যাক বিল রায়ান সাহেবের অভিজ্ঞতার কথাটা:

বিল রায়ান সাহেব ছিলেন কেনিয়ার নাইরোবি অরণ্যের একজন অভিজ্ঞ শিকারী। চল্লিশ বছর ধরে তিনি আফ্রিকান বুনো হাতীর সঙ্গে ঘর করেছেন। রায়ান-সাহেব বলেছেন—"ওরা বুদ্ধির দৌড়ে মাঝে মাঝে মানুষকে রীতিমত কাৎ করে দেয়। একবার বুনো হাতীর অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে আমরা আমাদের কলা বাগানের চারদিকে শক্ত খুঁটির বেড়া দিলাম। কোথায় কি? ওরা দলবদ্ধভাবে দেহের চাপে ভেঙে ফেলল বেড়াটা! দশে মিলি করি কাজ! একটা হাতী যে বেড়া ভাঙতে পারে না—পঞ্চাশটা হাতী একসঙ্গে হেঁইয়ো করলে তাকে কাৎ হতে হবে। বুদ্ধির দৌড়ে আমাদের একনম্বর হার হল। ঠিক আছে,— আমরা বেড়ার তারের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের যোগ করে দিলাম! তৃতীয় কি চতুর্থ রাত্রে এল দুঃসংবাদ! কলা-চোরের দল বেড়া ভেঙে ফেলেছে! কী ব্যাপার? শোনা গেল ওরা বুঝে ফেলেছে শেষরাত্রে আমরা যখন ক্যাম্পের

বাত্তি নিভিয়ে দিই, জেনারেটারের ঘটঘটানিটা বন্ধ হয়, তখনই বেড়া ভাঙার মওকা। বাধ্য হয়ে হুকুম দিলাম সারারাত জেনারেটার চালাতে। এবার ?

"সাতদিনের মাথায় খবর এল ওরা বেড়া উপড়ে ফেলেছে! বিশ্বাস হল না ভাবলাম—এর পিছনে মানুষের কারসাজি আছে। আবার বেড়া লাগিয়ে সেটাকে যুক্ত করে দিলাম ফোর-ফরটি এ. সি. লাইনের সঙ্গে। আর নিজে লুকিয়ে থাকলাম মাচাঙের উপর। হাতীর নাম করে যে মানুষ-চোর বেড়া ভাঙতে আসে তাকে হাতেনাতে ধরতে হবে।

"তাজ্জব ব্যাপার। শেষরাতে এল বুনো হাতীর দল। পাঁচ মিনিটের ভিতর বেড়া উপড়ে ঢুকে গেল কলা বাগানে।

"কী করে এটা সম্ভব হল ?

"অনুসন্ধান করে জানা গেল, বন্য হস্তীর দলে আছেন একজন ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার! তিনি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে, হাতীর দাঁত 'নন-কণ্ডাক্টার'। তিনি নির্দেশ দেন—আর দেহস্পর্শ বাঁচিয়ে অতঃপর শুধু গজদন্ত দিয়ে তাঁর বাহিনী কলাবাগানে ঢোকার পথ করে নিতে সক্ষম হচ্ছে!"

সার্কাসের হাতী তো কত রকম খেলা দেখায়—সরু পাটাতনের উপর হেঁটে যায়, সাইকেল চালায়, অথবা জোকারের সঙ্গে মদের টেবিলে মদ খেয়ে মাতালের অভিনয় করে—কিন্তু তারা তো সাধনা করে সেগুলি অভ্যাস করেছে। তাদের শেখানো হয়েছে। চার্লস হেওার সাহেব বলেছেন: একটি বুনো হাতী তাঁর ক্যাম্পে হঠাৎ এসে পড়েছিল—কারও কোন ক্ষতি করেনি। টেবিলে যা ফল-মূল ছিল প্রথমে সেটা খেয়ে ফেলে। শুঁড়ে জড়িয়ে গ্লাসের বিয়ারটুকু নিপুণ-শুঁড়ে গলাধঃকরণ করে। তারপর তার নজর পড়ে দুটি না-খোলা বিয়ারের বোতলের দিকে। একেব পব এক সেগুলি শুঁড়ে তুলে নেয়। আছড়ে ভাঙে না। নিপুণ-শুঁড়ে কর্ক খুলে ফেলে বোতল দুটি মুখ-বিবরে ঢেলে দেয়। তারপর খোশ-মেজাজে হেলতে-দুলতে আবার সে বনে ফিরে যায়।

নিপুণতার কথাই যখন উঠল তখন বলি—অতবড় জন্তুটার কাজকর্ম কিন্তু খুব সূক্ষ্ম। পায়ের চাপে ওরা এমনভাবে নারকেল ভাঙতে পারে যাতে সেটা থেঁৎলে যায় না। শাঁস আর খোলা আলাদা হয়ে যায় শুধু। 'গজভুক্ত কপিত্থ' জিনিসটা কবিকল্পনা—কিন্তু কপিত্থ ওরা পরিপাটিভাবে ফাটিয়ে খেতে পারে। শুঁড় দিয়ে পয়সা, এমন কি আলপিন পর্যন্ত তুলে নিতে পারে। মানুষের মধ্যে যেমন কারও কারও বাঁ-হাতটা আগে চলে—ওরাও তেমনি হয় দক্ষিণপন্থী,

নয় বামপন্থী। কেউ কেউ সব্যসাচীও থাকতে পারে, তবে দেখা গেছে কেউ বাঁ-দিকের দাঁতটা বারে বারে কাজে লাগায়, কেউ ডানদিকের দাঁতটা।

ওদের কৌতুকবোধ বা সেন্স-অফ-হিউমারটাও বেশ প্রবল। এই প্রসঙ্গে আম্বোসেলী-সম্রাটের কথা বলা যেতে পারে :

কেনিয়ার সংরক্ষিত অরণ্যে আম্বোসেলী জঙ্গলের কাছে বাস করতেন এক গজরাজ। প্রকাণ্ড তাঁর দেহ—জাতে 'দন্তাল'। গজরাজের ছিল একটি অদ্ভুত বিলাস—মানুষ-নামক জন্তুদের ভয় দেখিয়ে আনন্দ পাওয়া! পাকা সড়কের এক 'চুলের-কাঁটা-বাক'-এর মুখে তিনি ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা! বাঁকের ও-প্রান্তে কোন মোটর গাড়ির শব্দ হলেই হাউ-মাউ-খাঁউ শব্দে দুটো কান ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে আর গর্জন করতে করতে ছুটে আসতেন মোটর গাড়িটা লক্ষ্য করে। একেবারে কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং কুতকুতে চোখ মেলে দেখতেন আরোহীরা কে কি করছে। যখন নিশ্চিত বুঝতেন যে, আরোহীরা সকলেই নিজ নিজ পিতৃনাম পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে, তখন হেলতে-দুলতে অরণ্যে মিশে যেতেন! নিত্যি ত্রিশদিন তাঁর এই অদ্ভুত খেলা! কখনও কোনও গাড়ির ক্ষতি তিনি করেননি। সৌভাগ্যক্রমে কেউ কখনও তাঁকে গুলিবিদ্ধ করার চেষ্টাও করেনি। শেষদিকে ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর কেউ কেউ তাঁর ফটোও নিয়েছে। তার একটি নমুনা এ-গ্রন্থের সামনের দিকে দেওয়া গেল।

শিকারী সিডনে ডাউনী তাঁর অভিজ্ঞতায় বলেছেন, একবার তিনি একটি বন্যহস্তীকে জল থেকে পিছন পায়ে ব্যাক-গীয়ারে হাঁটতে দেখেছিলেন। কর্দমাক্ত অঞ্চলটা পার হয়ে শক্ত পাথুরে জমিতে পৌঁছে সে সামনের দিকে ফেরে। অর্থাৎ পদচিহ্ন দেখে মনে হবে এখানে হাতীটা জলে নেমেছিল—জল থেকে উঠে যাবার কোন 'এভিডেন্স' সে রেখে যায়নি।

ওদের স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়কর—বিশেষতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্মৃতি। দু'মাইল দূর থেকে হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বুঝতে পারে আগন্তুক কালা-আদমী, না সাদা-চামড়ার মানুষ। প্রথমোক্তের গায়ে ঘামের গন্ধ, দ্বিতীয়োক্তের হয়তো কোন প্রসাধনের সুবাস!

কর্নেল ক্রস-স্মিথ অনেকদিন কেনিয়ায় ছিলেন। তিনি একবার একটা বাচ্চা হাতীকে ধরেছিলেন। ধরার পরে দেখলেন হাতীটার পিছনের পায়ে মারাত্মক একটা ঘা হয়েছে। উনি পশু-চিকিৎসা জানতেন। হাতীর বাচ্চাটাকে একটা শক্ত কাঠের ফ্রেমে বেঁধে ফেললেন। খাঁচাটা এত ছোট যে, বেচারি

আর নড়াচড়া করতে পারে না। এবার উনি ঘা-টা সারাতে বসলেন। প্রথমে বাচ্চাটার কী তীব্র প্রতিবাদ! খাঁচাটা ভেঙে ফেলার কী প্রচণ্ড প্রয়াস! কিন্তু তিন-চার দিনের মধ্যেই হাতীর বাচ্চাটা বুঝে নিল কর্নেল-সাহেবের কোন অসদুদ্দেশ্য নেই—তিনি ওর চিকিৎসা করছেন মাত্র। এরপর থেকে সে আর কোন প্রতিবাদ করেনি। ভাল হয়ে যাবার পর বাচ্চাটা অনেকদিন ছিল ওঁর কাছে, যতদিন না নাইরোবির জাহাজ আসে। কিন্তু সে সময় সে ক্রস-স্মিথকে দেখলেই ছুটে চলে আসত—শুঁড় দিয়ে ওঁর হাতটা জড়িয়ে ধরে ওর ক্ষতস্থানের চিহ্নটা দেখাত। যেন বলত: ডাক্তার সাহেব। আমি কিন্তু ভুলিনি!

আবার কোন কোন হস্তি-বিশারদ হাতীর মূর্খামির কথাও লিখে গেছেন। যেমন, মিস্টার ই. পি. গী,। ১৯৫৮ সালে সিংহলের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির মুখপত্রে একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: জঙ্গলের ভিতর আমি একটি বন্য-হাতীর পা গাছের ডালে আটকে যেতে দেখেছিলাম। মাটি থেকেই দু-মুখো দুটো ডাল ইংরাজি Y অক্ষরের মত বেরিয়েছে, আর সেই খাঁজেই আটকে গেছে বেচারির পিছনের একটা পা। ঠ্যাঙটা একটু উঁচু করলেই সে বেঁচে যায়—কিন্তু সেটুকু বুদ্ধি তার হল না। একাদিক্রমে চৌদ্দ দিন উন্মাদের মত সে তার পা-টাকে টানতে থাকে। মাংস কেটে হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে গেল! শেষে পরিশ্রমে আর অনাহারে বেচারি প্রাণত্যাগ করে। যারা এ দৃশ্য দেখেছিল তারাও সাহস করে ওর পা-টাকে খুলে দিতে পারেনি! তা মনুষ্যকুলেও দা ভিঞ্চি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ছাড়া এমন গঙ্গারামও তো থাকে, যে উনিশটি বার ম্যাট্রিকে এসে ঘায়েল হয়ে থামে!

হাতী যে সাঁতার কাটতে পারে একথা সবার জানা; কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, স্থলচর জীবের ভিতর হাতীই সম্ভবত সবচেয়ে দক্ষ-সাঁতারু! স্যাণ্ডারসন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন (১৮৭৮):

"একবার ঢাকা থেকে আমি উনআশিটি হাতীকে কলকাতার কাছাকাছি শহর ব্যারাকপুরে পাঠিয়েছিলাম। ১৮৭৫ সালের নভেম্বরে। পথে পদ্মা ছাড়া আরও অনেকগুলি বড় বড় নদী তাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল। পদ্মা পার হতে তাদের নয় ঘণ্টা সময় লাগে। ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত সাঁতরে মাঝের একটি চড়ায় তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে; তারপর আবার তিন ঘণ্টায় মরাগাঙ পার হয়। একটি হাতীও এ যাত্রায় খোয়া যায়নি।"

এ ঘটনা তো একশ' বছর আগেকার। জেমস্ উইলিয়াম বলেছেন (১৯৫০), সুন্দরবনের জঙ্গলে একটি বন্যহস্তীকে তিনি বারো বছর ধরে দু'শ' মাইল

এলাকায় বিচরণ করতে দেখেছেন। সে অনায়াসে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যেত।

ওদের অপত্যস্নেহও মর্মস্পর্শী। দু-একটি ঘটনার কথা বলি। প্রথম ঘটনাটি বর্ণনা করছেন ও'ব্রায়ান-সাহেব :

ন্যাশনাল পার্কের কর্ণেল ট্রিমার হাতীর পুত্রস্নেহের বিষয়ে একটি মর্মন্তুদ বিবরণ আমাকে দিয়েছিলেন। একবার তিনি বনের মধ্যে একটি মাদী হাতীকে তার দুটি গজদন্তের উপর একটি সদ্যোজাত হস্তিশিশুকে বহন করে নিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন। হাতীর বাচ্চা জন্মের দু-এক মিনিটের ভিতরেই উঠে দাঁড়ায়, এভাবে তাকে 'কোলে করে' নিয়ে যেতে হয় না। ব্যাপার কি? কর্ণেল সাহেব বিস্মিত হয়ে হাতীটার পিছু নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি বুঝতে পারলেন বাচ্চাটা মারা গেছে—অথচ ওর মা বোধহয় সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। পুরো তিনদিন ঐভাবে তার মা তাকে বহন করে বন থেকে বনান্তরে চলেছিল! দুরন্ত কৌতূহলে কর্নেল ট্রিমারও তার পিছু-পিছু চলেছিলেন। সন্তানহারা জননী এ তিনদিন কিছুই খায় নি। নদী পার হবার সময় সন্তানকে সাবধানে নামিয়ে জলপান করেছে মাত্র। শেষে দেখা গেল ওর মা একটা নরম কর্দমাক্ত স্থানে বাচ্চাটাকে নামিয়ে দিল। দাঁত দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ল। সাবধানে বাচ্চাটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ঐ গর্তে শুইয়ে দিল। আর তারপর শুঁড় দিয়ে মাটি টেনে টেনে গর্তটা বুঁজিয়ে দিল।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। না-হলে কাহিনীটি বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয় কাহিনীটি জানাচ্ছেন জেমস্ উইলিয়াম :

আমি তখন বর্মামুলুকে এক সেগুনকাঠের ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। মা'শুয়ে ছিল আমাদের পোষা হাতী। ভারী বাধ্য ছিল সে আমার। ক্রমে মা'শুয়ের একটি বাচ্চা হল। বাচ্চাটার নাম কী ছিল তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম বাচ্চা হবার পরেও ওর মায়ের নামটা বদলালো না।—ও, আপনাদের বলা হয় নি;—বর্মী ভাষায় মা'শুয়ে শব্দটার অর্থ 'মিস্ গোল্ড' বা 'কুমারী সোনামণি'। মিস্ মিসেস্ হলেন, কিন্তু নামটা ওর সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে, তিনি মিস্‌ই রয়ে গেলেন। তা সে যা-ই হোক, বাচ্চাটা যখন মাস তিনেকের তখন আমাকে একবার ইমেথিন থেকে মান্দালয়ের দিকে একটা কাঠগুদামে যেতে হল। মাইল পনের দূরের ঘাঁটি। পাহাড়ে রাস্তা, টংদুইন নদীর অববাহিকা ধরে খাড়া উত্তর-মুখো।

ভোর-ভোর রওনা দিলে ওখানে পৌছে লাঞ্চ খাওয়া যাবে। তবে সময়টা বর্ষাকাল, গত রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে—পথ কেমন আছে কে জানে?

যাত্রার সময় দেখি বাচ্চাটা এসে জুটেছে। কিছুতেই মাকে ছাড়বে না। ভারি বায়না ওর। ভাবলাম ওটাও চলুক। তিন মাসের বাচ্চা দিনে পনের মাইল দিব্যি পাড়ি দেবে।

আমাদের পথ নির্বিড় অরণ্যের মাঝখান দিয়ে। একদিকে ঘন জঙ্গল, একদিকে কলনাদিনী টংতুইন। বাচ্চাটার কী ফুর্তি। কখনও আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, কখনও পিছিয়ে পড়ে জঙ্গলে লুকায়। একবার বাঁকের মুখে তাকে দেখতে না পেয়ে সোনামণি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এ জঙ্গলে বাঘ আছে। বাধ্য হয়ে উল্টোপথে কিছুটা ফিরে এলাম। দেখি বাচ্চাটা খাড়া নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খরস্রোতা টংতুইনকে দেখছে। লক্ষ্য করে দেখি গতরাত্রে পাহাড়-অঞ্চলে যে বৃষ্টি হয়েছে এতক্ষণে তার ফলশ্রুতি দেখা দিয়েছে টংতুইনের বুকে। প্রতি মিনিটে তার রূপ বদলে যাচ্ছে—অর্থাৎ প্রচণ্ড বন্যার তাণ্ডব এসে পড়ল বলে। হঠাৎ নদীর পাড়ের একটা চাপড়া ভেঙে গেল, আর সশব্দে বাচ্চাটা উল্টে পড়ল নদীগর্ভে। তীব্র আর্তনাদে সোনামণি চীৎকার করে উঠল।

আমি তৎক্ষণাৎ নেমে পড়লাম ওর পিঠ থেকে। সোনামণি ছুটে গেল নদীর কিনারায়। বিশ হাত দূরে বাচ্চাটার মাথা জেগে উঠল একবার, পরক্ষণেই ডুবে গেল। অকুতোভয়ে সেই আটফুট উঁচু পাড় থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনামণি। মা আর বাচ্চা দু'জনেই ভেসে গেল।

আমিও ছুটলাম নদীর কিনারা ধরে। দেখলাম সাঁতরে গিয়ে সোনামণি বাচ্চাটাকে ধরেছে। শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তিল তিল করে বিপরীত দিকে তাকে টেনে আনছে। অবশেষে এসে পৌছল কিনারায়। কিন্তু নদীর পাড় সেখানে একেবারে খাড়া। পা রাখার জায়গা নেই। উঠবে কেমন করে? বাচ্চাটার সেখানে ডুবজল, ওর মা বোধহয় মাটিতে পা পাচ্ছে। নিজের প্রকাণ্ড দেহটা দিয়ে সে ঠেসে ধরল বাচ্চাটাকে নদী-কিনারের খাড়া পাহাড়ে। মিনিট পনের এভাবেই কাটল। ইতিমধ্যে নদীতে ঢল নেমেছে—অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জলের গভীরতা বাড়ছে, বাড়ছে স্রোতের টান। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে শুঁড় তুলে মা'শুয়ে প্রচণ্ড গর্জন করল। জানি না নদীকেই সে অভিসম্পাত দিল—না ঈশ্বরকে। একবার অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল! সে মর্মভেদী দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু আমি কী করব? আমার ক্ষমতা কতটুকু? ঠিক তখনই টংতুইন নিষ্ঠুর রাক্ষসের মত ওর শুঁড়ের বন্ধন থেকে বাচ্চাটাকে

ছিনিয়ে নিল। এক লহমায় বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল হস্তিশিশু। কিন্তু মা'শুয়ে হার মানবে না, দ্বিতীয়বার সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। দুজনেই ভেসে গেল প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করল সোনামণি—আবার নাগাল পেল তার হারানো সন্তানের। আবার সাঁতার কেটে ঠেলতে ঠেলতে সে এসে পৌঁছল নদী-কিনারে। গজকুম্ভ দিয়ে আবার ঠেসে ধরল খাড়া পাড়ের গায়ে। তার পরেই একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সোনামণি তার শুঁড়টা চালিয়ে দিল বাচ্চাটার তলপেটের নিচে। চাম্পিয়ান ওয়েট-লিফ্টার যেভাবে বারবেল্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে মাথার উপর তোলে, তেমনি করে শুঁড় দিয়ে সে তিন-মাসের একটা হস্তিশাবককে তুলতে থাকে জলের উপর। প্রায় পুরো একমিনিট সময় লাগল তার। জানি না তখন সে মাটিতে দাঁড়িয়ে, অথবা সাঁতার কাটছে। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করল সোনামণি। জল থেকে তুলে বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিল একটা পাথরের খাঁজে—জলতল থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উপরে। আতঙ্কতাড়িত বাচ্চাটা যেই লাফ দিয়ে পাথরে নামল অমনি তার প্রতিঘাতে পদস্খলন হল সোনামণির। টংজুইন যেন শিকার ফসকে যাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে। গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতের মত ভেসে গেল সোনামণি। নদী তখন ভয়ঙ্করী। চকিতে আমার মনে পড়ল ওখান থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে একটা জলপ্রপাত আছে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে নদী সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সোনামণির অনিবার্য মৃত্যুতে আমি হায়-হায় করে উঠলাম। ওর বাচ্চাটা এ খবর জানে না—আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টিতে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মাথায়।

প্রায় দশমিনিট পরে দেখলাম সোনামণি হার স্বীকার করেনি। জল থেকে স উঠে পড়েছে। প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে সে ভীম বেগে ছুটে আসছে। কিন্তু ভুল করে সে উঠেছে নদীর ওপারে। হয়তো ভুল করে নয়—এদিকে আবার খাড়া পাড়, ওদিকে তা নয়। বেচারির উপায় ছিল না। ওপার থেকে বাচ্চাটাকে দেখে সে আনন্দে উল্লাসধ্বনি করে উঠল। কিন্তু মাতাপুত্রে মিলন তখন আর সম্ভবপর নয়। ইতিমধ্যে নদী আরও ফুট-পাঁচেক বেড়েছে—অর্থাৎ বাচ্চাটার পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে চলেছে জলস্রোত। এখন আর ওর মায়ের মত দক্ষ সাঁতারুর পক্ষেও এ নদী অনতিক্রম্য!

নদীর ওপারে মা, এপারে আমি, আর মাঝখানে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাটা! সারাটা দিন এভাবেই কাটল। জল কমার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সোনামণি মাঝে মাঝে ওপার থেকে গর্জন করে উঠছে, বাচ্চাটা

ভয়ে সাড়া দিচ্ছে না। কান নাড়াচ্ছে শুধু। সাড়া দিচ্ছে টংতুইন—তা
খল খল হাস্যরোলে !

ঘনিয়ে এল রাত। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলাম একটা গাছের উপর। সেখা
থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে মায়ের গর্জন আর উন্মাদিনী টংতুইনে
ফেনিল আক্রোশ! নীরন্ধ্র অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শেষে ক্লা
হয়ে সোনামণি গর্জন বন্ধ করল। আমি নেমে এলাম গাছ থেকে। টর্চ জ্বে
দেখলাম। না—তুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। নদীর একই রূপ। আমা
টর্চের আলোয় বাচ্চাটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, চঞ্চল হয়ে উঠল। ভয় হ
শেষে জলে না লাফিয়ে পড়ে! টর্চ নিভিয়ে দিলাম।

ভেবে দেখলাম, আমার কিছুই করণীয় নেই। খামকা রাত্রে ওদের মা
মাঝে বিরক্ত করে কী লাভ? ফিরে গেলাম গাছের উপর। যে মহানাট্যকা
এ নাটকটি ফেঁদেছেন তাঁর ইচ্ছাই জয়ী হবে। কাল সকালে এসে দেখ
ওদের ভাগ্যে কী ঘটল!

পরদিন ভোর না হতেই ছুটে এলাম নদীর কিনারে। তার পূর্বেই নাটকে
যবনিকাপাত ঘটেছে। ওরা কেউ নেই। না মা, না তার সন্তান। আ
আশ্চর্য নিরাসক্ত নিষ্ঠুর ঐ টংতুইন! এ নাটকে তার যে ভূমিকা ছিল সে
শেষ করে সূর্যের আলোয় এখন সে নির্লজ্জের মত চিক্‌চিক্ করে হাসছে
জলের গভীরতা একেবারে কমে গেছে। এখানে-ওখানে নদীর বুকে পা
জেগে উঠেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম নদীর কিনারে। তীব্র একটা যন্ত্রণা বো
করেছিলাম অন্তরে। এমনভাবে শেষ হল টংতুইন আর সোনামণির দ্বৈর
সমর!

হঠাৎ চম্‌কে উঠি প্রচণ্ড এক বৃংহিত-ধ্বনিতে!

পিছন ফিরে দেখি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে সোনামণি আর তার কোল
ঘেঁষে ওর ন্যাওটা বাচ্চাটা!

আকাশে শুঁড় তুলে সে যেন আমাকে ডাকছে: আসুন স্যার! এবার
যাওয়া যাক! আমরা তুজন বহাল তবিয়ৎ!

পুণ্ডরীকের প্রথম ও শেষ শিকারেরও গল্প শুনল।

কিন্তু সে গল্প বলার আগে বলতে হয় লালচাঁদের প্রথম শিকারকাহিনী।

১৯৩৫ সালে সূর্যকান্ত শেষবার গিয়েছিলেন ফাঁসি-শিকারে। বিমলা তার

জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিল প্রভুকে ; কিন্তু বছরখানেক পরেই মারা গিয়েছিলেন সূর্যকান্ত। গণেশ-সর্দারকে পরের বছর আর ঝাঁসিয়াড় হতে হয়নি।

তার তিন বছর পরের কথা। সূর্যকান্ত নেই—কিন্তু কোন ক্রমোসমের গুপ্তপথে ঐ দুঃসাহসী মরণ-খেলার নেশা সঞ্চারিত হল সূর্যকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র লালচাঁদের ধমনীতে। লালচাঁদের বয়স তখন আঠার-উনিশ। সে গোপনে এসে হানা দিল গণেশ-সর্দারের ছাপরায়। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। 'ভারতবর্ষের ট্রাডিশান সেই সমানতালে চলেছে।' গণেশ দাওয়ায় বসে একটা দড়ির খাটিয়ার দড়ি পরাচ্ছিল। খেদা-মরশুম শেষ হয়েছে। তবু গণেশের কাজের কি অন্ত আছে ? নতুন-ধরা চার-চারটে হাতী সাইারে আবদ্ধ আছে। তাদের তালিম দিচ্ছে পাঁচ-সাতজন দাইদার আর খিদমদগার। গণেশকে সকাল-সন্ধ্যা তার তদারকি করতে হয়। এছাড়া নিজে চোখে না দেখলে সব বেটাই ফাঁকি দেবে। হাতীর চানা সরিয়ে মাহুতেরা মুদি-দোকানদারের কাছে বেচে দিয়ে আসবে, যদি না সে নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করে। এইসব করতেই গণেশের সূর্য পাটে বসে। সন্ধ্যায় সে বসেছিল খাটিয়াটাকে মেরামত করতে। গণেশের মা ঘরের ভিতর কাঠের নির্বাপিতপ্রায় উনানে ফুঁ-পাড়তে পাড়তে কাকে যেন গাল পাড়ছিল। বোধকরি তার ভাগ্যকেই। এমন সময় সাইকেলে চেপে হঠাৎ হাজির হল লালচাঁদ। ছোটকর্তাকে আসতে দেখে গণেশ হাঁক পাড়ে,—এ্যাই পুণ্ডি ! ছুট দেউতার তরে এটা চারপাই লৈআয়।

পুণ্ডি অর্থাৎ পুণ্ডরীক একটা হাফপ্যাণ্ট পরে গুলতি হাতে কাক মারছিল টিপ করে। হঠাৎ ছোটকর্তাকে আসতে দেখে গুলতিটা পকেটস্থ করে সে এগিয়ে আসে। বাপের নির্দেশমত সে ঘরের ভিতর থেকে কাঠের জলচৌকিটা বার করে আনতে যায়। সেই অবসরে কিশোর লালচাঁদ গণেশ-সর্দারের কানে কানে বলে, গণেশ-কাকা, তোমার সঙ্গে একটা গোপন কথা ছিল। এখানে হবে না। আমি ঐ হাটতলার জোড়াবটের নিচে থাকব। তুমি এস।

গণেশ একটু অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তার বিস্ময়ের ঘোরটা কাটবার আগেই লালচাঁদ তার সাইকেলে চেপে মুহূর্তমধ্যে মিলিয়ে যায়। দশ বছরের পুণ্ডি জলচৌকিটা হাতে বেরিয়ে এসে দেখে অতিথি চলে গেছে। গণেশ তখনই উঠে পড়ে। রওনা দিতে যাবে, তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওর বুড়ি মা। বলে, ছুট দেউতা আসিছিল কিয় রে ?

গণেশ জবাব দেয় না। ছোটকর্তার ভাবভঙ্গিতে কী যেন একটা ইঙ্গিত আছে। কী এমন গোপন কথা ? তবে এটুকু সে বুঝেছে, কথাটা ছোটকর্তা

তার বুড়ি মা অথবা পুণ্ডরীকের সামনে বলতে চায় না। পায়ে পায়ে সে চলে আসে নির্জন হাটতলায়, জোড়াবটের ঝুড়ি-নামা আবছায়ায়।

ছোটকর্তার কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল গণেশ!

শুধু কি স্তম্ভিত? না, আরও একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল তার। মাথাটা ঝন্‌ন্ করে উঠল। রক্তের মধ্যে একটা অদম্য উত্তেজনা। এ ডাক সে বহুবার শুনেছে—প্রতিবারই একই রকম অনুভূতি হয়েছে তার।

লালচাঁদ তাকে অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিয়েছে: চল গণেশ-কাকা, তুমি আর আমি এবার ফাঁসি-শিকারে যাই! তুমি ফাঁসিয়াড়, আমি তোমার সাকরেদ!

গণেশ শিউরে উঠেছিল। দু'হাতে নিজের কান চাপা দিয়ে বলে উঠেছিল, ঈ বাবা! এমত কত্তা মোক নকব দেউতা! এই বরতে বৌরাণী মোক চুলধর্ণি দি মোহনপুরর পরা বাহির করি দিব এতিয়াই!

সৌজন্যবোধে মুখে বলেছিল বটে 'চুলের মুঠি ধরে মোহনপুর থেকে বার করে দেবে,' কিন্তু মনে মনে তার আশঙ্কা ছিল—বৌরাণী, অর্থাৎ সূর্যকান্তের বিধবা স্ত্রী জানতে পারলে গণেশ-সর্দারকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

—মা জানতে পারবে না।

হাত দুটি জোড় করে গণেশ বলে, ছুট দেউতা, নেডাক, মোক নেডাক। ময় তোমাক অনুরোধ করিছোঁ—নেডাক, মোক নেডাক।

লালচাঁদের মনে হল ঐ প্রৌঢ় গণেশ-সর্দার যুক্তকরে কথাটা তাকে বলছে না, বলছে বড়দন্ত-গজরাজকে। লালচাঁদের কণ্ঠে সে অরণ্যের গজপতির আহ্বানই শুনতে পেয়েছে। তাই আর্তকণ্ঠে বারে বারে যেন বলছে, অমন করে আমাকে ডেক না দেবতা, আমি মিনতি করছি।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি গণেশ। বেচারির দোষ নেই। তার রক্তের মধ্যে অনেক গভীরে ঢুকে গিয়েছিল এ নেশার বীজাণু। লালচাঁদের কিশোর কণ্ঠে সে শুধু অরণ্যের আহ্বানই শোনেনি, শুনেছিল তার স্বর্গত দেউতার আহ্বান! আশ্চর্য! যেন হঠাৎ কিশোরের বেশে সূর্যকান্ত স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন ওর কাছে। তেমনি উজ্জ্বল চোখ, শ্যামল রঙ, তেমনি টিকালো নাক, ব্যক্তিত্বময় চিবুক। শেষ পর্যন্ত সে অন্য যুক্তির অবতারণা করতে বাধ্য হল। জীবনে সে ফাঁস ছোঁড়েনি—সাতাশ বছর ধরে ক্রমাগত সে সাকরেদি-ই করে গেছে। ফাঁস ছুঁড়তে সে সাহস পায় না—বিশেষ সূর্যকান্তের অনভিজ্ঞ বংশধরকে সাকরেদ করে।

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠেছিল বেপরোয়া কিশোরটি। হাসি তো নয়,

যেন কিশোর হস্তীর বৃংহণ। আবার চমকে উঠেছিল গণেশ-সর্দার। বলেছিল, ঈ ছুট দেউতা! চিঞরি হাসিছ কিয় ?

হাসি থামিয়ে লালচাঁদ বলেছিল, গণেশ-কাকা, তুমি এমন কোন ফাঁসিয়াড়ের কথা চিন্তা করতে পার, যে জীবনে প্রথম ফাঁস ছোঁড়ার আগে ফাঁস ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ?

প্রশ্নটা জটিল। তার মর্মার্থ গ্রহণ করতে নিরক্ষর গণেশ-সর্দারের সময় লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন বুঝল তখন প্রণিধান করল—যুক্তিটা অকাট্য। অমন যে দক্ষ-ফাঁসিয়াড় সূর্যকান্ত, তাঁকেও জীবনে প্রথমবার অনভিজ্ঞ-হাতে ফাঁস ছুঁড়তে হয়েছে। প্রথম শিকারে অনভিজ্ঞই যেতে হয়। না-হলে কেউ শিকারী হতে পারে না।

কিন্তু না। তার যুক্তিটাও অকাট্য। বৌবাণীর অজ্ঞাতে অনভিজ্ঞ সাকরেদ নিয়ে সে প্রথমবার ফাঁসিয়াড় হতে রাজী হতে পারে না। সে-দায়িত্ব সে কিছুতেই নেবে না।

—বেশ। তবে তুমি সাকরেদি-ই কর। আমিই ছুঁড়ব ফাঁস!

আবার চমকে উঠেছিল গণেশ-সর্দার। জানতে চেয়েছিল, তুমি কি জান ফাঁস ছোঁড়ার ?

লালচাঁদ জবাব দেয়নি। সাইকেলের কেরিয়ার থেকে একগাছা দড়ি বার করে বলে, এই দেখ।

মাঠে চরছিল কার একটা ছাগল। লালচাদ তার দিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে। ছাগলটা আচমকা ভয় পেয়ে যেই ছুটতে শুরু করল, অমনি লালচাঁদ তার ল্যাসো ঘুরিয়ে ছুঁড়ল ছাগলটাকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। ধাবমান ছাগলের গলায় আটকে গেল দড়ির ফাঁস।

নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না গণেশ।

সে জানত না—দীর্ঘ দু' বছর একলব্যের সাধনায় লালচাঁদ ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে অতি দক্ষ ফাঁসিয়াড়।

দ্বৈরথ সমরে সে বড়দন্ত-গজরাজের মোকাবিলা করার তাগৎ রাখে বটে!

মোটকথা রাজী হয়ে গেল গণেশ। কাউকে কিছু না জানিয়ে দুজনে বার হয়ে পড়ল হাতিশাল থেকে দুটি হাতী বেছে নিয়ে। নার্জনির পিঠে লালচাঁদ, আর গণেশ-সর্দার বেছে নিয়েছিল আর একটি শিক্ষিত কুম্‌কিকে—মতিয়া তার নাম। উপায় নেই, সোমুত্তর-এর দেওয়া প্রতিশ্রুতির মর্যাদা মিটিয়ে দিতে হবে। বৎসরান্তে একটি দিন সোমুত্তর-এর বংশধরকে বড়দন্ত-গজরাজের সঙ্গে

দ্বৈরথ সমরে নামতে হয়। শত্রুভাবে গজপতিকে ভজনা করতে হয়। গণেশ সাবধানী— সে জানত, ছোটকর্তার যদি ভালমন্দ কিছু হয় তবে বৌরাণীর সামনে সে কোনদিনই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আত্মহত্যা ছাড়া তার তখন গত্যন্তর থাকবে না। তা মৃত্যুকে সে ভয় পায় না; কিন্তু একটি অপরিণামদর্শী কিশোরের কথায় সে যেন ধাষ্টামো না করে বসে। তাই জঙ্গলে যাবার আগে সে লালচাঁদকে ঠিকমত বাজিয়ে নিল। আশ্চর্য! প্রতিটি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হল কিশোর-বয়স্ক শিকারী। হাতীকে না বসিয়ে সে তার শুঁড় বেয়ে উঠতে পারে, পিছনের পা বেয়ে নেমে আসতে পারে। দ্রুত ধাবমান হাতীর পিঠে সে শুয়ে পড়তে পারে, বসতে পারে, এমন কি দাঁড়িয়েও উঠতে পারে— বিনা হাওদায়। এরপর আর গণেশ আপত্তি করতে পারেনি।

ভাগ্যক্রমে একটি অল্পবয়সী হাতীরই সন্ধান পেয়েছিল ওরা। সেরকমই নির্দেশ দেওয়া ছিল গণেশের। হস্তিযূথের ভিতর একটি অল্পবয়সী মাদী হাতী যেন বেছে নেয় লালচাঁদ। তাই নিয়েছিল সে। তার ফাঁস ছোঁড়াও হয়েছিল নির্ভুল এবং বলাবাহুল্য অভিজ্ঞ সাকরেদ তার ভূমিকাটিও অভিনয় করেছিল নিখুঁতভাবে।

ফাঁসি-শিকারে সেই হল লালচাঁদের হাতেখড়ি। দুর্দান্ত গজরাজের রাণীমহাল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল রাজমহিষীকে। সংযুক্তা হরণের পুরস্কার— লালচাঁদের গিন্নি!

এরপর দীর্ঘ দশ-পনের বছর দুজনে জোড়-বেঁধে শিকারে গেছে। প্রতি-বছরই গণেশের বুড়ি মা গাল পেড়েছে। মাথা খুঁড়েছে। কিন্তু কর্ণপাত করে-নি গণেশ। সূর্যকান্তের বিধবা স্ত্রী কিন্তু লালচাঁদকে কোনদিন বারণ করেননি। তিনি বোধকরি জানতেন, বারণ করলেও সে শুনবে না। ও একটা বংশানুক্রমিক রোগ—ওর চিকিৎসা নেই!

কিন্তু গণেশের বুড়ি মা অথবা সূর্যকান্তের স্ত্রীর পক্ষে যা সম্ভবপর হয়নি, তাই সম্ভবপর করলেন আর একজন। অতি ধীরে ধীরে তিনি বিস্তার করলেন তাঁর প্রভাব—যা অতিক্রম করার ক্ষমতা ছিল না গণেশ-সর্দারের। তাকে বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াতে হল এই বৎসরান্তিক মরণ-খেলা থেকে। সেই আমোঘ বাধাদানকারী হলেন—মহাকাল! ক্রমশঃ গণেশের দেহ জরাগ্রস্ত হয়ে এল, বেচারির দৃষ্টিশক্তি গেল সবার আগে। চোখে ছানি পড়ল। দেহ হয়ে এল অশক্ত। বাধ্য হয়ে অবসর নিল গণেশ। জুটি ভেঙে গেল।

কিন্তু মহাকালের কাছেও হার মানে না মানুষ! রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হল

নূতন সৈনিক। উপস্থিত হল গণেশ-সর্দারের ছেলে পুণ্ডরীক। বয়সে সে লালচাঁদের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। বংশানুক্রমিক রোগে সেও ভুগছে। এসে বললে একদিন কর্তামশাইকে—সে রাজী আছে সাকরেদ হতে।

লালচাঁদ তখন আর ছোটকর্তা নয়, সে তখন কর্তামশাই। ভবতারিণী গত হয়েছেন, গণেশের মাও মারা গেছে। প্রণবেশ দীর্ঘদিন প্রবাসী. ওঙ্কারনাথজী তো সংসারে থেকেও নেই। ফলে লালচাঁদই এখন সংসারের কর্তামশাই।

গণেশের কোন ভাবান্তর নেই। বিনা দ্বিধায় সে পুত্রকে তালিম দিয়ে দিল। নিজের হাতে শিখিয়ে দিল ফাঁস-ধরার কায়দা, ফাঁস-ছোঁড়ার কসরং। সংসারে এখন ঐ পুণ্ডরীকই তার একমাত্র আকর্ষণ। মা মারা গেছে. প্রথম পক্ষের স্ত্রীও গেছে। ময়না সেই যে গৃহত্যাগ করেছে তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। না যাক, তাতে দুঃখ নেই গণেশ-সর্দারের। পুণ্ডরীককে জড়িয়েই তার সংসার। তবু হাসিমুখে সে তাকে শিখিয়ে দিল ঐ মরণ-খেলার কায়দা। খেদা-শিকারের মরশুমে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসে মাহুত. ফান্দী, খিদমদগারেরা, বিভিন্ন গ্রামের মোড়ল। হাতী আসে—জংলী-হাতী, সাইঘরে ওঠে, থাকে. বদমাইসি করে, ডাঙশ খায়. পোষ মানে—তারপর চালান হয়ে যায় ঢাকা শহরের খেদা-অফিসে। ঢাকা শহর কেমন তা গণেশ জানে না, জানতে চায়ও না। নিজের কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত। খেদা-মরশুমে তার মরবার ফুরসৎ নেই। এদিকে ঐ শীতকালেই শহর-অঞ্চল থেকে আসেন অনেক সাহেবসুবো. মেমসাহেব, বাবুমশাইয়ের দল। কর্তামশাইয়ের মেহ্‌মান। তাঁরা আসেন বন্দুক আর রাইফেল নিয়ে.—বনে-জঙ্গলে গাছে গাছে শুরু হয়ে যায় হত্যা-উৎসব। মদিরা আর বাইজীর আসর বসে সান্ধ্য-বাসরে। তারপর শীতের শেষাশেষি যখন ঝরাপাতায় বনপথ ঢেকে যায় নরম গালিচায়, পলাশ আর শিমূলের বুকের গোপনে উঁকি দেয় জমাট রক্তের মত কুঁড়ির শিহরণ, শীতালী পাখির ঝাঁক উদাসী ডানায় ভর করে দলে দলে ফিরে যেতে শুরু করে উত্তর-মুখো, তখন লালচাঁদ ডেকে পাঠান পুণ্ডরীককে। নতুন যুগের নতুন প্রতাপ রায় তাঁর নবীন বরজলালের হাত ধরে চলে যান নিভৃত অরণ্যে—ষডদণ্ড-গজরাজের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরের আসরে অংশ নিতে!

পুণ্ডরীক ছিল সাকরেদ। প্রথম দিনেই সে লালচাঁদের সাকরেদি করে ধরেছিল অল্পবয়সী একটি হস্তিনীকে। পুণ্ডরীককেই লালচাঁদ দিয়েছিলেন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। এ পরিবারে তাঁর পরিচয়—ছোটামাঈ; যদিও পুণ্ডরীক তাকে ডাকত—'সারিন' বলে।

সারিনকে নিয়ে মেতে উঠল পুণ্ডরীক। তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, তাকে নানান কসরতে তালিম দেওয়ায় সে নিজের নাওয়া-খাওয়া ভুলে থাকত। লালচাঁদ মনে মনে হাসতেন—তাঁর মনে পড়ে যেত বড়ামাঈকে নিয়ে তিনি নিজেও একদিন ঐ রকম মাতামাতি করেছেন। বড়ামাঈ আজও একমাত্র লালচাঁদকেই প্রভু বলে মান্য করে, যদিও তার দেখ-ভাল করে গণেশ-সর্দার। সারিন কিন্তু প্রভুত্বে বরণ করল পুণ্ডরীককে। রোজ সকালে উঠে পুণ্ডরীক সারিনকে নিয়ে যেত গদাধরে। জলের ভিতর তাকে ফেলে দু'হাত দিয়ে রগড়ে ঘষে পরিষ্কার করত তার প্রকাণ্ড দেহটা। উকুন না জন্মায় তার কানের গর্তে, গলার খাঁজে। সপ্তাহে একদিন—প্রতি জুম্মাবারে সারিনের মাথায় নানান নকশা এঁকে দিত। পুণ্ডরীকের শরীর খারাপ হলে সারিনকে নিয়ে গণেশ পড়ত মুশকিলে। আর কারও হাতে সে খাবে না, আর কেউ তাকে নদীতে নিয়ে গেলে জলে নামবে না। গণেশ গালমন্দ করত ওর আদিখ্যেতায়। পুণ্ডরীক শুধু হাসত। জ্বর গায়েই হয়তো তাকে উঠে আসতে হত, সারিনের শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বলতে হত সে অসুস্থ, যেতে পারছে না। তা সেদিক থেকে ছোটামাঈ ভারি লক্ষ্মী, খুব বুঝমান—বুঝিয়ে বললে সে আর অভিমান করত না। দিনান্তে পুণ্ডরীক একবার দেখা দিলেই সে খুশি।

লালচাঁদ ওদের প্রণয়ের এই কাণ্ড দেখে হেসে বলতেন, ও গণেশ-কাকা, তুমিও কি আমার মায়ের মত ছেলেকে হাতীর সঙ্গেই বিয়ে দেবে নাকি? ঐ ছোটামাঈকেই কি ছেলের বউ করছ?

গণেশ হাসত হা-হা করে। পুণ্ডরীক লজ্জা পেত।

এ-ভাবেই কেটে গেছে আরও আট-দশ বছর।

পরিবর্তন এসেছে দুনিয়ায়। রাস্তাঘাট হয়েছে, ঘর-বাড়ি বেড়েছে গৌড় পুরে। হাটে দোকান খুলে বসেছে পশ্চিমা গদিদার। কোথায় বুঝি কাগজের কল হয়েছে, তাই বাঁশের ঝাড় চালান যায় আজকাল। দেশ স্বাধীন হয়েছে ইতিমধ্যে। তার আগে হয়েছে দাঙ্গা। পশ্চিম থেকে দলে দলে বাঙালী উদ্বাস্তু এসে জুটেছে এই বিজন বনেও। এখানে-ওখানে মাথা গুঁজবার আশ্রয় তুলেছে। অনেক উদ্বাস্তু এসে ঢুকেছে এই হস্তি-ব্যবসায়ে। দেশে-ঘরে তারা ছিল মজুরচাষী, ভাগচাষী, মধ্যস্বত্বভোগী অথবা মৎস্যজীবী—এখানে তারা হতে চায় মাহুত, দাইদার, খিদমদগার। উপায় কি? জমি কোথায় এ জঙ্গলে, যে চাষ করবে? ওদিকে পেট যে বড় অবুঝ। তার দাবী দৈনিক মেটাতে হয়। কর্তামশাই দু-চার-দশজনকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছেন। পরিবর্তন এসেছে

গণেশের সংসারেও। পুত্র লায়েক হবার পর সে তার বিয়ে দিয়েছে। সংসারে এসেছে পুত্রবধূ—ভারি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। নামটিও তার লক্ষ্মী। অসমীয়া নয়, মাহুত পরিবারের মেয়েও নয়—উদ্‌বাস্তু। বাপ-মা-আত্মীয়-স্বজন সব নিঃশেষ হয়েছে দাঙ্গায়। ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছিল এই পাণ্ডববর্জিত দেশে। হয়তো ভেসেই যেত সে একেবারে, নিতান্ত আল্লাতালার কৃপায় এসে নোঙর ফেলেছে গণেশের সংসারে। সেও আর এক ইতিহাস।

লালচাঁদ তখন জঙ্গলে। একদিন জীপ চালিয়ে সাহাগঞ্জের ফরেস্ট-রেঞ্জার-সাহেব এসে হাজির। তার জীপের পিছনে অচৈতন্য এক নারীদেহ। কী ব্যাপার? শোনা গেল মেয়েটিকে তিনি জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছেন। উনিশ-কুড়ি বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল নগানজুলির ধারে। কাছাকাছি আশ্রয় হিসাবে বড়গোঁসাইদের ডেরায় এনে তুলেছেন। ওঙ্কারনাথজী খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন। হাসপাতাল ত্রিসীমানায় নেই—তবে ডাক্তার আছেন। মাখন ডাক্তার। এ অরণ্যের ধন্বন্তরী। তিনিই ঔষধ-পথ্য দিয়ে মেয়েটিকে চাঙ্গা করে তুললেন। ওঙ্কারনাথ মেয়েটির দায়িত্ব নিলেন। তার স্থান হল মহালের একাংশে, দাসীমহলে। ওঙ্কারনাথজী শুনলেন মেয়েটির মর্মন্তুদ কাহিনী। সীমান্ত পার হবার আগেই দলের সকলে শেষ হয়ে গেছে। কোনরকমে প্রাণ নিয়ে সে পালিয়ে আসছিল—জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে।

লক্ষ্মী চুপচাপ বসে থাকে তার ঘরের মধ্যে। কারও সাথে মেশে না, কারও সাথে কথা বলে না। শুধু কাঁদে, কাঁদে আর কাঁদে। ওঙ্কারনাথ আত্মভোলা মানুষ—ওকে কেমন করে সান্ত্বনা দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। ভাবলেন, কোন একটা কাজকর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে মেয়েটি হয়তো মনের সাম্য ফিরে পাবে। একদিন মেয়েটাকে ডেকে বললেন, মা, এভাবে দিনরাত মনমরা হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। তোমার যা গেছে, তা আর ফিরবে না। তবু দিন তো কারও বসে থাকে না। তোমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে। মনকে শক্ত কর তুমি।

জলভরা দুটি চোখ মেলে মেয়েটি বললে, কেন আমাকে বাঁচালেন আপনারা?

—কী পাগল মেয়ে তুমি গো? বাপ-মা-ভাই-বোন কারও চিরদিন থাকে না। তুমি অমন চুপচাপ বসে থেক না তো! কাল থেকে তুমি মন্দিরে যাবে। পূজা করবে, ফুল তুলে আনবে, ভোগ রাঁধবে—

আর্তকণ্ঠে মেয়েটি বলেছিল, না!

চমকে উঠেছিলেন ওঙ্কারনাথ, না কেন?

মেয়েটি নতমস্তকে বলেছিল, সে অশুচি। দেবপূজার ফুলের জোগান দেবার অধিকার তার নেই।

কথাটা ঠিকমত বুঝে নিতে বেগ পেতে হয়েছিল সংসার-অনভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের। বাধ্য হয়ে মেয়েটি স্পষ্ট করে স্বীকার করেছিল - সে ধর্ষিতা, জাতিচ্যুতা।

ওঙ্কারনাথ তার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দিয়ে ওর কুসংস্কারকে খণ্ডন করতে পারেননি। তারপর লালচাঁদ জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। আদ্যোপান্ত কাহিনীটা শুনে মেয়েটিকে বললেন, বেশ, দেবতার সেবা করতে না চাও তো জীবের সেবা কর। আমাদের এখানে চারটি হাতী আছে। তাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমার। ভাঁড়ারের চাবিটা রাখ। ওজন-দাঁড়িতে মেপে ছোলা, ভুট্টা, গমের ভুষি বার করে দেবে --নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের খাওয়াবে। না, ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই—খাওয়ানোর জন্য মাহুত আছে। কিন্তু তারা গরীব। অনেক সময় অভাবের তাড়নায় তারা হাতীর চানা বিক্রি করে দেয়। তুমি শুধু দেখবে হাতীরা ঠিকমত খাবার পাচ্ছে কি না।

নতমস্তকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল মেয়েটি।

আজব এ দুনিয়া। সব হারিয়ে মৃত্যু ছাড়া যে মেয়েটি মুক্তির আর কোন পথ দেখতে পায়নি, সে-ই আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মৃত্যুর উপর জীবনের এমনই আধিপত্য। তিল তিল করে রূপান্তরিতা হল সর্বহারা মেয়েটি। এখন যে রুক্ষচুলে তেল দেয়, বিকালে গা ধোয়, কাপড়ের ছেঁড়া অংশ সেলাই করে, কথা বলে, গল্প করে, হাসে। মতির মা, সরিমাসী, মোক্ষদার মহলে ঠাঁই হয়েছিল তার। তারা এই লেখাপড়া-জানা মেয়েটিকে শুধু সহানুভূতির চোখেই দেখে না, শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। অবসর সময়ে সে ওদের কত দেশ-বিদেশের গল্প শোনায়, তাদের চিঠি লিখে দেয়—আর সব চেয়ে অবাক করা খবর--মেয়েটি নাকি রোজ খবরের কাগজ পড়ে।

সাত-সকালে উঠে লক্ষ্মী চলে আসে পিলখানায়। ভাঁড়ার খুলে হাতীর খাবার বার করে। ওজন-দাঁড়ি দিয়ে মাপে। গণেশ-কাকা ওকে শিখিয়ে দিয়েছিল কোন হাতীকে কোন খাবার কতটা দিতে হবে। গাছ-পাতা, ঘাস, বিচালি ছাড়াও ওরা চানা খায়। বাচ্চা একটা হাতীকে আবার চালে-ডালে খিচড়ি বানিয়ে খাওয়াতে হয়। সব শিখে নিল লক্ষ্মী।

প্রথম দিনেই পুণ্ডরীকের সঙ্গে ওর একটা ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। পুণ্ডরীক শুনেছিল বটে—কে একটা মেয়ে এসেছে, সে-ই নাকি এবার থেকে

হাতীর খাবার পৌঁছে দেবে। পুণ্ডরীক ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারপর মেয়েটি যখন একজন খিদমদগারের মাথায় ধামা চাপিয়ে এসে হাজির হল, তখন চমকে উঠল সে। মেয়েটিকে আপাদমস্তক একনজর দেখে নিয়ে খিদ্‌মদগারকে হুকুম করল খাদ্যদ্রব্যটা নামিয়ে রাখতে। লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ বলল, নামিয়ে রাখবে কেন? তুমি ওটা ওকে এখনই খেতে দাও।

পুণ্ডরীকের মেজাজ খাপ্পা হয়ে যায়। তার বিচিত্র ভাষায় মেয়েটিকে বলে, যাও বাছা, এখানে সর্দারি করতে হবে না। চানা মেপে দিয়েছ, পৌঁছে দিয়েছ, এখন তোমার ছুটি। যাও, ঘরে যাও।

পিলখানার সামনে মাজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ্মী। কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, গাছ-কোমর করে মাজায় শাড়িটা জড়ানো। হেসে বললে, তুমি আমাকে ছুটি দিলেও আমি যে তোমাকে ছুটি দিতে পারছি না, মাহুত-ভাই। চানাটা ওর ডাবায় ঢেলে দাও—ও খাক।

—মানে?—রুখে উঠেছিল পুণ্ডরীক।

—মানে, কর্তামশাই আমাকে হুকুম দিয়েছেন দাঁড়িয়ে থেকে ওদের খাওয়াতে।

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে পুণ্ডরীক, কিয়? মর চানা চুরি করিম নাকি?

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, সেটাই যে দেখে নেবার চাকরি আমার।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল পুণ্ডরীক। ইয়ার্কি নাকি! সে তার সারিনকে ঠিকমত খাওয়াচ্ছে কিনা তার তদারকি করবে একফোঁটা ঐ মেয়েটা! কিন্তু তার বিক্রম বেশিক্ষণ টেঁকেনি। ও-পাশ থেকে হরিশ মাঝি বলে ওঠে, হয়, হয়, কর্তামশাই এমনই হুকুম দিছেন শুনছি। কী আর করন পুণ্ডুভাই? মাইয়াডারে সহ্য করন লাগিবা হবে।

হরিশও উদ্‌বাস্তু। সম্প্রতি কাজে বহাল হয়েছে। পূর্ববঙ্গের ছেলে, কিছু কিছু অসমীয়া বলবার চেষ্টা করছে আজকাল। ফলে তার ভাষাটা ঐ বাচ্চা হাতীর খিচুড়ির মত—আধা চাল, আধা ডাল।

পুণ্ডরীক কিন্তু হার মানেনি। সবটুকু চানা সারিনের পাত্রে ঢেলে দিয়ে দুর্বোধ্য গজভাষে কী একটা নির্দেশ দিল তার সারিনকে। ছোটামাঈ ফঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে রইল। কুটোটি মুখে তুলল না।

লক্ষ্মী বলে, ও খাচ্ছে না কেন?

পুণ্ডরীক মুখ টিপে দুর্বোধ্য ভাষায় যা বলল তার অর্থ, তুমি সামনে দাঁড়িয়ে আছ বলে।

—আমি আছি তাই কি ?

—ও ভাবছে তুমি নজর দিচ্ছ। ওর হজম হবে না। পেট খারাপ করবে!

ও-পাশ থেকে হরিশ আর ইব্রাহিম হো-হো করে হেসে ওঠে।

কান লাল হয়ে গেল লক্ষ্মীর। সে নিজেই অনেক সাধ্য-সাধনা করল, কিন্তু সারিন অটল। তার কান দুটি নড়ছে, কিন্তু কিছুতেই সে খাবারের পাত্রে মুখ দিল না।

পুণ্ডরীক হাসতে হাসতে বললে, তুমি যাও বাছা! তোমার ছোট হয়ে গেছে। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। তোমার সামনে ও খাবে না।

দুম দুম করে পা ফেলে পরাজিত লক্ষ্মী ফিরে গিয়েছিল।

ক্রমে অবশ্য লক্ষ্মী বুঝতে পারল সারিনের খাওয়া তাকে তদারক করতে হবে না। তার মাহুত ঐ পুণ্ডরীক জন্তুটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তার চানা সে কোনমতেই বিকিয়ে দেবে না। বরং লক্ষ্মী যদি কোনদিন খাবার দিতে ভুলে যায় লোকটা নিজের খাবার ওর মুখের সামনে ধরে দেবে। হাতীটাও ওকে ছাড়া আর কাউকেই জানে না। পুণ্ডরীক ওকে গঙ্গাধরে স্নান করাতে নিয়ে যায়। শুঁড়ে বালতি নিয়ে কানের খাঁজে পুণ্ডরীকের শুকনো লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে সারিন যায় পিছু পিছু। আড়াল থেকে লুকিয়ে লক্ষ্মী দেখেছে আর পাঁচটা হাতার মত সারিন শুঁড়ে করে খাবার তুলে খায় না। পুণ্ডরীক হাতে করে তাকে খাইয়ে দেয়। দুর্বোধ্য ভাষায় তার সঙ্গে আগড়ম-বাগড়ম গল্প করতে করতে খাওয়ায়—যেন বাচ্চা ছেলেকে কাগের দলা বগের দলা খাওয়াচ্ছে। আর সবচেয়ে অবাক করা খবর, আর পাঁচটা মাহুত রাতের বেলা যে-যার ঘরে গিয়ে ঘুমায়, শুধু পুণ্ডরীক ঐ হাতিশালাতেই পড়ে থাকে সারিনের গা-ঘেঁসে তার দড়ির খাটিয়ায়।

একদিন আর থাকতে না পেরে লক্ষ্মী ওকে সোজাসুজি করে বসল,—এই, তুই রাতে ঘরে যাস্‌নে কেন রে ?

—তাতে তোর কি ?

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল লক্ষ্মী, তোর বউ রাগ করে না ?

হরিশ বলে ওঠে,—আরে ঘরে মাগ থাকলি কি আর এ্যাত বিত্তান্ত ?

লক্ষ্মীও হাসতে হাসতে বলে, ওকে বিয়ে করবে কে ? সতীন নিয়ে কেউ ঘর করবে নাকি ? ও তো পাগল।

লক্ষ্মীকে সুব্বাই মেনে নিল। ভালবাসল। শেষে একদিন লালচাঁদ ডেকে

পাঠালেন তাঁর হেড-জমাদারকে। বললেন, গণেশ-কাকা, লক্ষ্মী মেয়েটাকে কেমন লাগে তোমার ?

গণেশ একগাল হেসে বলে, কেটামান দিন দেখিছোঁ দেউতা, কিন্তু কী কহিম মা-জননী সঁচাই লক্ষ্মীব পিতিমা।

—তাই যদি হয়, তবে এক কাজ কর না গণেশ-কাকা, পুণ্ডরীকের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

শিউরে উঠেছিল গণেশ, সি কথাটো না-কব দেউতা।

—কেন, আপত্তি কিসের ?

আপত্তি আছে। গণেশ বুঝিয়ে বলেছিল। লক্ষ্মী মেয়ে তো বটেই, কিন্তু সে যে ধর্ষিতা, ধর্মচ্যুতা। তার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলে গণেশও জাতিচ্যুত হবে। লালচাঁদ ওকে অনেক করে বোঝালেন—মেয়েটার কী দোষ ? আর মাহুতদের এত কিসের জাতের বাড়াবাড়ি ? না হয় তিনি নিজের খরচে একটা ভোজ লাগিয়ে দেবেন, একটা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত করিয়ে দেবেন। কিন্তু গণেশ অটল। হাতদুটি জোড় করে ক্রমাগত বলতে থাকে, সি কথাটো না-কব দেউতা !

লালচাঁদকে নিবৃত্ত করেছিল কোনক্রমে, কিন্তু আক্রমণ এল এবার অন্যদিক থেকে। হরিশ, নবীন, রহমান, ইস্কান্দার, মতি—ওরা দলবেঁধে একদিন দরবার করতে এল তাদের সর্দারের কাছে। এরা সবাই পুণ্ডরীকের বন্ধু। তারা লক্ষ্য করেছে পুণ্ডরীক আর লক্ষ্মীর মধ্যে একটা প্যার পয়দা হয়েছে। তার অনিবার্য পরিণাম—পরিণয়। এমন একটা রোমান্টিক প্রেমকে ওরা ব্যর্থ হতে দেবে না। গণেশ উপায়ান্তরবিহীন হয়ে পুত্রকে ডেকে পাঠাল। সলজ্জে অপরাধ স্বীকার করল পুণ্ডরীক।

কী আর করা যায় ? বিয়ে দিতে হল।

মাহুত-সমাজে বিবাহও একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান। মুসলমান-সমাজের মত বিয়েটা হয় দিনের বেলায়, আর 'চুইধরি'টা হয় রাতের বেলা। 'চুইধরি' আবার কি ? বর্ণনা শুনে বোঝা গেল সেটা ফুলশয্যা আর বৌ-ভাতের একটা মিশ্র উৎসব। মাহুতদের পাঁজিতে যে কোন পূর্ণিমা রাত্রিই বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত—মাসের বাকি দিনগুলি নয়। বিবাহ-রাত্রে নিমন্ত্রিতরা অতি প্রত্যূষকাল থেকেই সমবেত হতে থাকেন। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ। অধিকাংশই হস্তিপৃষ্ঠে। উৎসবটা মাহুতদের—তাই হাতীর অভাব হয় না। প্রতিটি হাতীর গণ্ডকুম্ভে আর শুঁড়ে মাঙ্গলিক আলিম্পন। আহারের আয়োজন করে কনের বাপ আর

পার্নায়ের খরচ বরকর্তার। সোজা হিসাব। মেয়ের বাবা পাঁঠা দেয়—শুয়োর চলে না, অনেক মাহুত মুসলমান ; গরু চলে না, অনেকে হিন্দু। অধিকাংশই না-হিন্দু, না-মুসলমান ; তারা জাতে-ধর্মে মাহুত। ছেলের বাবা যোগান দেয় মাদক-দ্রব্য—তাড়ি, হাঁড়িয়া, মহুয়ার রস, পচাই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে খানা আর পিনা, নাচগানের আসর। বিবাহের মন্ত্রগুলো যে ঠিক কখন পড়া হয় তা কেউ খেয়াল করে না। বর অজু করে নামাজ পড়ল, বিয়ের পিঁড়িতে বসে কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিল—পাঁঠার ব্যাবানি শোনা গেল, সবাই নারকেল-মালায় মধুকরস পান করল—ব্যস ! বিয়ের আর বাকি রইল কি ?

সন্ধ্যা নাগাদ দেখা যায় অধিকাংশই গাছতলায় লম্বমান ! যে ক'জন তখনও ত্'পায়ে খাড়া হবার তাগৎ রাখে—মেয়ে-মদ্দ—তারা তখন হাতীর পিঠে উঠে রওনা দেয় 'চুইঘরের' দিকে।

বন-জঙ্গল ভেঙে এরা এসে পৌছয় 'চুইঘর'-এ। চুইঘর একটা উঁচু-মাচাঙ। মাটি থেকে হাতদশেক উঁচুতে। কাঠের মেঝেতে পুরু করে পাতা বিচালির বিছানা। তার উপর নানান জাতের সদ্যতোলা বনফুল। জায়গাটা হনিমুনের উপযুক্ত ! রাত্রিটাও অনিবার্য পূর্ণিমা। গদাধর নদের সঙ্গে নাচতে নাচতে এসে মিলিত হয়েছে আর একটা পাহাড়ে ঝরোকা—মাতিয়া নদী। নুড়ি-বিছানো বেলাভূমি, কুলুকুলু একটানা আবহসঙ্গীতে সানাই বাজে সারারাত—সঙ্গত করে রাতজাগা পাখি। নদ ও নদী, আকাশ ও পৃথিবী, চাদ আর অরণ্য সারারাত মিলনের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। সামনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ। তার ওপাশে বড় বড় মানুষ-প্রমাণ ঘাস—এলিফ্যাণ্ট গ্রাস। তার পিছনে ঊর্ধ্ববাহু ঋষির মত একসার মৌন পাদপ। নিচে পায়ে পায়ে জড়ানো হাজার রকমের আঁকিড়। ঝুমকো লতা আর ঝোপ-ঝাড়। এখানে এসে দলটা থামে। শেষবারের মত বরবধূকে ঘিরে নাচে—গান গায়। মাদল বাজে, শিঙে বাজে আর বাজে মাহুত মেয়েদের হাতে কাচের চুড়ি, হাতীর গলায় ঘণ্টা। ওরা বরবধূকে শেষ বিদায় জানায় একটি গান গেয়ে। এ গান তো গান নয়, এ যেন মন্ত্রপাঠ :

নেকান্দিবি আইতা মোর নেকান্দিবি মা—লো
দন্তাল মহাদেব আইলো বরণ করিবলৈ যা—লো।
দন্তত ত্রিশূল আরু ডম্বরুক হাকার—অ
সর্পপরা শুঁড় রইছে বিরাট আকার—অ।
সারিনকন্যা উমা কৈল আলোঘর কা—লো
নেকান্দিবি আইতা মোর, নেকান্দিবি মা—লো॥

বৈচিত্র্যবিহীন একঘেয়ে টেনে টেনে গান। এ গান কবে কোন্ গ্রাম্য কবিয়াল রচনা করেছিল তা কেউ জানে না। এর অর্থও হয়তো বোঝে না ওরা। তবে বেশ বোঝা যায়, সঙ্গীত-রচয়িতা পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ—বাঙলা-দেশের আগমনী গানের প্রভাব এ সঙ্গীতে অনস্বীকার্য। নববধূ এখানে একটি কুমারী-হস্তিনী, কিন্তু সে যেন আগমনী-গানের মেনকা-কন্যা উমার ছায়া দিয়ে গড়া। নববধূ গান গেয়ে তার মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে: 'নেকান্দিবি আইতা মোর, নেকান্দিবি মা-লো!' অর্থাৎ—মা-জননীগো কেঁদ না, কেঁদ না। বলছে, তোমার জামাই এসেছে মহাদেবের রূপ ধরে। তার গজদন্ত হচ্ছে ত্রিশূল, তার বৃংহতি হচ্ছে ডম্বরুনিনাদ, তার লীলায়িত শুণ্ড উদ্যতফণা সর্পের মত। বলছে, তোমার আদরের কন্যা আজ এই আলোকোজ্জ্বল পিতৃগৃহ আঁধার করে বিদায় নিচ্ছে, তবু ওগো মা, তুমি আজ চোখের জল ফেল না, তুমি কেঁদ না!

কেন? কাঁদবে না কেন? এমন করুণ সুরে টেনে টেনে গাওয়া গান শুনে হস্তী-জননী কেন কন্যার বিদায় বেলায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেবে না? তার জবাব আছে গানের শেষ চারটি চরণে:

নন্দীভিঙ্গি সাথে আইলো, নিন্দা কইল স—বে
সারিনকন্যা দিয়াছোন মরিবাকু হ—বে।
জগতক নকলেও কৈব তোমাক মা—লো
মেয়ানি হৈলহিঁ চুই—লাগিছো মোক ভা—লো॥

হস্তিনী কন্যা বলছে, বরযাত্রীরা এসেছে নন্দীভৃঙ্গির মত ভূতের বেশে; তাই সকলে নিন্দা করছে; বলছে: এবার তোমার এই কন্যার মৃত্যু অবধারিত! এ-কথার জবাব আমি দুনিয়াকে দিয়ে যেতে পারলাম না, সরমে আমার মুখে বাঁধছে;—তবে ওগো মা, তোমার কানে কানে বলে যাই—এইভাবে মরতেই আমি চাইছিলাম, কারণ এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তোমার 'মেয়ানি' কন্যা 'চুই' হবে,—'কুমারী' কন্যা 'সন্তানবতী' হবে।

এ যেন অনেকটা সেই—'আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর!'

গানের অর্থ বুঝতে পারল না লক্ষ্মী; কিন্তু ওদের দুর্বোধ্য ভাষার অশ্লীল রসিকতার কিছু কিছু মর্মভেদ করে বুঝল, আজ শুধু তার একারই বিবাহ নয়, পুণ্ডরীকের প্রিয় হস্তিনী সারিনেরও এটি বিবাহ রাত্রি! যে তিনটি হাতীতে চড়ে ওরা জঙ্গলে এসেছে তার একটিকে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। লক্ষ্মী আর পুণ্ডরীক থাকবে দুইঘরে; আর সামনের ঐ ফাঁকা মাঠে ফুলশয্যা হবে সারিন আর ঐ দাঁতাল হাতীটার! কী কাণ্ড!

এই ওদের রীতি ! মানুষের বিবাহ হলে ওরা পোষা হাতীরও বিবাহ দেয়।

বনের হাতীর কাণ্ড-কারখানা অবশ্য অন্যরকম। অরণ্যচারী হস্তী-হস্তিনীর প্রেমের আদানপ্রদান এক বিস্ময়কর বস্তু। দুনিয়া তার খবর রাখে না—জানে কিছু মাহুত, আর ঐ জীববিজ্ঞানীরা। হাতী হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীব—একদলে পঞ্চাশ-ষাটটি হাতী থাকে। তাদের ভিতর যে দু'জন মন দেওয়া-নেওয়া করে তারা সেটা অত্যন্ত গোপনে করে। ওদের সবকিছুই মানুষের তুলনায় বড়। গর্ভধারণ করে একুশ মাস, কোর্টশিপ চালায় দীর্ঘ দীর্ঘ দিন। দু'জনের মন জানাজানি হতে সময় লাগে—কখনও দু'তিনমাস। অথচ ওদের প্রকৃত মিলনকার্য মাত্র এক মিনিট থেকে উর্ধ্বতম চার মিনিট। দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলে ওদের গোপন অভিসার—বনের গভীরে। একান্তে, দলছাড়া হয়ে। তারপর একেবারে একান্তে ক্ষণিক মিলন ! পুরুষ হাতীর রগের পাশ দিয়ে এক ধরনের নির্যাস বার হয়—আমরা তখন বলি হাতী 'মস্ত্' হয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের ভাষায়—'মদকল করী'। জীববিজ্ঞানীরা কিন্তু ঐ নির্যাসের সঙ্গে পুরুষ-হাতীর যৌন-জীবনের ঠিক সম্পর্কটি খুঁজে পাননি। যদিও প্রচলিত ধারণা হাতী 'মস্ত্' হয় যৌন-সম্ভোগেচ্ছায়।

আসলে হস্তী নয়, হস্তিনীরই একটা 'পিরিয়ড' আসে। বছরে একবার—সচরাচর পৌষ মাস থেকে ফাল্গুন মাসের মধ্যে আসে এই জোয়ার। চঞ্চল হয়ে ওঠে হস্তিনী। তখন সে ছলা-কলায় পুরুষ-হাতীর মন ভোলাতে চায়। কোন-না-কোন পুরুষ-হাতী সেই আকর্ষণে ভুলে তাকে ভালবেসে ফেলে। চলে কোর্টশিপ। ওদের প্রাক্-মিলন সোহাগ-বিনিময় বিস্ময়কর ! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ওরা ভালবাসার আদান-প্রদান চালায়। শুঁড় দিয়ে পরস্পরের দেহে মৃদু মৃদু আঘাত করে। সুড়সুড়ি দেয়—ধাক্কাধাক্কি করে। নদীর জল শুঁড়ে করে তুলে হোলি খেলে। কাদার আবির মাখিয়ে দেয় দয়িতের বর-অঙ্গে ! পুরুষ-হাতী ফুলগাছের ডাল শুঁড়ে জড়িয়ে তার প্রেমাস্পদার গজকুম্ভে পুষ্পবৃষ্টি করছে, এমন দৃশ্যও দেখা গেছে। ওরা চুম্বনের কায়দাও জানে। এভাবেই চলতে থাকে ক্রমাগত। শেষে দু'জনেই উত্তেজিত হয়ে প্রজননের শেষ পর্যায়ে পৌঁছায়।

গর্ভধারণের তৃতীয় কি চতুর্থ মাসে হস্তিনী বুঝতে পারে যে, সে মা হতে চলেছে। অমনি তার ভূমিকা বদলে যায়। কর্তাটির প্রতি হঠাৎ সে উদাসীন হয়ে পড়ে। কর্তা ঘনিয়ে আসতে চাইলেই সরে যায়, যেন বলে,—আঃ ! কি অসভ্যতা করছ ! ভাল লাগে না !

কর্তা মনঃক্ষুণ্ণ হন ; দু'চার-দশদিন মানিনীর মান ভাঙাবার চেষ্টা করেন। বুঝে উঠতে পারেন না—কী এমন ঘটল ইতিমধ্যে! তারপর একদিন বিরক্ত হয়ে গজভাষায় 'দুত্তোর নিকুচি করেছে'-জাতীয় কোন স্বগতোক্তি করে তিনি অন্য কোন গজেন্দ্রগামিনীর প্রতি মনোনিবেশ করেন। গর্ভিণী দলের সঙ্গেই চলতে থাকে, যতদিন পারে। শেষে যখন সে ক্রমশঃ অশক্ত হয়ে পড়ে তখন দল ছেড়ে সরে আসে। অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে আসে নবজাতকের 'দাইমা'!

তাই বলে কি হাতীর প্রেমের হাটে ত্রিভুজ নেই? আছে। মারাত্মকভাবে আছে। 'হীডিয়াস্ হেক্সাগন' নয়, 'টেরিব্‌ল্ ট্রায়াঙ্গেল।' দুটি পুরুষ হাতী হয়তো একই গজেন্দ্রগামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। তখন তার একমাত্র চূড়ান্ত মীমাংসা মল্লযুদ্ধে। হস্তিবিজ্ঞানী স্যাণ্ডারসন এই জাতীয় মর্মান্তিক মল্লযুদ্ধের বর্ণনায় বলেছেন—

হস্তিনীর প্রতি অনুরক্ত এই প্রার্থীদ্বয়ের মল্লযুদ্ধ কিন্তু একান্তে হয় না, হয় দলের সকলের সামনে। কোন একটা প্রশস্ত স্থানে চক্রাকারে দলটি মল্লযোদ্ধাদের ঘিরে দাঁড়ায়—তবে ভদ্রতাবোধে তারা সরাসরি তাকায় না। ইতি-উতি তাকায় আর আনমনে গাছপাতা খায়—যেন এদিকে নজরই নেই। যাঁর জন্য এই দ্বৈরথ-সমর সেই গরবিনী একেবারে উদাসীন সেজে দলের মধ্যে মিশে থাকেন, দলের কেউ যেন বুঝতে না পারে কার জন্য এই কেলেঙ্কারী। মজা হচ্ছে এই যে, দলের সবাই তা জানে, অথচ ভাব দেখায়—যেন জানে না। দুই প্রতিযোগী ভীমবেগে পরস্পরের দিকে ছুটে এসে একে অপরের গজকুম্ভে ঢুঁ মারে। এদের মিলিত ওজন হয়তো বিশ টন, তাদের মিলিত গতিবেগ হয়তো ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। ঐ গতিবেগ নিয়ে যদি দুটি দশ টন ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধায় তবে দুটোই একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু এই দুই মল্লযোদ্ধা প্রতিহত হয়ে মাত্র কয়েক গজ হটে এসে ফের রুখে দাঁড়ায়। বার-কয়েক এই ধরনের সম্মুখ সংঘর্ষ হবার পরেই রণনীতি হয়তো পরিবর্তিত হয়ে যায়—শুরু হয় দাঁতের ব্যবহার। এবার ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে! দাঁতাল হাতী হয়তো গণেশ বা একদন্তে পরিণত হয়ে যায়। শুঁড়টাকেও ওরা চাবুকের মত ব্যবহার করে। কারও পদস্খলন হলে তার প্রতিযোগী দেহচাপে তাকে পিষে মারবার চেষ্টা করে। এ লড়াই কখনও কখনও তিন-চারদিন ধরে চলে শেষে একজন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ক্ষত-বিক্ষত দেহে তার পরাজয় স্বীকার করার দুটি ভঙ্গিমা। হয় সে সামনের পা মুড়ে 'নীল-ডাউন' হওয়ার ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণ করে—তৎক্ষণাৎ আপাত-উদাসীন হস্তিযূথ তাকে

রক্ষা করতে ছুটে আসে। আত্মসমর্পণ করার পর তাকে আঘাত করার আইন নেই—তার রক্ষাকর্তা তখন সমস্ত হস্তিযূথ। দ্বিতীয় ভঙ্গি—রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন। এ-ক্ষেত্রেও বিজয়ী বীর যাতে তার পশ্চাদ্ধাবন না করে সেটাও ওরা দেখে। এসব ব্যাপারে ওদের 'কোড-অফ-কণ্ডাক্ট' বড় কড়া!

যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই গরবিনী এতক্ষণে হেলতে-দুলতে এগিয়ে আসেন। বিজয়ী বীরকে বরমাল্য দিতে।

পোষা হাতীর ক্ষেত্রে এসব কিছুই হয় না। এখানে হস্তিরক্ষক বুঝে নেয় কখন কে 'মা' হবার উপযুক্ত হয়েছে। সাধারণতঃ পনের-ষোল বছর বয়সে ওরা মা হবার উপযুক্ত হয়। হস্তী-হস্তিনীর লক্ষণ দেখে তারা তাদের নিয়ে আসে গভীর অরণ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। মানুষের বিবাহ-রাত্রে এমন দুটি পোষা হাতীকে নির্বাচন করা হয়। আজ যেমন এসেছে সারিন আর তার বর।

লক্ষ্মী এল গণেশের সংসারে, কিন্তু দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। পুণ্ডরীক হাতিশালায় রাত্রে না শুলে সারিন সারারাত মাতামাতি করে। দোষ পুণ্ডরীকেরই। প্রাণীমাত্রেই অভ্যাসের দাস। হাতীও তার ব্যতিক্রম নয়। এতদিনের অভ্যাস সারিনই বা আজ কেন বদলাতে দেবে? সারারাত সে দুলতে থাকে আর গর্জন করতে থাকে। পর-পর তিন রাত্রি অনিদ্রা ভোগের পর ছোটামাঈ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ক্ষুধামান্দ্যই দেখা দিল, না কি অভিমানই হল তার—বুটোটি আর মুখে কাটে না। বাধ্য হয়ে গণেশ-সর্দার বলল, তুই হাতিশালেই শো গে যা। বউমার দেখ-ভাল আমি করব।

এ আবার কি বখেড়া! পুণ্ডরীক মাথা চুলকায়। লক্ষ্মী তাকে আড়ালে গাল-মন্দ করে: বোঝ এবার। আদর দিয়ে নিজেই ওকে মাথায় তুলেছ!

পুণ্ডরীক একবার বোঝায় লক্ষ্মীকে, একবার শুঁড়ে হাত বুলায় তার সারিনের। দু'জনেই অভিমানী। কেউ বাগ মানে না। শেষে 'দুত্তোর' বলে পুণ্ডরীক বউ-সমেত গিয়ে উঠল হাতিশালে। দু'দিক রক্ষা হল। পুণ্ডরীক রাতে ওখানে থাকলেই ছোটামাঈ খুশি—সে একা আছে কি দোকা আছে তাতে তার আপত্তি নেই। লক্ষ্মীও ভেবে দেখল—এই সুবিধা। দেড়খানা মাত্র ঘর। একটা শোবার, একটা রান্না করার। ওরা হাতিশালে শুতে এলে বুড়ো গণেশ-সর্দারকে আর ঐ রান্না করার ছোট খুপরিতে গরমে কষ্ট পেতে হবে না। ভাব হয়ে গেল ছোটামাঈয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর। বন্ধুত্ব হল। এখন ছোটামাঈ তার কত কাজ করে দেয়। জল-ভরা বালতি শুঁড়ে করে নিয়ে আসে, কাচা কাপড়ের ডাল বয়ে দেয়।

ক্রমে লক্ষ্মীর একটি সন্তান হল। কাজ বাড়ল ছোটামাঈয়ের। আজকাল বাচ্চাকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে লক্ষ্মী ঘরের কাজ সারে। ছোটামাঈ দাঁড়িয়ে থাকে উঠানে। জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে শুঁড় গলিয়ে বাচ্চার দোলনা ধরে আস্তে আস্তে টানে। দোল দিয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়।

গণেশের চোখে ছানি পড়েছে, তা পড়ুক—অন্ধ তো সে হয়ে যায়নি। সে দেখতে পায় ঘরের ছিরি-ছাঁদ দিন দিনই পালটে যাচ্ছে। ওর বৌমা উদয়াস্ত খাটে। সকাল বেলা হাতীর খাবার দিয়ে ফিরে এসে রান্না করতে বসে। এরই মধ্যে ময়লা জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, গণেশের লুঙ্গি ক্ষার দিয়ে কাচে; ঘর-দোর নিত্য সাফা করে; মাটির দেয়ালে গোবর নিকোয়। পুণ্ডরীককে দিয়ে কিনিয়ে এনেছে একখানা লক্ষ্মীর পট। সেখানাকে বসিয়েছে ওদের ঘরের এক দিক কুলুঙ্গিতে। জুম্মাবারের আগের দিন সে সুর করে কী-যেন ছড়া কাটে। শাঁখ বাজায়। অদ্ভুত স্বরে হোঁকার দেয়—তারপর শ্বশুরের সামনে মেলে ধরে একটা ছোট্ট রেকাবি—তাতে কুচি করে নিপুণহাতে কাটা শশা, কলা, বাতাসা—কখনও বা পেঁপে, ফুটির টুকরো, গরমের দিনে আম, জাম। হয়তো একটু আখের গুড় বা কদমা। ব্যাপারটা গণেশের একেবারে অজানা নয়। বৌরাণীর আমলে ঐ জুম্মাবারের আগের দিন তার মহালে হাজির হলে এমন শাঁখের শব্দ সে শুনেছে—পেয়েছে আল্লাতালার প্রসাদ। সেই আল্লাতালার মানাজাতের এমন আয়োজন মাহুতের ঘরেও হতে পারে এ ছিল গণেশ-সর্দারের স্বপ্নের অতীত। আহা, মেয়েটা বড় ভাল, ভারি লক্ষ্মী! বাপ-মা সার্থক নাম রেখেছিল তার। হে আল্লারসুল, তোমরা মেয়েটাকে সুখে রেখ।

তাছাড়া আরও কিছু নজরে পড়ে। অমন যে বারমুখো ছেলে পুণ্ডু, তাকেও সে ঘরমুখো করেছে। পুণ্ডরীক হাতিশালে যায়, তার হাতীকে খাওয়ায়, স্নান করায়, জঙ্গলে নিয়ে যায়—অথচ ঠিক সন্ধ্যার মধ্যেই ঘরে ফিরে আসে। কুদরৎ মিঞার ভাঁটিখানার দিকে আর বড একটা যায় না। আহা, মেয়েটা বেঁচে-বর্তে থাক!

শ্বশুরের সেবা-যত্নের দিকেও তার তীক্ষ্ণ নজর। ঠিকমত স্নান করানো, খাওয়ানো—তার ময়লা ফতুয়া অথবা লুঙ্গিটা সময়মত ক্ষার দিয়ে কেচে দেওয়া। সারাটা দিনই সে কিছু না-কিছু করছে। বিকেল বেলা শ্বশুরের সঙ্গে সে গল্প করতে বসে। তার বাল্যকালের গল্প, কৈশোরের গল্প, তারপর সে এসে পৌঁছয় তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে। অমনি থেমে যায় সে। গণেশ বুঝতে পারে—ও-কথাটা সে বলতে চায় না। তাই প্রসঙ্গটা চাপা দিতে সে নিজেই

শুরু করে গল্প। জঙ্গলের গল্প, শিকারের গল্প—সূর্যকান্ত আর লালচাঁদের গল্প। বলতে বলতে সেও হয়তো এসে পৌছয় কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে। লক্ষ্মণ-সর্দারের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রসঙ্গে অথবা সূর্যকান্তের শেষ-শিকারের উপাখ্যানে। অমনি থেমে যায় সে। লক্ষ্মীও বুঝতে পারে বৃদ্ধ গণেশ-সর্দার ও-প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে চায় না।

তারপর একদিন। শীতকাল শুরু হয়েছে। খেদা-মরশুম আসন্ন। গদাধর ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল শেষ বর্ষণের তাণ্ডবে—ক্রমশঃ তার জল সরছে। শীতালী পাখির দল ফিরে আসছে দলে দলে। ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ছে এ-বিলে—সে-বিলে। গ্রাম-প্রধানদের কাছে খবর গেছে—তারা যেন অবিলম্বে এসে যোগ দেয় খেদার আয়োজনে। আসছেও কেউ কেউ। গণেশ-সর্দারের এখন মরবারও সময় নেই। এমন একটি দিনে মাথায় আধো-ঘোমটা দিয়ে পুণ্ডরীকের বউ এসে দাঁড়াল শ্বশুরের কাছে। বললে, বাবা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

গণেশের বড় ভাল লাগে পুত্রবধূর এই সম্বোধন। এই ভাষা। মেয়েটি অসমীয়া জানে না। ভারি মিঠে ওর বোল। বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না গণেশের। আর ঐ 'আপনি' সম্বোধন! ওদের মধ্যে এর চল নেই। মনে হয় সে বুঝি 'ভদ্দরলোক' হয়ে গেছে। সস্নেহে বলে, কিয় মা-জননী?

—আপনি কর্তামশাইকে এখন থেকেই বলে দিন—তাঁর ফাঁসি-শিকারের জন্য অন্য কোন একজন সাকরেদের ব্যবস্থা করতে। সময় থাকতে ওঁকে বলে না রাখলে শেষ পর্যন্ত···

বাক্যটা সে শেষ করে না। তাতে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না গণেশের কিন্তু এ ব্যাপারে সে কী করতে পারে? কোন্ মুখে সে একথা বলবে লালচাঁদকে? এই যে ওদের নিয়তি। এ-ছাড়া তো পথ নেই। বিপদ কি একা পুণ্ডরীকের? লালচাঁদের নয়? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে গণেশের। এতদিনে একটু শান্তির মুখ দেখেছে। সেও তো খুশি হয় যদি লালচাঁদ এ-খেলা বন্ধ করে দেন। কিন্তু নিজে থেকে তিনি যদি তা না করেন তবে গণেশ সে-কথা কেমন করে বলবে?

সেই কথাই বুঝিয়ে বলেছিল গণেশ-সর্দার। মাপ চেয়েছিল পুত্রবধূর কাছে

দ্বিতীয় বার অনুরোধ করেনি লক্ষ্মী। নীরবে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু হার মানেনি সে সহজে। সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল জমিদার লালচাঁদজীর

দরবারে, তাঁর খাস কামরায়। লালচাঁদ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মেয়েটির দুঃসাহসিকতায়। মাহুত-পাড়ার কোন কুলবধূ ইতিপূর্বে কখনও এভাবে দরবার করতে আসেনি তাঁর কাছে। মেয়েটি সন্তান-ক্রোড়ে হাজির হয়েছিল তাঁর কাছে, আধো-ঘোমটা মাথায়। এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়েছিল তার দুঃখের কাহিনী। কোন সঙ্কোচ করেনি, লজ্জা করেনি, ইতস্ততঃ করেনি। বলেছিল, আপনি আমার বাবার মত—আপনি দেশের রাজা। আপনাকে আমার সব কথা শুনতে হবে। তারপর আপনি যা রায় দেবেন, আমি মাথা পেতে নেব।

লালচাঁদ তখন বসে ছিলেন তাঁর খাস কামরার সামনের বারান্দাটায়। একটা ইজি-চেয়ারে বসে তিনি বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর খাস চাকর কানাই—যে মেয়েটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, সে অদূরে অপেক্ষা করছিল নির্দেশের। লালচাঁদ চিনতে পারলেন মেয়েটিকে। বললেন, বস মা তুমি। ঐ মোড়াটায় বস। হ্যাঁ—বিচার যখন চাইতে এসেছ তখন পাবে বই কি। বল, কি বলতে চাও?

মেয়েটি তাঁর অনুরোধ আধাআধি রেখেছিল। মোড়ায় নয়, মার্বেলের সাদা-কালো চৌখুপি-কাটা মেঝেতে বসে পড়েছিল সে কর্তামশায়ের পায়ের কাছে। ঘুমন্ত শিশুকে কোলে নিয়ে।

—তুমি তো গণেশ-কাকুর পুত্রবধূ, তাই নয়? এটি তোমার সন্তান? ছেলে, না মেয়ে?

মাথার ঘোমটাখানি আরও টেনে দিয়ে লক্ষ্মী বলেছিল, মেয়ে।

—কি নাম দিয়েছ?

—কুহু।

—বাঃ, বেশ নাম! কে রেখেছে নামটা? তুমি, না পুণ্ডরীক?

মেয়েটি মাথা নিচু করে। জবাব দেয় না।

কানাই ধীরপদে চলে যাবার উপক্রম করছিল। লালচাঁদ বারণ করলেন, বললেন, যাস্‌নে কানাই। তুইও থাক।

বস্তুত এ মহলে সকলেই পুরুষ। লালচাঁদের বয়স তখন বছর চল্লিশ। এমন একান্তে মাহুত-মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তাঁর। মেয়েটির দিকে ফিরে বলেন, হ্যাঁ বল মা, কী বলতে এসেছ?

আধো-ঘোমটা মাথায় দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে অসঙ্কোচে মেয়েটি তার বক্তব্য রেখেছিল। সে বলেছিল, ভগবান তাকে একদিন সব কিছুই দিয়েছিলেন। ভদ্র বারুজীবী পরিবারে তার জন্ম। বাবা ছিলেন মাইনর স্কুলের

মাস্টারমশাই। সে নিজেও মাইনর স্কুলে একটা পাশ দিয়েছে—নিরক্ষরা নয়। অবস্থা তাদের মোটামুটি সচ্ছলই ছিল। পুকুর ছিল, বাগান ছিল, ধানের গোলা ছিল, গরু ছিল—অন্তত অনাহার কাকে বলে বাল্যে ও কৈশোরে তা সে জানত না। অথচ সব কিছুই একদিন হারিয়ে গেল তার। কেন? দু'দল মানুষের এক জেদাজেদিতে—রাজনীতির এক মারাত্মক খেলায়। হ্যাঁ, খেলায়—খেলা ছাড়া তাকে আর কি বলা যাবে? সব খুইয়ে সে চলে এসেছে সীমান্তের এ-পারে। বাপ-মা-ভাই-বোন দেশ-ঘর সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে। তারপর ভাগ্যক্রমে আশ্রয় পেয়েছিল আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান এক মাহুত-পরিবারে। ভদ্র বারুজীবী পরিবারের শিক্ষিতা মেয়ে সে, অথচ মানিয়ে নিয়েছিল নতুন পরিবেশে। তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল তার নতুন সংসার। স্বামী-শ্বশুর-সন্তান। তার সনির্বন্ধ অনুরোধ—হুজুর যেন তাকে আবার নিরাশ্রয় না করেন, আর এক নতুন খেলার নেশায়।

লালচাঁদ অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারেননি। তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন ঐ নতমুখী বধূটিকে—সন্তান-ক্রোড়ে জননীকে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল তাঁর। তারপর বলেছিলেন, খেলা নয়, মা—এ আমার ধর্ম! জানি না তোমাকে বোঝাতে পারব কিনা। তোমার কাছে স্বামীর ঘর করা, শ্বশুরের সেবা করা, সন্তানকে লালন-পালন করা যেমন একটা ধর্ম—আমার কাছেও ফাঁস দিয়ে হাতী ধরাটা তেমনি একটা বংশানুক্রমিক কুলাচার, আমার ধর্ম! আমার সাত পুরুষ এ কাজ করেছেন। আমার ঠাকুর্দা, জেঠামশাই, বাবা—ঐভাবে হাতী ধরতে যেতেন, মৃত্যুকে মুঠোয় নিয়ে। এজন্য দামও তাঁরা বড় কম দেননি। সেই ঐতিহ্য আমাকেও বজায় রাখতে হবে যতদিন না হাতীর হাতে আমার মৃত্যু হয়। তোমার অভিযোগটা সত্য হত, যদি আমি ঐ মরণ-খেলার আসর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতাম—রোম-সম্রাটেরা যেমন গ্ল্যাডিয়েটারদের খেলা দেখত নিরাপদ দূরত্বে বসে। লক্ষ্মণ-সর্দার—নাম শুনে থাকবে—প্রাণ দিয়েছিল এই খেলা খেলতে গিয়ে। আমার বাবাও দিয়েছিলেন। গণেশ-কাকা অক্ষত ফিরে এসেছে প্রতিবার, আমিও এসেছি। কিন্তু বিপদ তারও যতটা ছিল, আমারও ছিল ততটাই। শুধু আমার বংশের নয়, তোমাদের বংশেরও এই কুলাচার। আজ গণেশ-কাকার বদলে তার ছেলে আমার সঙ্গে জুটি বেঁধেছে। তাকে তো আমি ফেরাতে পারব না, মা। তুমি আজ যেমন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছ—ঠিক তেমনি করেই একদিন আমার মা আমার ঠাকুর্দার দরবারে ছুটে গিয়েছিলেন আমাকে কোলে

করে—আমার বাবাকে ফিরিয়ে নিতে। সে আজ ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমার ঠাকুর্দা তাতে রাজী হননি। সুতরাং তোমার আর্জির ফয়সালা তো আমি নতুন করে কিছু করতে পারব না মা।

নিঃশব্দে মেয়েকে কাঁধে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্মী। চলে যাবার উপক্রম করেছিল।

লালচাঁদ বলেছিলেন, বস। এ-বাড়িতে এলে শুধু-মুখে যেতে নেই। কিছু মিষ্টি মুখে দিতে হবে। কানাই—

কানাই এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু মেয়েটি তার আগেই দৃঢ়স্বরে বললে, থাক। মিষ্টিমুখ করতে আমি আসিনি। আপনাকে সৌজন্য দেখাতে হবে না।

চমকে উঠেছিলেন লালচাঁদ। সৌজন্য। ভদ্রতা। মেয়েটি বলে কী। রাজা-প্রজার সম্পর্কটা যে কী তা কি ঐ উদবাস্তু মেয়েটি জানে না? দৃঢ়স্বরে বলেন, অমন কথা বলতে নেই মা. এই হচ্ছে এ-বাড়ির রীতি, কুলাচার।

মেয়েটি যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। ঘুরে দাঁড়ায়। সেও দৃঢ়স্বরে বলে, আপনার বাড়ির রীতি আর কুলাচার আমি মেনে চলব এ-কথা মনে করছেন কেন? আমার কি গরজ সে-রীতি মেনে চলার?

দুরন্ত বিস্ময়ে লালচাঁদ শুধু বলেছিলেন, এতবড কথাটা তুমি বলতে পারলে লক্ষ্মী?

—কেন নয়? আমি আমার মেয়েকে আপনার পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম, ওর মুখের গ্রাস আপনি কেড়ে নেবেন না! সে-কথায় আপনি কান দিলেন না। উপরন্তু আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে চান? আপনি জমিদার, আমি প্রজা—তাই বলে আপনার যুক্তিটা তো বেশি জোরদার হবে না। যেটাকে আপনার বংশের কুলাচার বলছেন—আপনি নিজেও জানেন সেটা একটা খেলাই—তার নেশাতেই আপনারা বংশানুক্রমিকভাবে পাগল।

এবার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন লালচাঁদ। দুরন্ত বিস্ময়ে কয়েক মিনিট তিনি নির্বাক তাকিয়েছিলেন লক্ষ্মীর দিকে! সে দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েনি উদ্‌বাস্তু মেয়েটি। আধো-ঘোমটা মাথায় সে অপেক্ষা করেছিল তাঁর জবাবের। শেষ পর্যন্ত লালচাঁদ বলেছিলেন, এতবড অপমান এর আগে আমাকে কেউ করেনি লক্ষ্মী। কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক। তোমাকে আমি কিছু বলব না। শুধু একটা কথা জেনে যাও। এটা আমার খেলা নয়—এ আমার দেবতার পূজা! তোমার বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পুজো করার সঙ্গে আমার এই বৎসরান্তিক ফাঁসি-শিকারের কোন প্রভেদ নেই। বিশ্বাস না হয় তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা

কর—'সোম্বুত্তর' কার নাম। জেনে নিও, কেন তাকে আর আমাকে আজও যেতে হয় ঐ জঙ্গলে!

নির্বাক ফিরে এসেছিলে লক্ষ্মী, জমিদার-বাড়িতে প্রসাদ স্পর্শ না করে।

জিজ্ঞাসা করেছিল শ্বশুরকে। হ্যাঁ, গণেশ-সর্দার জানে—সোম্বুত্তরের উপাখ্যান। সে সেটা শুনেছিল তার দেউতার কাছে, সূর্যকান্তের কাছে। সবিস্তারে সে-কাহিনী সে শুনিয়েছিল পুত্রবধূকে:

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। সে কত-কুড়ি বছর আগেকার কথা তার হিসেব দিতে পারবে না গণেশ-সর্দার, তবে সে-আমলে গাছ-পাহাড়-পশু-পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত। এই বড়গোঁহাই পরিবারের আদি-পুরুষ এসেছিলেন পশ্চিমদেশ থেকে—কাশী থেকে। তাঁর নাম ছিল সোম্বুত্তর। তিনি ছিলেন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তর মৃগয়াধিপতি। রাজমহিষী একরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন হিমালয়ের পাদদেশে আছেন এক ছয়-দাঁতওয়ালা গজরাজ। রাজমহিষীর সখ হল ঐ গজদন্তে-তৈরী পালঙ্কে শয়ন করবেন তিনি। মহারাজ মৃগয়াধিপতি সোম্বুত্তরকে আদেশ করলেন ঐ হস্তীর সন্ধান করতে। সোম্বুত্তর ছিলেন দক্ষ হস্তী-শিকারী। দলবল নিয়ে তিনি চলে গেলেন হিমালয়ে। দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন—কিন্তু ছয়-দাঁতওয়ালা হাতীর সাক্ষাৎ পেলেন না। শেষে কে যেন বলল, গজরাজ চলে গেছেন প্রাগজ্যোতিষপুরে। সোম্বুত্তর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। সন্ধান পেলেন গজরাজের। ষাট হাজার সঙ্গী নিয়ে তিনি ঐ অরণ্য মধ্যে বিচরণ করেন। দূর থেকে গোপনে গজরাজকে দেখে সোম্বুত্তর বুঝলেন একে কৌশলে ধরা ছাড়া উপায় নেই। গজরাজের গমনপথে এক ফাঁদ পাতলেন তিনি। গভীর এক কূপ খনন করে লতাপাতায় ঢেকে দিলেন। রোজ মধ্যরাত্রে সোম্বুত্তর গিয়ে সেই ফাঁদটি পরীক্ষা করেন, আর নিরাশ হন। গজরাজ সেই কূপে পড়েন নি। শেষে এক ঘোর অমাবস্যা রাত্রে সোম্বুত্তর ঐ ফাঁদটি দেখতে এসেছেন। অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে তিনি নিজেই পড়ে গেলেন ঐ কূপের ভিতর! গভীর গর্তে পড়ে তাঁর মৃত্যু অবধারিত ছিল—কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। কারণ, তার পূর্বেই ঐ ফাঁদে পড়েছেন স্বয়ং গজরাজ। তাঁর পিঠের উপরেই পড়লেন সোম্বুত্তর। পতনজনিত আঘাতে মৃত্যু হল না বটে, কিন্তু বুঝলেন—গজরাজের পদতলে পিষ্ট হয়ে এবার মৃত্যু নিশ্চিত!

কিন্তু তা হল না। গজরাজ বললেন, সোম্বুত্তর! তুমি আমার মৃত্যুর কারণ! কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করলাম আমি। এ কূপ থেকে উঠবার ক্ষমতা

আমার নেই—তবু তোমাকে আমি শুঁড়ে করে উপরে তুলে দিচ্ছি। তুমি যাও, লোকজন ডেকে নিয়ে এস—আমার এই ছয়টি গজদন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে যাও! এগুলি কাশী-রাজমহিষীকে উপহার দিও।

সোমুত্তর বুঝতে পারেন—গজরাজ দেবতার অংশজাত; তিনি মহাপ্রাণী। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলেন, প্রভু, আমি মৃগয়াধিপতি। বন্যজন্তু শিকার করাই আমার ধর্ম, আমার কুলাচার। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

গজরাজ বললেন, আমি জানি। তোমার প্রতি আমার কোন অসূয়া নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

—অনুরোধ নয়, প্রভু! আদেশ! বলুন—

—এভাবে ফাঁদ পেতে তুমি হস্তী-শিকার কর না। মারবার অধিকার যেমন তোমার আছে, বাঁচবার অধিকারও তেমনি আছে আমাদের। মানুষের আছে বুদ্ধি, হাতীর আছে বীর্য! তোমার হাতে 'পাশ', আমার হাতে 'বজ্র'। এই হবে এর পর থেকে খেলার মন্ত্র।

—তাই হবে প্রভু!

গজরাজ সোমুত্তরকে শুঁড়ে করে তুলে দিলেন উপরের সমতল-ভূমিতে। গজরাজকে প্রণাম করে সোমুত্তর যখন ফিরে যেতে উদ্যত হলেন তখন গজরাজ বললেন, ঐ পিপুল গাছের তলায় আছেন আমার গৃহদেবতা 'মিত্রদেব'। আমার মৃত্যুর পর ওঁর পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ মূর্তিটি তুমি নিয়ে যাও। মিত্রদেবকে তোমার গৃহদেবতা কর। তোমার বংশ তাহলে একদিন রাজত্বলাভ করবে। বছরে তিনশ' চৌষট্টি দিন মিত্রভাবে মিত্রদেবের পূজা করবে, আর একদিন তুমি আমার কাছে আসবে। শত্রুভাবে আমার ভজনা করবে। মৃগয়া কর, কুলাচার কর—সে তোমার ধর্ম, কিন্তু বছরে একদিন নিরস্ত্র এসে আমার সমতলে দাঁড়াবে—সেখানে তোমার হাতে 'পাশ', আমার হাতে 'বজ্র'। সেখানে—সেই দ্বৈরথ-সমরের আসরে মৃত্যুর দাবী তোমার-আমার উপর সমান-সমান! এভাবেই হবে তোমার সারা বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সেই সোমুত্তরই হচ্ছেন বড়গোঁহাই পরিবারের আদি-পুরুষ। রাজাই হয়েছেন তাঁরা। কুলদেবতার পূজায় বিরাট বড়লোক হয়েছেন ক্রমে; কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে ওঁরা বছরে একবার আসেন আদি গজরাজের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মর্যাদা দিতে। সারা বছরের মৃগয়ার প্রায়শ্চিত্ত হয় সেখানে। মৃত্যুর দাবী সেখানে সমান সমান।

উদ্বাস্তু মেয়ে লক্ষ্মীর অনুরোধে তাই কেউ কর্ণপাত করেনি। ওঁরা দুজন

যখারাতি সেবারও বার হয়েছিলেন ঐ মরণ-খেলায় অংশ নিতে। উপায় নেই। এই বোধহয় ওঁদের নিয়তি। এই দুঃখের জ্বালাতেই বোধহয় ওদের জাতের কোন গ্রাম্য মহিলা-কবি গেয়েছিল সেই লোকগাথা, যা ওরা যুগ যুগ ধরে গেয়ে এসেছে সুর টেনে টেনে:

আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে।
তুমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে॥
হস্তীরে নড়াং হস্তীরে চড়াং কাকোয়া-বাঁশের আড়া
ওরে কী সাপে দংশিলেক বন্ধুয়াক, বন্ধুয়া হইল মোর খোড়া-রে।
রোজায় ঝাড়ে, গুণীকেরে ঝাড়ে, ঢেকিয়াক আগাল দিয়া
ওরে সুঁই নারীটা ঝাড়ং বন্ধুয়াক, মোর ক্যাশের আগাল দিয়া
আরে গেইলে কি আসিবেন
হস্তীরে নড়াং হস্তীরে চড়াং হস্তীর গলায় দড়ি
ওরে সইত্য কইরা কহরে মাহুত কোন্‌বা স্থানে বাড়ি?—রে
আরে গেইলে কি আসিবেন…
হস্তীরে নড়াং হস্তীরে চড়াং হস্তীর পায়ে বেড়ী
ওরে সইত্য কইরা কইলং কথা, গৌরীপুরে বাড়ি॥—রে
আরে গেইলে কি আসিবেন…
খাটো-খুটো মাহুতরে মেরে, গালে চাপো দাড়ি
ওরে সইত্য কইরা কন্‌রে মাহুত, ঘরে কয়জন নারী?—রে
আরে গেইলে কি আসিবেন…
হস্তীরে নড়াং হস্তীরে চড়াং, চম্পা নদীর পারে
ওরে সইত্য কইরা কইলং কথা, বিয়াও নাই হয় মোরে॥—রে
আরে গেইলে কি আসিবেন…

যুগ যুগ ধরে মাহুত-পত্নী এ গান গেয়েছে, আর যুগ যুগ ধরে সে সঙ্গীতে কর্ণপাত না করে মাহুত, ফান্দি, দাইদার, খিদ্‌মদগারের দল ছুটে গেছে হাতীর সন্ধানে—গভীর অরণ্যে। লক্ষ্মীর চোখের জল তাই পুণ্ডরীকের গমন-পথ শুধু পিচ্ছিলই করে দিল—রুখতে পারল না তাকে। ল্যাঙট এঁটে, সর্বাঙ্গে পাঁকমাটি আর হাতীর নাদ মেখে পুণ্ডরীক হাসতে হাসতে চলে গেল ফাঁসি-শিকারে—আর জলভরা দু'চোখ মেলে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে রইল বাইরের দাওয়ায়, বাঁশের খুঁটি আঁকড়ে, মেয়ে কোলে!

লালচাঁদ জানতেন, এই ফাঁসি-শিকারকে যদি নিরবচ্ছিন্নধারার উত্তর-

পুরুষের হাতে তুলে দিতে হয় তবে অন্তত একটি ফাঁসিয়াড় তাঁকে তৈরী করে যেতে হবে। চিরদিন যদি তিনি পুণ্ডরীককে সাকরেদ করে রাখেন, তবে তাঁর মৃত্যুর পরে এ ধারা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। তিনি পুণ্ডরীককে ফাঁস-ছোঁড়া অভ্যাস করাতেন। সে আদেশ পুণ্ডরীকও মেনে নিত। দীর্ঘদিন ক্রমাগত ফাঁস ছুঁড়ে ছুঁড়ে তার লক্ষ্যটাও হয়ে উঠেছিল অব্যর্থ। কিন্তু শিকারে গিয়ে কী যে দুর্মতি হত তার—দুর্বোধ্য অসমীয়া ভাষায় বলত, কর্তা ফাঁসটা আপনিই এবার ছোঁড়েন। আমাকে দয়া করে সাকরেদই থাকতে দিন।

এবার আর কিছুতেই রাজী হলেন না লালচাঁদ। পুণ্ডরীকের আপত্তি সত্ত্বেও তাকেই দিলেন ফাঁসের দড়ি—নিজে অবতীর্ণ হলেন সাকরেদের ভূমিকায়। বাধ্য হয়ে পুণ্ডরীককে মেনে নিতে হল এ ব্যবস্থা। বললে, প্রথম-শিকারে হাতীর দলের ভিতর যেতে সে সাহস পাচ্ছে না। সে বরং 'গুণ্ডা-হাতী' ধরবে।

গুণ্ডা-হাতীর পরিচয়টা তার আগে দিতে হয়।

আগেই বলেছি, হাতীরা জঙ্গলে সবদা দল বেঁধে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি? গুণ্ডা-হাতী এমনই এক ব্যতিক্রম। কোন কারণে সে দলছুট হয়ে একা একা বাস করতে থাকে। তার অনেকগুলি কারণ হতে পারে। প্রধানতঃ এই কারণটা বার্ধক্য-জনিত। অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে আহত হস্তী। যথেষ্ট বয়স হয়ে যাবার পর, অথবা আহত অবস্থায় হাতী তার দলের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। ওদের খাদ্যের পরিমাণটা এত বেশি যে, গোটা দলটাকে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়। বৃদ্ধ অথবা আহত হাতী পিছিয়ে পড়ে। প্রজনন-ক্ষমতা হারানোর পর বৃদ্ধ হাতী সঙ্গিনীদের প্রতি কিছুটা উদাসীনও হয়ে পড়ে। দল থেকে সে সরে আসে—এ যেন অনেকটা বাণপ্রস্থ গ্রহণ। কখনও কখনও এরা অত্যাচারী অথবা দুর্দান্ত হয় বটে, কিন্তু সব দলছুট গুণ্ডা-হাতীই তা নয়। নির্বিরোধে অরণ্য-অঞ্চলে এরা একা একা ঘুরে বেড়ায়, শেষদিন পর্যন্ত। ফাঁসি-শিকারে গুণ্ডা-হাতী ধরার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, দলের অন্যান্য হাতীর অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া বার্ধক্য অথবা আঘাত-জনিত কারণে ফাঁসে আটকাতে পারলে গুণ্ডা-হাতী বেশিদূর দৌড়াতেও পারে না।

সূর্যকান্তের মত লালচাঁদজীরও ঘ্রাণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনিও মাঝে মাঝে হাতী থামিয়ে বাতাসে বন্য-হাতীর গন্ধ শুঁকতেন এবং জঙ্গলের গভীরে ঠিক কোথায় বুনো-হাতী আছে তা টের পেতেন। সেবারও গন্ধ লক্ষ্য

করতে করতে ওঁরা দুজন এসে উপস্থিত হলেন একটা ঘন পত্রাবৃত্ত শালের জঙ্গলে। উপরে বড় বড় শালগাছ, নিচে নানান জাতের লতা-গুল্ম, অর্কিড আর কাঁটাওয়ালা বেতের জঙ্গল। তারই মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়। সরু সরু বাঁশ।

জঙ্গলটা পার হয়েই একটা ফাঁকা মাঠ। তার ওপারে বড় বড় ঘাস—ঐ এলিফ্যাণ্ট-গ্র্যাস যাকে বলে। প্রায় তিনশ' গজ দূর থেকেই লালচাঁদ অনুভব করলেন সামনের ঐ ঝোপে হাতী আছে। তিনি চলেছেন তাঁর গিন্নির পিঠে। ঠিক পিছনেই পুণ্ডরীক চলেছে ছোটামাঈয়ের পিঠে। তার হাতেই আছে ফাঁসটা—যে ফাঁসের একটা প্রান্ত শক্ত করে আটকানো আছে ছোটামাঈয়ের বুকের কাছিতে। ঝোপটা খুব বড় নয়, একাধিক হাতী ঐ ঝোপে থাকতে পারে না। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই একটি মাত্র হাতীর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে করতে আসছেন তিনি। একটি মাত্র হাতীর পায়ের ছাপ চলে গেছে ঐ ঝোপের দিকে। লালচাঁদ তাঁর হাতীকে দাঁড় করান। নিঃসাড়ে ইঙ্গিত করেন পুণ্ডরীককে। পুণ্ডরীক নিঃশব্দে এগিয়ে যায় ফাঁস-হাতে তার হাতীর পিঠে বসে। ঝোপের ভিতর থেকে ঠিক তখনই একটি শিশু হস্তীর বৃংহণ শোনা গেল। চমকে উঠলেন লালচাঁদ। সর্বনাশ! মুহূর্তে উনি বুঝতে পারেন—কী ভুলটা করে বসেছেন তাঁরা। ঝোপের ভিতর একটি মাত্র দলছুট গুণ্ডা-হাতী নেই—আছে দেড়জন এবং অনতিদূরেই আছে আর একজন—দাইমা! কিন্তু ততক্ষণে পুণ্ডরীক এতটা এগিয়ে গেছে যে, তাকে আর সাবধান করার সুযোগ পেলেন না। পুণ্ডরীক তাঁর দিকে আর একবারও তাকাচ্ছে না—তার স্থির লক্ষ্য ঐ ঝোপের দিকে। চকিতে ওঁর মনে হল—হয়তো পুণ্ডরীকও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। পিছু হটে আসবে সে এবার। হাজার হ'ক ও তো মাহুতের ছেলে! হাতীর জগতেই বেড়ে উঠেছে সে দেহে-মনে—এমন সহজ কথাটা সে কী আর জানে না? কিন্তু না—পুণ্ডরীকের পিছু হঠার কোন লক্ষণই নেই। তিল তিল করে এগিয়ে যাচ্ছে সে ঝোপটার দিকে। লালচাঁদের হাত-পা নিশ্‌পিশ্‌ করছে তখন! মূর্খ! মূর্খ! পুণ্ডরীক মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে! অথচ কিছুই করণীয় নেই! আশ্চর্য! এমন সোজা কথাটা খেয়াল হল না তার, এতদিন হস্তী-সমাজে বাস করে? উপায় নেই! লালচাঁদকেও তার পিছন পিছন এগিয়ে যেতে হল। কিন্তু প্রচণ্ড একটি অতর্কিত বিপদ সম্বন্ধে ততক্ষণে তিনি পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছেন। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে খুঁজছেন তিনি—দাইমাকে।

মানুষের সঙ্গে হাতীর এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল আছে। বোধকরি সমগ্র পশুজগতে একমাত্র হাতীই এ বিষয়ে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি। ওরা দাম্পত্যজীবন যাপন করে স্বজাতীয়ের দৃষ্টির অন্তরালে। মানুষের মত হাতীও সমাজবদ্ধ জীব—দল বেঁধে থাকে তারা ; কিন্তু সে তো আরও হাজারটা প্রাণী তাই থাকে ! তফাৎ ঐ। দাম্পত্যজীবনের অন্তরাল ! প্রেমিক-প্রেমিকা দলের সঙ্গেই থাকে সারাদিন। তারপর সন্ধ্যা-সমাগমে তারা দু'জন দল ছেড়ে চলে যায় কোন নির্জন গভীর অরণ্যে। শেষে হস্তিনী গর্ভিণী হয়ে পড়ে। দীর্ঘ একুশ মাস হস্তিনীকে গর্ভধারণ করতে হয়। দলের সঙ্গেই সে থাকে এই সময়, যতদিন পারে। কিন্তু প্রসবকাল সমাসন্ন হলে সে আর দলের সঙ্গে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে চলতে পারে না। বাধ্য হয়ে সে দলছুট্ হয়ে যায়। আর আশ্চর্য ওদের সমাজ-বন্ধন। গোটা দলটা তাকে ছেড়ে বেশিদূর যায় না। কাছেই থাকে। উপরন্তু পিছনে রেখে যায় আর একজন বয়িয়সী হস্তিনীকে। সেও দলছুট্ হয়ে সঙ্গ নেয় ঐ ভাবী-জননীর। তারা আশ্রয় নেয় কোন গভীর এবং নির্জন অরণ্যের একান্তে। এই বয়িয়সী হস্তিনীকে কোথাও বলা হয় 'মাসীমা' কোথাও 'দাইমা'। গর্ভিণীর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, এবং তারপর দিনকতক যখন সেই সদ্য-জননী আর তার শিশু আত্মরক্ষার্থে একেবারে অসহায় থাকে তখন এই দাইমাই তাদের রক্ষাকর্ত্রী। সে-ই নিত্য গাছের ডালপালা ভেঙে এনে খাওয়ায় ঐ মাকে আর সন্তানকে। হাতী ছাড়া আর কোন চতুষ্পদ জীবের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে বলে শুনিনি।

তাই ঐ ঝোপের ভিতর থেকে শিশুহস্তীর বৃংহণ শুনে চম্‌কে উঠেছিলেন লালচাঁদ। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তিনি খুঁজছিলেন ঐ দাইমাকে। পুণ্ডরীক হয় এ তথ্য জানে না, অথবা সে খেয়াল করেনি। ছোটামাঈকে সে ক্রমাগত ঝোপের দিকে তাড়িত করতে থাকে। ঠিক তখনই সেই ঝোপের ভিতর থেকে বার হয়ে এল একটি হস্তিনী। তার পশ্চাদ্‌ভাগের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র লালচাঁদ বুঝতে পারেন যে, সে মাত্র সপ্তাহখানেক আগে মা হয়েছে।

পুণ্ডরীক না বুঝলেও ছোটামাঈ বুঝতে পেরেছে। চালকের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে সে পিছু হটতে শুরু করে। কিন্তু পুণ্ডরীককে বোধহয় মৃত্যুই অনিবার্যভাবে টানছিল। সে আবার তার হস্তিনীকে এগিয়ে যাবার জন্যই নির্দেশ দিল।

লালচাঁদ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। পুণ্ডরীক 'দোহার' দেবার আগেই সদ্যজননী শুঁড় শূন্যে তুলে প্রচণ্ড বৃংহণে অরণ্যভূমি সচকিত করে তুলল। ওকে আপনা থেকেই শুঁড় তুলতে দেখে পুণ্ডরীক চট্ করে উঠে বসে।

হাতের ফাঁসটা সে ছুঁড়ে দেবার জন্য বাগিয়ে ধরে। কিন্তু তার আগেই বাঁ-দিকের আর একটি জঙ্গল থেকে ভীমবেগে ছুটে আসে আর একটি হস্তিনী। সদ্য-জাতকের দাইমা। পুণ্ডরীকের বাহনের পেটে তার গণ্ডকুম্ভ দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। ছোটামাঈ এ-জন্য প্রস্তুত ছিল, ছিল না পুণ্ডরীক। বাঁ-দিক থেকে আর একটা হাতী যে তাকে অমন অতর্কিতে আক্রমণ করে বসতে পারে, এ ছিল তার ধারণার অতীত। সতর্ক ছিল বলেই ছোটামাঈ অতবড় আঘাতটা খেয়েও ধরাশায়ী হল না, হল পুণ্ডরীক! হাতীর পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ছোটামাঈ তার আহত দেহটা নিয়ে সরে এল। পায়ে পায়ে দূরে সরে যায়। লালচাঁদ কী করবেন ভেবে পেলেন না। সঙ্গে রাইফেল থাকলে না হয় পুণ্ডরীককে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন আর কী করতে পারেন তিনি? তাঁর চোখের সামনেই দুটি মত্তমাতঙ্গ পুণ্ডরীকের দেহটা পাঁচ-সাত-সেকেণ্ডের ভিতরেই একটা কাদার তালে পরিণত করে দিল। রক্ত-মাংস-মজ্জার একটা দলিত পিণ্ড!

গিন্নি এক পা এক পা করে পিছু হটছে। পুণ্ডরীকের দেহটা নিষ্পেষিত করে বুনো হাতী দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে চায়। তাদের পিছনে একটি সদ্যজাত হস্তিশিশু। গিন্নি সম্মুখপানে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে পিছু হটে আসে, সরে আসে নিরাপদ দূরত্বে। প্রায় একশ' গজ এভাবে পিছু হটে এসে সে পিছন ফেরে। লালচাঁদ দেখলেন—চালকহীন পুণ্ডরীকের বাহন, তার অতিপ্রিয় ছোটগিন্নি অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়, পাথরের মূর্তি যেন। যেন সে বলতে চাইছে—পালিয়ে যাই নি আমি কিন্তু কী করব? আমি কী করতে পারতাম? আমি এখন কী করব?

মাথা নিচু করে ফিরে এলেন লালচাঁদ। উপায় কি?

মরণ-খেলায় মৃত্যুরও তো একটা ভূমিকা থাকবে। পাশার দান তো একবার তার ঘরেও পড়বে! বারে বারে তার হাত-ফসকে শিকারী যদি পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তবে আদি গজরাজ এই দ্বৈরথ সমরকে মরণ-খেলা বলবেন কেন? এ দান ষড়দন্ত-গজরাজই জিতেছেন—মানুষ নয়! পুণ্ডরীককে জীবন দিয়ে মিটিয়ে দিতে হল মৃত্যুর দাবী।

সে আজ প্রায় বিশবছর আগেকার কথা। মোহনপুরের শেষ ফাঁসি-শিকার। কুহু তখন ছ'মাসের শিশুমাত্র। ঐ সদ্যোজাত হস্তিশিশুর মত সে কিছুই জানতে পারল না—ব্যাপারটা কি হল!

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে পণ্ডিতজী বললেন, হস্তিতত্ত্ব বিষয়ে আপনি যদি অনুসন্ধিৎসু হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বটাকে যাচাই করে দেখতে হবে। ভারতীয় দর্শনে অন্ধের 'হস্তি-দর্শন' বলে একটা কথা আছে, শুনে থাকবেন। হস্তী সম্বন্ধে আমরা সত্যই অন্ধ—তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতেই গোটা জিনিসটা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারব।

ক্যুভিয়ে প্রশ্ন করে, তিনটি দৃষ্টিকোণ বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

—প্রথমতঃ. প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের নির্দেশ। দ্বিতীয়তঃ, হস্তী বিষয়ে যারা বংশানুক্রমিকভাবে লিপ্ত তাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, তাদের লোকগাথা, ধ্যান-ধারণা এবং তৃতীয়তঃ, ট্যাক্সোনমিস্টদের বিচারপদ্ধতি—

কথা হচ্ছিল পণ্ডিতজীর ঘরে। কৃষ্ণ বলে ওঠে, ট্যাক্সোনমিস্ট কাকে বলে জেঠু?

—প্রাণীতত্ত্ব-বিজ্ঞানে ওর যোগারূঢ় অর্থ হচ্ছে—যে বিশেষজ্ঞ-দল প্রাণী-জগতে শ্রেণীবিন্যাস করেন।

ক্যুভিয়ে বলে, বেশ, একে একে বলুন—

পণ্ডিতজী বলেন, প্রথমে বলব প্রাচীন ভারতীয় হস্তিশাস্ত্রের কথা। ভোজ-রাজকৃত 'গড়ুর'-গ্রন্থে ২০৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে হাতী হচ্ছে আট প্রকারের:

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জন
পুষ্পদন্ত সার্বোভৌমাঃ সুপ্রতিকশ্চাদিগ গজাঃ।
এষাং বংশ প্রসূততত্ত্বাৎ গজনামষ্টজাতয়ঃ॥

এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন—ঐরাবৎজাতীয় দুর্লভ হস্তী। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী, ধন্বন্তরী, অমৃত, সুরভী, উচ্চৈঃশ্রবা ইত্যাদির সঙ্গে সমুদ্রগর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন আদি গজ ঐরাবৎ। তাঁরই বংশধর এঁরা। ঐরাবৎ হচ্ছেন হস্তিকুলে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সাত্বিক জীব। এঁদের গায়ে লোম থাকে অল্প, এঁরা অত্যন্ত বলশালী, সহজে ক্রোধান্বিত হন না, অল্পাহারী এবং অল্প জলপান করেন। এঁদের দন্তদ্বয় সমমাপের, দীর্ঘ, শ্বেতবর্ণের। সাত্বিক-প্রকৃতির মানুষ ভিন্ন এঁরা কখনও সামান্য মানুষের বশ্যতা স্বীকার করেন না। সাধারণের বিশ্বাস—এক লক্ষ হাতীর ভিতর একটি পাওয়া যাবে ঐরাবৎ-বংশীয়, এবং ঐ রকম ঐরাবতের ভিতর ক্বচিৎ একটির মাথায় পাওয়া যাবে গজমুক্তা। জীবিতকালে ঐ গজমুক্তার অস্তিত্ব বোঝা খুব কঠিন—কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই হাতীর কুম্ভে গাঢ় নীলবর্ণের গজচক্র ফুটে উঠবে।

ক্যাভিয়ের মনে পড়ে গেল আচার্য-চৌধুরীর পিতৃদেবের কথা। সে কিন্তু কোন কথা বলল না। পণ্ডিতজী বলে চলেন :

হস্তিকুলে ক্ষত্রিয়-বর্ণের জীব হচ্ছেন পুণ্ডরীক। তাদের দেহ কোমল, অথচ তারা বলবান। এরা গীতবাদ্যপ্রিয়, তীক্ষ্ণদন্তাগ্রভাগ, শ্রমশীল—তাদের শরীরে পদ্মগন্ধ। যুদ্ধে এরা পারদর্শী এবং এরা সচরাচর কোন রাজার বশ্যতা স্বীকার করে।

তৃতীয়তঃ—বামন। হস্তিকুলে তারা কিন্তু বৈশ্য নয়, অন্ত্যজ। এদের দেহ খর্বাকৃতি এবং কঠিন সর্বদা রাগী, বহ্বাহারী, কিন্তু বীর্যবান।

কুমুদ-জাতীয় হস্তীও কলহপ্রিয়—তারা পোষ মানতে চায় না। তাদের দেহ সর্বদা মলমূত্রময়। এরা পালকের মনঃকষ্টের কারণ হয়। অপরপক্ষে অঞ্জন-জাতীয় হস্তীর দেহ সুউচ্চ। তাবা শ্রমশীল, তাদের দন্ত মসৃণ ও সুকঠিন। গজায়ুর্বেদ সংহিতায় এবং পলিকাপ্যে এরপর পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম এবং সুপ্রতিক-জাতীয় হস্তীর চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

হাতি-ব্যবসায়ে লিপ্ত আধুনিক যুগের মানুষ কিন্তু ঐ অষ্টপ্রকার শ্রেণীবিভাগ মেনে চলে না। তাবা ব্যবহারিক দিক থেকে নতুনভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছে :
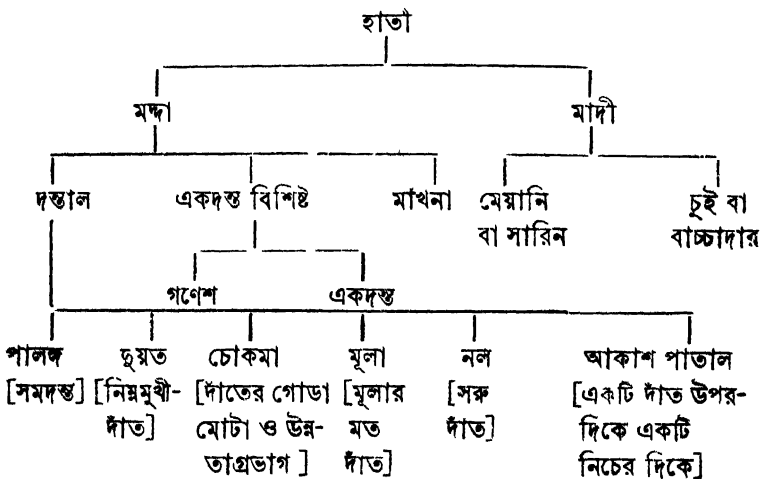
তালিকাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এটি ব্যবসায়িক দিক থেকে তৈরী করা। মাদি-হাতীকে মাত্র দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—যাদের সন্তান হয় নি

তারা সারিন, আর যারা মা হয়েছে তারা চুই। অপরপক্ষে মদ্দা-হাতীর শ্রেণী-বিভাগ দন্তনির্ভর। যাদের দাঁত নেই তারা হল 'মাখনা'। তারা ক্লীব নয় কিন্তু—পুরুষ। এরা সাধারণত অত্যন্ত সাহসী আর দুর্দান্ত হয়। যাদের একটি মাত্র দাঁত রয়েছে তাদের আবার দুটি ভাগ। ডান দিকেরটা অবশিষ্ট থাকলে তিনি 'গণেশ', বাঁ-দিকেরটা থাকলে—'একদন্ত'। অথচ দেখ, দাঁতাল হাতীকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগ থেকে বেশ বোঝা যায় ভারতীয় ট্যাক্সোনমিস্টদের নজরটা ছিল গজদন্তের দিকেই। তাই তো স্বাভাবিক। আজ থেকে একশ' বছর আগে একমাত্র গ্রেট-ব্রিটেনেই প্রতি বছর গড়ে দশলক্ষ পাউণ্ড হাতীর দাঁত আমদানি করা হত। যদি প্রতিটি দাঁতের ওজন গড়ে যাট পাউণ্ড ধরা যায় তবে একমাত্র ছোট দ্বীপ গ্রেট-ব্রিটেনের চাহিদা মেটাতেই সে আমলে প্রতি বছর আট-হাজার হাতীকে প্রাণ দিতে হত!

ক্যুভিয়ে বলে, হ্যাঁ, অঙ্কশাস্ত্র মতে সংখ্যাটা দাঁড়ায়—আট হাজার তিনশ' তেত্রিশ—তাও যদি তার মধ্যে 'গণেশ' কিংবা 'একদন্ত না থাকে। কিন্তু আজ থেকে একশ' বছর আগে গ্রেট-ব্রিটেনে যে বছরে এক মিলিয়ন পাউণ্ড ওজনের হস্তিদন্ত আমদানি হত এ তথ্য আপনি পেলেন কোথায়?

পণ্ডিতজী বলেন, ই. টেনেণ্ট-এর লেখা 'ওয়াইল্ড এলিফ্যাণ্ট' গ্রন্থ থেকে। সেটি ১৮৬৭ সালে ইংলণ্ডে ছাপা হয়েছিল।

ক্যুভিয়ে বলে, আচ্ছা, বর্তমানে পৃথিবী থেকে কি হস্তিবংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে?

পণ্ডিতজী চোখ থেকে চশমা জোড়া খুলে সবিনয়ে বলেন, মাপ করবেন ব্যারন ক্যুভিয়ে, এ প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক।

ক্যুভিয়ে বাধা দিয়ে বলে, ইয়ে, আমি ব্যারন ক্যুভিয়ে নই, ডক্টর ক্যুভিয়ে—

পণ্ডিতজীও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সে-কথা আপনি আগেও বলেছেন; কিন্তু আমরা বর্তমানে হাতীর শ্রেণীবিভাগ করছি। তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখার কথা। দুটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, এবার তৃতীয় দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাশুণ্ডিবংশের বিবর্তনের কথা আমায় বলতে হবে। এখনই হস্তিবংশ অবলুপ্ত হচ্ছে কি হচ্ছে না সে প্রশ্ন তুললে আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে···

—আমি দুঃখিত। আচ্ছা, আপনি মহাশুণ্ডিবংশের বিবর্তনের কথাই বলুন।

—মহাশুণ্ডিবংশের আদিমতম যে জীবটির সন্ধান আমরা পাচ্ছি তার নাম 'মরিথেরিয়াম'। প্রায় চার কোটী বছর আগে ঠিক তার পরের ধাপে যে

জীবটি বিবর্তিত হয়েছিল তার নাম প্যালিওম্যাস্টডন। এই চার কোটি বছরে কেমন করে এই মরিথেরিয়াম বা প্যালিওম্যাস্টডন আমাদের বর্তমান হাতীতে বিবর্তিত হল সে-কথা আলোচনা করার আগে মরিথেরিয়ামের জ্ঞাতি-ভাইদের কথা একটু বলে নেওয়া যাক :

তোমরা নিশ্চয় জান, যারা বলে মানুষ বাঁদর থেকে হয়েছে, তারা ভুল বলে। বিবর্তনবাদ সে-কথা বলে না। আসলে বলা উচিত নর ও বানরের পূর্বপুরুষ অভিন্ন। কিংবা বলা যায়, বাঘ-ভালুক-হাতী-গণ্ডারের চেয়ে জীব-বিবর্তনের সম্পর্কে বানরের সঙ্গেই মানুষের নিকটতম আত্মীয়তা। তেমনি আমি যদি প্রশ্ন করি—আজকের দুনিয়ায় যত জীবজন্তু দেখতে পাই তাদের মধ্যে হাতীর সঙ্গে সবচেয়ে নিবট-সম্পর্কটা কার ? বলতে পার কুহু ?

কুহু বলে, ঠিক জানি না ; আন্দাজ করতে পারি। গণ্ডার অথবা জলহস্তীর।

—হল না। আপনি কি বলেন, ব্যারন ক্যুভিয়ে ?

সম্বোধন সম্বন্ধে কোন আপত্তি না তুলে ক্যুভিয়ে বলে, আমার মনে হচ্ছে শুয়োর অথবা টেপির।

—না। জীববিবর্তনের সম্পর্কে হাতীর নিকটতম আত্মীয় হচ্ছে হাইর‍্যাক্স (hyrax) এবং সাইরেনিয়া (sirenia)।

কুহু বলে, আমি তাদের নামই শুনি নি ! হাতীর মত দেখতে বুঝি ?

—মোটেই নয়। হাইর‍্যাক্স দেখতে অনেকটা খরগোশ আর গিনিপিগের মাঝামাঝি। আকারেও ঐ রকম। চঞ্চল ছটফটে প্রাণী, হাতীর মত ধীর-স্থির নয় মোটেই। তুমি এ প্রাণী দেখনি। কলকাতার চিড়িয়াখানায় নেই। আফ্রিকা, আরব ও সিরিয়া অঞ্চলে এরা আজও টিকে আছে। দ্বিতীয় জন্তুটা হ 'সাইরেনিয়া'। বাঙলায় যাকে বলে 'মৎস্যকুমারী', ইংরাজীতে 'সী কাউ'। করা। দুটি জাত এখনও পৃথিবীতে টিকে আছে,—'ম্যানাটী' (manatee) এবং

'ডুগঙ্'। লম্বায় এগুলি ফুট-আষ্টেক, চ্যাপ্টা ল্যাজ এবং সামনে বুকের দুপাশে দুটি পাখনা। এই পাখনা দুটিকে যদি হাতের বিকল্প বলে ধরে নেওয়া যায় তবে বলব জন্তুটার পা নেই। আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতাই নেই এদের—একমাত্র পালিয়ে বাঁচা ছাড়া। ফলে এদের বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

জীববিজ্ঞানের একটি বই বার করে পণ্ডিতজী ওদের দেখালেন ডুগঙ্ আর হাইর‍্যাক্সের ছবি। কুন্তু না বলে পারল না, এরাই হাতীর সবচেয়ে নিকট-আত্মীয় ?
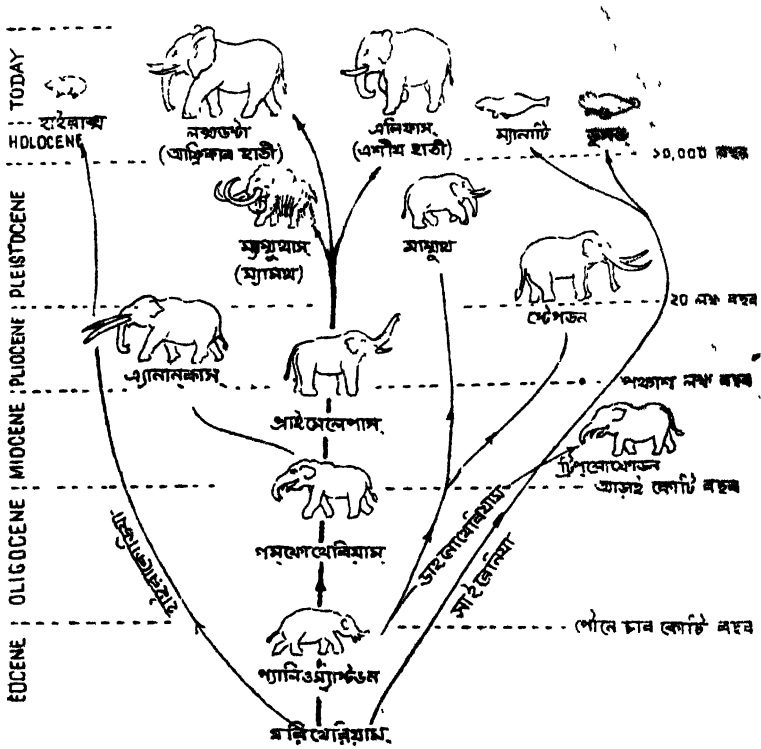
—হ্যাঁ। তার কারণটা কী তা আলোচনা করার সময় নেই, তোমরা হয়তো বুঝবেও না। সাদৃশ্য যেটুকু সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাব তা এই—হাতীর মত ঐ দুটি প্রাণীর স্তন মাত্র দুটি, এবং তা বুকের কাছে—তলপেটের কাছে নয়। বলতে পার, সে তো নর-বানরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঠিক কথা।
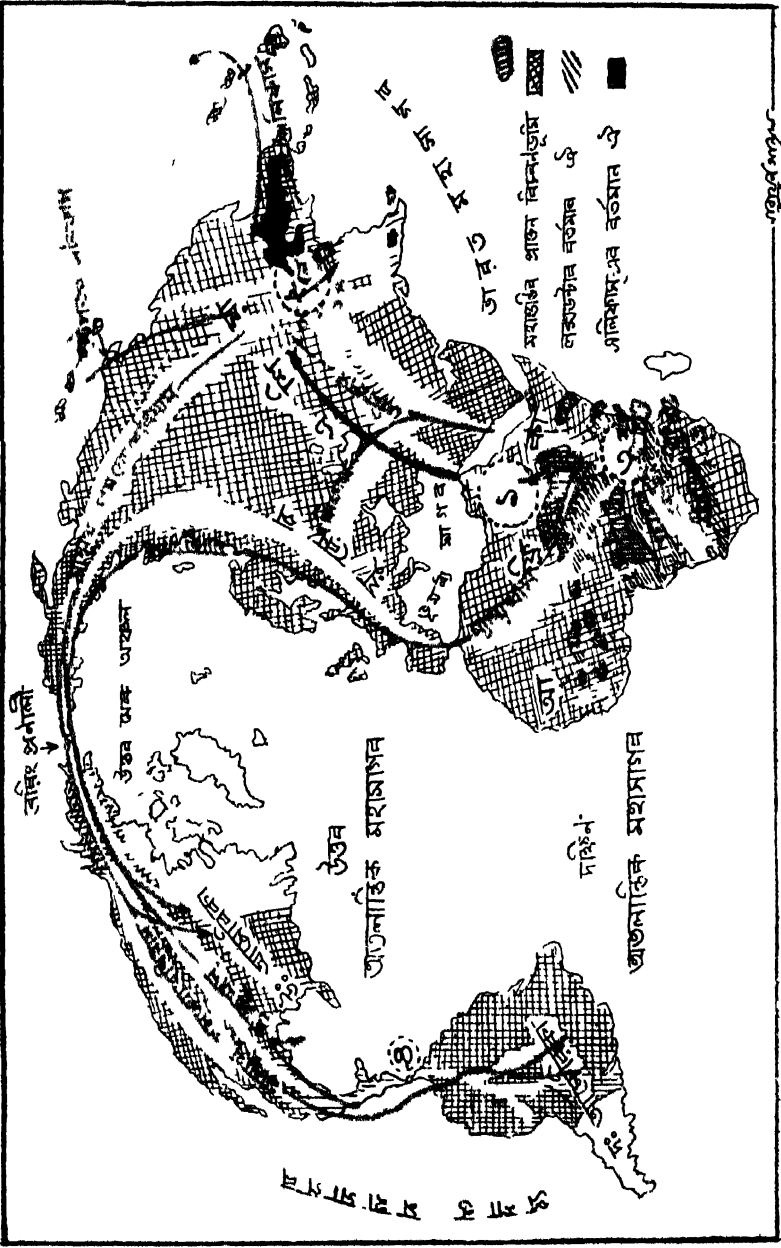
বেরিং প্রণালী
উত্তর মেরু অঞ্চল
উত্তর
আটলান্টিক মহাসাগর
দক্ষিণ
আটলান্টিক মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
ভূমধ্য সাগর
মহাদেশীয় প্রাচীন বিচ্ছিন্নভূমি
নবগঠিত পর্বতমালা ঐ
প্রাচীন পর্বতমালা ঐ

তাই বলব, এ-ছাড়া আরও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে তবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন—ওদের দাঁতের গঠন ও বিন্যাস, অস্থির অবস্থান ইত্যাদি দেখে।

পণ্ডিতজী তাঁর গ্রন্থ থেকে আর একটি ছবি বার করে বলেন, এই ছবিটা দেখলে মোটামুটি ধারণা করা যাবে, প্রায় চার কোটি বছরে কেমন করে আদিম 'মরিথেরিয়াম' আমাদের পরিচিত হাতীতে রূপান্তরিত হল। লক্ষ্য করে দেখ, যে আদিমতর জীব থেকে মরিথেরিয়াম বিবর্তিত হয়েছিল তারই দুটি শাখা থেকে বিবর্তিত হয়েছে হাতীর দুই অতি দূর সম্পর্কের দুই জ্ঞাতিভাই—হাইর্যাক্স আর সাইরেনিয়া। মরিথেরিয়ামের পরের ধাপে যে জীব, 'প্যালিওমাস্টডন' এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে আফ্রিকার যে অঞ্চলে তাকে আজ আমরা বলি, মিশর। পৃথিবীর ম্যাপে আমরা তাকে ১নং বৃত্ত বলে চিহ্নিত করেছি। আজ থেকে চার কোটি বছর আগে, ইয়োসিন-যুগে, এই অঞ্চলেই যে জীবটি জন্ম নিল, তাকে বলা যেতে পারে হাতীর আদিম রূপ।

বিবর্তনের ধারায় মূল কাণ্ডে পরবর্তী জীবটি হচ্ছে 'গম্ফোথেরিয়াম্'। আর অন্য একটি শাখায় জন্ম নিল 'ডাইনোথেরিয়াম'। যা-থেকে বিবর্তিত হল
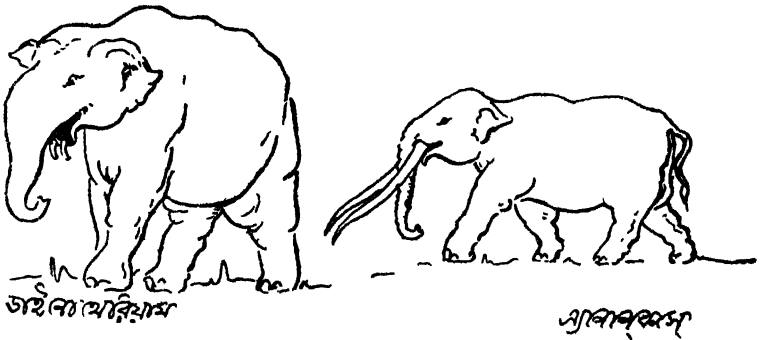
ত্রিভঙ্গদন্তী (ট্রিপ্‌লোফোডন) এবং খনিত্রদন্তী (প্ল্যাটিবেলডন)। গম্ফো-থেরিয়ামের আর একটি শাখায় জন্ম নিল 'এ্যানান্কাস'।

মূলকাণ্ডের পরবর্তী ধাপ 'প্রাইমেলেপাস্'। যা থেকে জন্ম নিল 'ম্যাম্মুথাস্' বা ম্যামথ, যা অবলুপ্ত, এবং বর্তমানের হাতী। তার দুটি জাত, 'লক্সডন্টা

আফ্রিকানা' (আফ্রিকার হাতী) এবং 'এলিফাস্ ম্যাক্সিমাস্' (এশিয়ার হাতী)।

প্যালিওম্যাস্টডন থেকে বিবর্তিত হয়েছে 'ম্যামুথ' এবং 'স্টেগডন'।

ম্যাপে লক্ষ্য করে দেখ, আদিমতম বিচরণভূমি বৃত্ত নং—১ থেকে দুটো দাগ দু-দিকে চলে গেছে। একটি উত্তর-পূর্বে, ভারতবর্ষের দিকে ২নং বৃত্তে; একটি দক্ষিণ-পূর্বে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে ৩নং বৃত্তে। এই দ্বিতীয় ধাপের দুই এবং তিন নং বৃত্ত থেকে সেই আদিম জীবেরা পরবর্তী মাইয়োসিন (পঞ্চাশ লক্ষ থেকে আড়াই কোটি বছর আগে) ও প্লাইয়োসিন (বিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে) যুগে নানান যাত্রাপথে নতুন নতুন ক্ষেত্রে খাদ্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে। দুটি যাত্রী-সড়ক ছিল এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে, বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে (বেরিং প্রণালী তখন ডাঙা, এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে পায়ে-চলা পথ আছে) প্রবেশ করল উত্তর আমেরিকায়। সেখান থেকে প্লাইয়োসিন যুগে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর পূর্বে, একটি শাখা নেমে এল দক্ষিণ আমেরিকায়।
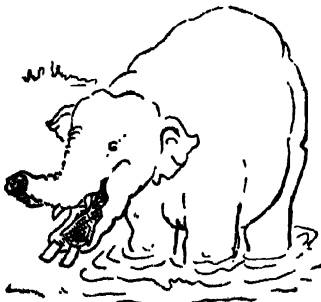
অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে, অস্ট্রেলিয়া ও মেরু-অঞ্চল ব্যতিরেকে সমগ্র ভূমণ্ডলেই ছিল ওদের বিচরণ ক্ষেত্র। বর্তমানে তারা কোনক্রমে কোন্ কোন্ অঞ্চলে টিকে আছে, ছবিতে তাও দেখানো হয়েছে।

পণ্ডিতজী বললেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আমি বাঙলায় নামকরণ করেছি।

বিশেষতঃ যেখানে ইংরাজি নামগুলো দাঁতভাঙা। 'ট্রিপলোফোডন' শব্দের অর্থ তিনবাঁকা দাঁত—তাই ওদের নাম দিয়েছি 'ত্রিভঙ্গদন্তী'। আর 'প্ল্যাটিবেলডন' শব্দের অর্থ বেলচার মত দাঁত—সেজন্য ওদের নামকরণ করেছি—'খনিত্রদন্তী।' আর 'এ্যানান্‌কাসের' নাম মহাদন্তী—কারণ তাদের দুটি সোজা দাঁত ছিল প্রকাণ্ড। বলাবাহুল্য ঐ প্রথম শাখায় আরও বহু শাখা-প্রশাখা আছে—তোমাদের ধৈর্যচ্যুতি হবে বলে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। ত্রিভঙ্গদন্তী আর খনিত্রদন্তীদের আকৃতিগত সাদৃশ্য যথেষ্টই ছিল। ছবি দেখলেই মনে হয় এরা স্তে-রাত্রির জ্ঞাতি। এদের বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘায়ত নিচের চোয়াল আর সেই চোয়ালের দুটি দাঁতের বেয়াড়া-রকম বৃদ্ধি! ওদের পূর্বপুরুষ ডাইনো-থেরিয়ামের মত এরাও আফ্রিকা-এশিয়া এবং উত্তর-আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অবাধে বিচরণ করত। আগেই বলেছি, তখন এ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে ইয়োরোপ ও আফ্রিকার সঙ্গে উত্তর-আমেরিকার স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। ডাইনোথেয়ারের মত এরা দীর্ঘশুণ্ড ছিল না, যদিও মাঝামাঝি ধরনের শুঁড় এদেরও ছিল—কিন্তু ডাইনোথেয়ারের মত এদের দাঁত নিচের দিকে বাঁক নিত না।।

এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। জীববিবর্তনের প্রেরণাতেই যে মহাশুণ্ডিদের উপর ও নিচের চোয়াল ক্রমশঃ বড় হয়ে যাচ্ছিল একথা সহজেই আন্দাজ করা যায়। দেহটা বড় হলে লড়াইয়ের সুবিধা। অর্থাৎ ধারে না কাটে তো ভারে কাটে! তাই ক্ষুদ্রকায় মরিথেরিয়াম থেকে বিবর্তনের পথে ওরা ক্রমশঃ আকারে বড় হয়েছে। কিন্তু সেজন্য অন্য একটা অসুবিধাও হতে শুরু করল ওদের খাদ্যদ্রব্য অধিকাংশই আছে মাটিতে। দেহটা বড় হয়ে যাবার মানে, মাথাটা ক্রমশঃ মাটি থেকে উঁচুতে উঠে যাওয়া। প্রতিবার হাঁটু ভেঙে মুখটা মাটির কাছে আনা কষ্টকর, তাছাড়া হাঁটু ভেঙে খাবার খাওয়ার সময় অতর্কিতে কোন শত্রু আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করাও শক্ত। তাই বিবর্তনের তাগিদে এদের মুখের দুটি চোয়ালই ক্রমে বড় হয়ে উঠতে শুরু করল।

মজার কথা এই যে, পরবর্তী যুগে আমরা দেখতে পাই এ্যানান্‌কাস অথবা স্টেগো-ম্যাস্টডনের বেলায় আর নিচের দিকে বিরাট চোয়াল নেই। নিচের চোয়াল ছোট হয়ে গেছে আবার। কারণ উপরের চোয়ালটা আর নাকটা লম্বা হতে হতে যখন শুঁড়ে রূপান্তরিত হল তখন ওরা হাঁটু না ভেঙেই মাটি থেকে খাবার তুলে নিতে সক্ষম হয়ে গেল।

এ্যানান্‌কাসদের চেহারা আজকের দিনের হাতীর মত। যদিও এদের

দাঁত-দুটি ছিল অতি প্রকাণ্ড। উচ্চতায় এরা ভারতীয় হাতীর মত—প্রায় আট-ন'ফুট, কিন্তু শুঁড় থেকে লেজ পর্যন্ত জন্তুটার যা দৈর্ঘ্য তার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ লম্বা ছিল তাদের গজদন্ত। হাতীর দাঁত একটা মারাত্মক অস্ত্র; কিন্তু এ্যানান্‌কাসের ক্ষেত্রে তা ছিল কিনা সন্দেহ জাগে। এতবড় দাঁতের ভারে বেচারির মাথা ঝুলে থাকত। ঘাড়ে প্রচণ্ড চাপ পড়ত। শত্রু কাছে এলে অতবড় দাঁত ঘুরিয়ে লড়াই করতে গিয়ে বেচারির অবস্থা হত আমাদের সেই মোচকুন্দ সর্দারের মত।

কুন্থ বলে, মোচকুন্দ সর্দার কে জেঠু?

—ও, তুই জানিস না বুঝি? মোচকুন্দ ছিল আমাদের দারোয়ান। ইয়া বড় মোচ ছিল তার। তাই আমরা তার নাম রেখেছিলাম, মোচকুন্দ। তার পিতৃদত্ত নামটা আমরা ভুলেই গেছিলাম। আমি তখন তোর মত ছোট। একদিন বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। সকলের চেঁচামেচিতে মোচকুন্দের ঘুম ভেঙে গেল। চট্ করে গোঁফ-জোড়া মুচড়ে নিয়ে সে ঢুকে গেল মালখানায়। চাবি থাকত তার কাছেই। বেরিয়ে এল একটা ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে। তারপর ধাওয়া করল চোরের পিছু। শেষে যখন সে খালিহাতে ফিরে এল তখন বড়দা বললেন—কী হল মোচকুন্দ? চোর পালিয়ে গেল? ধরতে পারলে না? মোচকুন্দ বললে, ময় কি করিম দেউতা? মোর এটা হাতৎ ঢাল, এটা হাতৎ তলোয়াল,—তেন্তে চোরক পাকড়োঁ কেনেকৈ?

কুন্থ হো-হো করে হেসে ওঠে। ক্যুভিয়ে হিউমারটা ধরতে পারে নি বুঝতে পেরে তার জন্য বঙ্গানুবাদ করে, 'আমি কী করব হুজুর? আমার একহাতে ঢাল, অন্য হাতে তলোয়ার, তাহলে চোর ধরি কি করে?'

পণ্ডিতজী পুনরায় শুরু করেন, উত্তর-আমেরিকার একটিমাত্র অঞ্চল থেকে শতাধিক ম্যাস্টডনের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। মনে হয়—সে যুগে সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল একটা জলাভূমি, তারই ধারে ধারে এই শেষজাতের ম্যাস্টডন বাস করত। পরে জলাভূমিটা একটা চোরাবালির গর্তে পরিণত হয়। শুধু ম্যাস্টডন নয়—নানান জাতের বাইসন, বলগা হরিণ, বন্য ঘোড়া প্রভৃতির দেহাবশেষ এই অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় যে ম্যাস্টডনটি আবিষ্কৃত হয়েছে উচ্চতায় সেটি দশ ফুট দু' ইঞ্চি। তার কঙ্কাল রাখা আছে ওহিও যাদুঘরে। এদের দাঁত এ্যানান্‌কাসের মত প্রকাণ্ড না হলেও যথেষ্ট বড় ছিল, ছয় থেকে নয় ফুট পর্যন্ত পাওয়া গেছে। শুধু উত্তর আমেরিকাতেই নয়, এশিয়াতে, এমন কি আমাদের ভারতবর্ষেও এদের জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে। কলকাতার

যাদুঘরে একতলায় ভূ-বিদ্যার ঘরে ঢুকতেই এদের জাত-ভাইয়ের একটি প্রকাণ্ড শিরঃকঙ্কাল দেখতে পাবে। তার নামও ট্যাবলেটে লেখা আছে! তার নাম— 'স্টেগডন-গণেশ'।

সে যাই হোক, স্টেগডন থেকে দেখছি তিনটি ধারার উৎপত্তি হল। প্রথম ধারার পরিণতি আফ্রিকার হাতী (লক্সডণ্টা আফ্রিকানা), দ্বিতীয় ধারার অবশেষ—এশিয়ার হাতী, (এলিফাস ম্যাক্সিমাস্), এবং তৃতীয় ধারাটি অবলুপ্ত হয়েছে—তার নাম ম্যামথ।
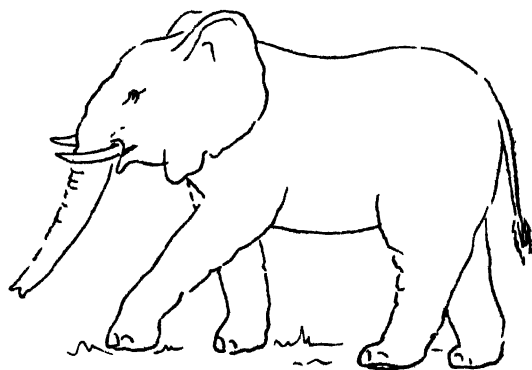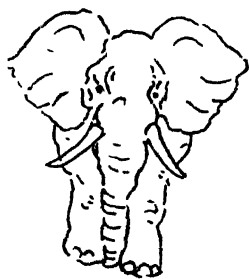
এশিয়ার হাতীর চেয়ে আফ্রিকার হাতী আকারে বৃহত্তর হয়। আফ্রিকার হাতীর কান আকারে অনেক বড। শুঁডের গঠনেও তফাৎ আছে। পাশাপাশি যদি আফ্রিকার হাতী আর এশিয়ার হাতীর ছবি দেখি তখন বুঝতে পারি তফাৎটা কোন্‌খানে।

প্রথম ধারার আদিজীব হচ্ছে প্যালিও-লক্সডন। মোঘলাই তরবারির সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের বিলাতী তরবারির যে প্রভেদ স্টেগডনের দাঁতের সঙ্গে এদের

গজদন্তগুলির আকারগত প্রভেদটা তাই। স্টেগডনের দাঁত ছিল বাঁকা, এদের সোজা। এই প্যালিও-লক্সডনগুলি ছিল অতি বৃহদাকার—বোধহয় মহাশুণ্ডি-বংশে বৃহত্তম ছিল তারা। উচ্চতায় প্রায় চৌদ্দ ফুট। হয়তো তাই এদের বংশাবতংস আফ্রিকার হাতী আমাদেব ভারতীয় বা এশীয় হাতীর চেয়ে আকারে বড়। দ্বিতীয় ধারা থেকে কীভাবে আজকের এশিয়াবাসী হাতী বিবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি।
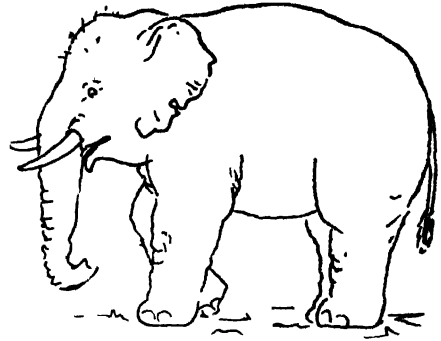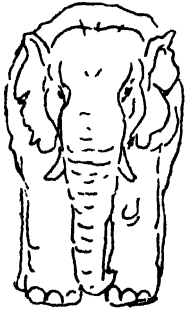
তৃতীয় ধারায় যে জীবটি অবলুপ্তির পথে হারিয়ে গেল, তার নাম আগেই বলেছি, ম্যামথ। তাদের মোটামুটি চারটি জাত। অন্তত দুটি প্রধান জাতের কথা বলি: রাজ-ম্যামথ আর লোমশ-ম্যামথ। রাজ-ম্যামথের (Mammuthus Imperator) জীবাশ্ম উত্তর-আমেরিকায় পাওয়া গেছে। বর্তমান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছিল তাদের বিচরণ-ভূমি। উচ্চতায় এরা প্রায় প্যালিও-লক্সডনের কাছাকাছি—তের-চৌদ্দ ফুট। আর সব জাতের ম্যামথের মতই এদের গজদন্ত পরিণত বয়সে বাড়তে বাড়তে আর বেঁকতে বেঁকতে শুঁড়কে প্রায় আলিঙ্গনবদ্ধ করে ফেলত। লোমশ-ম্যামথ উচ্চতায় অত বড় ছিল না। তাদের চেহারা—যাকে আমরা প্রাকৃতভাষায় বলি: 'ঘাড়ে-গর্দানে'। কাঁধের কাছ থেকে পিঠের ঢালটাও লক্ষ্য করবার মত। শীতপ্রধান দেশের প্রাণী বলে এদের গায়ে বড় বড় লোম ছিল। আকারে আজকের হাতীর চেয়ে বড় না হলেও এদের গজদন্ত ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। বর্তমান যুগের দু'জাতের হাতীর মধ্যে আফ্রিকার হাতীর দাঁতই বড় হয়। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আফ্রিকান হাতীর দাঁত, যার হদিস আমি পেয়েছি, তার মাপ হচ্ছে ১১ ফুট ৫½ ইঞ্চি। তুলনায়

লোমশ-ম্যামথের সবচেয়ে বড় দাঁত আজ পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড়গুণ—১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। হাতী আর ম্যামথের মাথার খুলির তুলনা
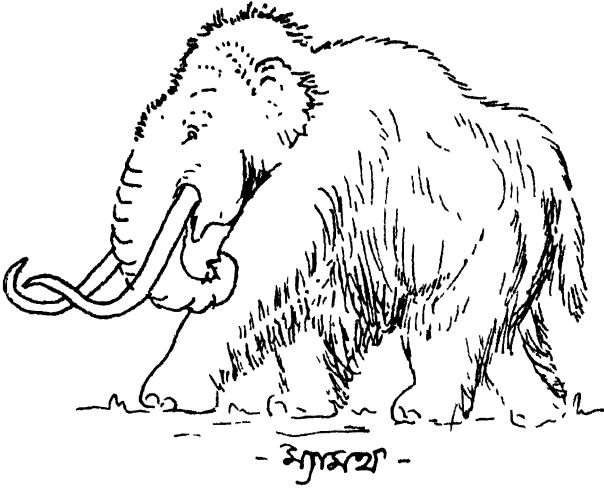
- ম্যামথ -

করলে বোঝা যাবে দাঁতের বৈশিষ্ট্যগুলি। লোমশ-ম্যামথের গজদন্ত দুটি যেন প্রায় একই উৎসমূল থেকে উপজাত— তারপর যেন তারা ক্রমশঃ দূরে সরে
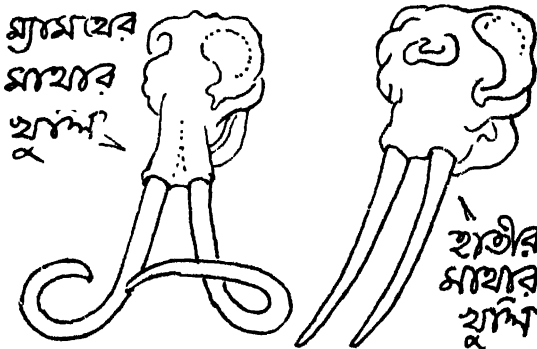
গেছে। যেন একটা মিলনান্তক নাটক! বাল্যে ওরা যেন এক গাঁয়েই মানুষ হয়েছে—তারপর কৈশোরে অথবা প্রথম যৌবনে ভুল-বোঝাবুঝি করে দু'জনে

অভিমানী বাঁক নিয়ে দূরে সরে গেছে—আর তারপর পূর্ণযৌবনে অনিবার্য আকর্ষণে দু'জনে পরস্পরের দিকে বাঁক নিয়ে ফিরে এসেছে!

ক্যাভিয়ে আড়চোখে কুহুর দিকে একনজর দেখে নেয়। ম্যামথের দাঁত নিয়ে পণ্ডিতজীর এই 'মিল্‌টনিক সিমিলির' প্রভাব কুহুর উপর কতটা পড়ল তা বুঝে নিতে চায়। দেখা গেল তার পাতলা ঠোঁটের প্রান্ত দুটি বেঁকে গেছে। এক চিল্‌তে একটা হাসির আভাস!

পণ্ডিতজী বলতে থাকেন, তুলনায় দেখুন হাতীর দাঁতদুটিকে। ওরা যেন হাণ্ড্রেড মিটার রেসের দুই প্রতিযোগী। ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় নি। যে-যার ট্র্যাক ধরে সামনের দিকে ছুটে চলেছে।

এইবার একটা মজার কথা বলি। অবলুপ্ত জীবের বিবর্তন-ইতিহাসের আলোচনায় আমাদের হাতে সবচেয়ে বড দলিল—জীবাশ্ম বা ফসিল। তাই দেখে কল্পনায় জীববিজ্ঞানীরা তাদের গোটা চেহারা এঁকেছেন। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে লোমশ-ম্যামথ। সাইবেরিয়ার চিরতুষারাবৃত অঞ্চলে কয়েকজন রুশীয় পর্যটক বরফের তলা থেকে অনেকটি লোমশ-ম্যামথের দেহাবশের আবিষ্কার করেন। চিরতুষারাবৃত অঞ্চল বলে মৃত ম্যামথের দেহের লোম, চামড়া, মাংস ইত্যাদি দীর্ঘ বিশ হাজার বছরেও অবিকৃত ছিল। লেনিনগ্রাডের বিখ্যাত যাদুঘরে এমন একটি লোমশ-ম্যামথকে ঔষধ-প্রয়োগে অবিকৃতভাবে রাখা হয়েছে। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, বিজ্ঞানীরা আর একটি ম্যামথের মাংস কেটে কুকুরদের খেতে দিয়েছিলেন। তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল না দেখে শেষপর্যন্ত রুশীয় বৈজ্ঞানিকের দল একটি সায়মাশে ম্যামথের মাংস রান্না করে খেয়েছিলেন!

কুহু প্রশ্ন করে, ঐ ম্যামথগুলি কেন অবলুপ্ত হয়ে গেল?

—নিঃসন্দেহে মানুষের অত্যাচারে। প্রস্তর-যুগের মানুষ যে ম্যামথের সমকালীন তার অকাট্য প্রমাণ আছে। গুহাপ্রাচীরে প্রস্তর-যুগের মানুষ ম্যামথ-শিকারের ছবি এঁকে গেছে।

ক্যাভিয়ে বলে, প্রথমদিকে আপনি বাঙলা নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু শেষদিকে তো আর বাঙলা নাম বলছেন না! ম্যামথের কি নাম দিয়েছেন?

—'ম্যামথ' শব্দটা বাঙলায় বেশ প্রচলিত। তাই ওর অনুবাদ করার প্রয়োজন বোধ করি নি।

—আর 'ম্যাস্টডন'?—তার বাঙলা নামকরণ করেন নি?

চোখ থেকে চশমাজোড়া খুলে নিয়ে পণ্ডিতজী বলেন, মাপ করবেন ব্যারন ক্যুভিয়ে···সৌজন্যবোধে সেটা আমি করি নি। তবে প্রশ্ন যখন করলেন তখন বলি—ঐ 'ম্যাস্টডন' নামটা জীববিদ্যায় কে প্রথম আমদানি করেছিলেন জানেন?

—আপনার বৃদ্ধ প্রপিতামহের খুল্লতাত স্বনামধন্য জীববিজ্ঞানী ব্যারন জর্জেস লিওপোল্ড ক্যুভিয়ে।

ক্যুভিয়ে বলে, তাই নাকি?—তা এমন অদ্ভুত নামকরণের অর্থ?

পণ্ডিতজী গম্ভীর হয়ে বলেন, অর্থটা জানতেন আপনার ঐ পূর্বপুরুষ, আর ব্যাখ্যা সম্ভবত আপনিই করতে পারবেন! যেহেতু আপনারা দু'জনেই বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও জাতে ফরাসী।

ক্যুভিয়ে হালে পানি পায় না। এ আবার কি সমস্যা? বলে,—মানে?

পণ্ডিতজী তাঁর গ্রন্থ থেকে একটি ছবি মেলে ধরেন। বলেন, এই দেখুন, এটা হচ্ছে ম্যাস্টডনের একপাটি দাঁত। গজদন্ত নয়, চিবানোর দাঁত। এই দাঁত
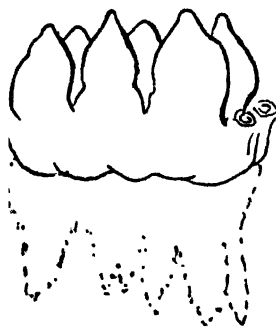
দেখেই আপনার পূজ্যপাদ পূর্বপুরুষ এ নামকরণ করেছিলেন। ব্যারন লিওপোল্ড ক্যুভিয়ে যদি জার্মান অথবা ব্রিটিশার হতেন তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারি এমন নামকরণ তিনি করতেন না। তাঁর মনে পড়ত একটি পর্বতশৃঙ্গ অথবা সমুদ্রের ঢেউ-এর কথা!

ক্যুভিয়ের তখনও 'এক-বাঁও' মেলে না! স্বীকার করে সে-কথা। বলে, মাপ করবেন পণ্ডিতজী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

—'ম্যাস্টডন' শব্দটার আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে 'স্তন-দন্ত'। ফরাসী বৈজ্ঞানিক

ঐ দাঁতের পাটির উপমান হিসাবে মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন পাশাপাশি দাঁড়ানো তিনটি পূর্ণযৌবনা, পীনোন্নতা, অনাবৃত-বক্ষা রমণীকে! বলুন ব্যারন ক্যুভিয়ে—আপনিই বলুন—জাতে ফরাসী না হলে এমন মর্মান্তিক নামকরণটা তিনি করতে পারতেন?

ক্যুভিয়ে জবাব দিতে পারে না। তার কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে। সে জাতে ফরাসী বলে নয়—কুহু তার পাশে বসে একদৃষ্টে ঐ ছবিটি দেখছিল বলে!

শিকার থেকে ফিরতে ক্যুভিয়ের বেশ বেলা হয়ে গেল। তা প্রায় দশটা বাজে। ভোররাত্রে উঠে সে একাই চলে গিয়েছিল জঙ্গলে। পাকদণ্ডী পথ বেয়ে নেমে এসেছিল সমতল-ভূমিতে, তারপর পায়ে পায়ে প্রবেশ করেছিল অরণ্যে। চওড়া উপলবন্ধুর সড়কটা চলে গেছে হাট-বাজারের দিকে, তার দু'পাশেই জঙ্গল। যে-কোন পায়েচলা বিসর্পিল পথে চলে যাও, পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরেই পৌঁছে যাবে নিবিড় অরণ্যে। খাঁকি ব্রীচেসটা পরে, পায়ে হান্টিং-বুট আর মাথায় হ্যাট চড়িয়ে বন্দুক-হাতে ক্যামেরা-কাঁধে একাই চলে এসেছিল ক্যুভিয়ে সেই কাক-না-ডাকা ভোরে।

অরণ্যের বিশালতাকে তুমি দেখতে পাবে না। পর্বত বিরাট, সমুদ্র বিশাল, মহাকাশ অনন্ত—তা তুমি দু'চোখ ভরে দেখতে পার। চলে যাও দার্জিলিঙে, দেখবে কোন বিস্মৃত অতীতে ভূগর্ভস্থ অগ্নি-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা একদিন যে ঢেউ তুলেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ধরে তা দাঁড়িয়ে আছে শাশ্বতকাল। চলে যাও পুরীতে, দেখবে আদিগন্ত সমুদ্রের অনাদ্যন্ত উচ্ছ্বাস। নজর নিচু ক'র না, দেখবে লক্ষকোটী আলোকবর্ষের ওপার থেকে অসীমের ইসারা তারায় তারায় কানাকানি করছে। তেমন করে অরণ্যকে দেখবার সুযোগ কিন্তু পাবে না তুমি। অরণ্যের একান্তে অন্তেবাসীর মত যদি দাঁড়াও, দেখবে শুধু সামনের ঐ গাছের সারিটাকে—তার বাদ বাকি দেহ ঘোমটা-ঢাকা। ছুটে চলে যাও ওর গভীরে, অন্তরের অন্তস্তলে—তবু সে ধরা দিতে চাইবে না! যত গভীরে যাবে ততই সে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে, দেখতে দেবে না তার পূর্ণস্বরূপ। পায়ে পায়ে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে তার লতাগুল্মের মিনতিতে, চোখের সামনে দু'হাত তুলে ঢেকে দেবে তোমার দৃষ্টি—ঘন পত্রপল্লবের সবুজাভায়। ঘোমটা টানবে পদে পদে। পথ হারিয়ে ফেলবে ক্রমে, অধরাকে ধরতে গিয়ে কাঁটায় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে,—হয়তো চীৎকার করে উঠবে: বনলক্ষ্মী! তুমি কোথায়?

আড়াল থেকে ছলনাময়ী প্রতিধ্বনিতে তোমাকে ফিরে প্রশ্ন করবে : তুমি কোথায় ?

চমকে উঠবে তুমি ! তাই তো ! এ কোথায় এসে পড়েছ ! আলেয়ার মত ঐ যে মেয়েটি তোমার চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তার কথা আর তখন মনে থাকবে না। তাকে আর খুঁজবে না। খুঁজবে সভ্যজগতে ফিরে আসার পথ !

তাই বলে কি ছলনাময়ীকে ধরা যায় না, দেখা যায় না ? যায়। অরণ্য-প্রেমিকের কাছে সে ধরা দেয়। মনের চোখ দিয়ে যে দেখতে জানে তার কাছে সে ধরা দেয়। সেই বিশেষ জনের চোখের সামনে ঐ ঘন-হয়ে-আসা শাল-পিয়াল-কেঁদ-গাম্‌হার-মহুয়ার দল বাধা হয়ে দাঁড়ায় না—সে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ পাদপের সমাহার এই অরণ্যকে। তার পায়ে কাঁটা ফোটে না, কারণ ফুটলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। তার পায়ে লতাগুল্ম জড়ায় না—ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় বনলক্ষ্মী তাকে সোহাগ জানায়। তার কাছেই যে ঘোমটা খোলে ঐ ছলনাময়ী !

দিনের এক-এক সময়ে তার এক-এক রূপ। বছরের এক-এক ঋতুতে তার এক-এক সাজ। সবার কাছে নয়—তোমার আমার কাছে সে যে নিতান্ত জঙ্গল ! ঐ অরণ্য-প্রেমিকের জন্যই সে সাজ বদলায় শুধু। চন্দ্রাহত জ্যোৎস্না-রাতে তাকে দেখেছ ? তখন সে রূপালী চীনাংশুকে আধো-ঘোমটা-দেওয়া স্বপ্নচারিণী অভিসারিকা ! ঘন বর্ষায় তাকে দেখ, সবুজের সমুদ্র যেন। আবার প্রথম ফাল্গুনে নবপুষ্প আর কচি কিশলয়ে তাকে দেখবে কিশোরী মেয়ের অবাক স্বপ্নের মত। ফের ঝরাপাতার শীতের বিকেলে তাকিয়ে দেখ তাকে—চোখে জল এসে যাবে ; দেখবে উদাসীন সন্ন্যাসিনীর সাজে সেজেছে মেয়েটি—কোন মহাকালের তপস্যায় সে অর্পণা !

ক্যাভিয়ে অরণ্য-প্রেমিক। সে দেশে-দেশে ছুটে গেছে ঐ অরণ্যের টানে। অরণ্যের শব্দ, তার গন্ধ, তার রূপ, তার স্পর্শ সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে সে গ্রহণ করেছে। তাই ভোরবেলা একাই পালিয়ে এসেছিল সে। ফিরে এল যখন তখন রৌদ্র প্রখর হয়েছে। ওর ঘরে অপেক্ষা করছিল কুহু। ওকে আসতে দেখে বলল, বেশ তো লোক আপনি ! ব্রেকফাস্ট না করেই কোথায় গিয়েছিলেন সাত-সকালে ?

স্নানান্তে কুহু একটা হলুদ-রঙে ছোপানো শাড়ি পরেছিল। কপালে সিঁদুরের টিপ। কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে টেবিলে রেখে ক্যাভিয়ে বলে, শিকারে !

—শিকারে! বলেন কি! আপনি না শিকার করা ছেড়ে দিয়েছেন?

—কে বলল? মোটেই নয়।

—কি পেলেন শুনি?

—একটা হর্ণবিল, এক জোড়া অরিওল আর একটা প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার।

—হর্ণবিল তো ধনেশ, আব ঐ ফ্লাইক্যাচার বোধহয় দুধরাজ; কিন্তু অরিওলটা কি?

—একটা পাখি। এই বিঘৎখানেক হবে। সারাটা গা আপনার এই শাড়ির রঙ; মাথাটা কালো।

—বুঝেছি—হলদে পাখি, মানে 'বউ কথা কও'! তা কই, আপনাব শিকার কোথায়?

আমার ক্যামেরায়। ফিল্মটা ডেভালপ না করলে তো আপনাকে দেখাতে পারব না।

—বুঝেছি। আসুন এবাব। ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।

—আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন? শুধু শুধু আমার জন্য কষ্ট করে—

—বা—বে! অতিথিকে না খাইয়ে নিজে খেযে নিতে পারি?

—তার মানে আপনি এখনও আমাকে পর-পর ভাবছেন।

—আজ্ঞে না মশাই—খুব আপন-আপন ভাবছি! যান, মুখ-হাত ধুযে আসুন।

খাবার টেবিলে ক্যাভিয়ে প্রসঙ্গটা তুলল, দেখুন কুহু দেবী, আপনার বাবা কবে ফিরবেন তার কোনও স্থিরতা নেই। আমি তিন সপ্তাহ আছি এখানে। আর নয়, এবার বিদায় দিন আমাকে!

—কেন? আপনি তো চাকরি ছেড়ে দিযে এসেছেন। এত তাড়া কিসের?

—কতদিন আর এভাবে বসে থাকা যায়?

—জায়গাটা আপনার খারাপ লাগছে কি?

—সেজন্য নয়। তবু···বুঝলেন না···

—খুব বুঝেছি! এবার আপনিই আমাদের খুব আপন-আপন ভাবছেন!

ক্যাভিয়ে কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

মেয়েটি নিজে থেকেই বলে, চলে যেতে চাইলে আপনাকে ধরে রাখব কোন্ জোরে? কিন্তু এটুকুও কি বুঝছেন না, আপনি থাকায় আমার জীবনে একটা

'রিলিফ' এসেছে! তবু দুটো কথা বলার মত মানুষ হাতের কাছে পাচ্ছি! জেঠু তো বই নিয়েই মত্ত—বাবা জঙ্গলে; আমার দিনটা কি করে কাটে?

ক্যাভিয়ের মনে পড়ল, ঠিক এই প্রশ্নই সে একদিন করেছিল মেয়েটিকে। জবাবে তখন মেয়েটি বলেছিল—তার মরবার সময় নেই! ক্যাভিয়ে আজ বুঝতে পারে মরবার সময় যারা পায় না তারাও বাঁচবার সময় পায়—এবং সেই বাঁচবার উপায়টা হচ্ছে মনের মত একটি মানুষের সঙ্গ।

কুহু বলে, পাঁচবছর বয়সে এ-বাড়িতে এসেছিলাম—

বাধা দিয়ে ক্যাভিয়ে বলে, তার মানে? আপনার জন্মই তো এ-বাড়িতে।

—হ্যাঁ, জন্ম এ-বাড়িতে; কিন্তু জীবনের প্রথম পাঁচটা বছর এ-বাড়িতে কাটে নি।

—কেন?

—তাহলে আমার মায়ের কথা আপনাকে শোনাতে হয়।

—বলুন না। যদি না আপত্তি থাকে!

—না, আপত্তি আর কি?

মায়ের কথাও শুনিয়েছিল ক্যাভিয়েকে। কাহিনীটি সে শুরু করেছিল পুণ্ডরীকের মৃত্যু থেকে।

পুণ্ডরীকের মৃত্যু হয়েছিল গভীর অরণ্যের ভিতর। একমাত্র লালচাঁদ ছিলেন সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর সাক্ষী। কিন্তু দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছোটে। পরদিন শাওচিলিয়া-গ্রামের মোড়ল বলভদ্রের বড়ছেলে ছুটে এসে খবর দিল মোহনপুরে। খেদা-মরশুম তখন সবে শেষ হয়েছে। মোহনপুরে তখন বিশ-পঁচিশটা হাতী, প্রায় শ'খানেক লোক। বিভিন্ন গ্রামের মোড়লেরা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে আছে। তাঁবু পড়েছে মাঠের মাঝখানে। প্রতি বছর কর্তামশাই ফাঁসি-শিকার থেকে ফিরে এলে হয় 'মিত্রদেব'-এর বাৎসরিক পূজা। সারারাত নাচগান হয়। মহুয়া আর তাড়ির বন্যা বয়ে যায়। দেবতার প্রসাদ পায় সবাই। তারপর যে-যার গ্রামে ফিরে যায় হাতী নিয়ে। তাই সংবাদটায় সবাই চমকে উঠল। খবর পাওয়া গেল দুটি হাতীকে নিয়ে কর্তামশাই ঐ জঙ্গলের কাছাকাছি মাহুতদের গ্রাম শাওচিলিয়ায় পৌঁচেছেন। তিনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। পাগলের মত। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না, খাবারও খাচ্ছেন না,—শুধু মদ্যপান করছেন।

পাথর হয়ে গিয়েছিল গণেশ-সর্দার—তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে। ঘরের দিকে পা বাড়াতে তার মন সরে নি। এরপর সে কেমন করে দাঁড়াবে

তার মা-জননীর কাছে? লক্ষ্মীর কাছে কী সান্ত্বনার বাণী শোনাবে সে? কিন্তু লক্ষ্মী কি বুঝবে না—শেলটা তার বুকেও কী প্রচণ্ডভাবে বিঁধেছে!

ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে আসে হরিশ। পুণ্ডরীকের দোস্ত। গণেশের বাহুমূল ধরে বলে ওঠে, সর্দার! বেবাক কপাল চাপড়াইলে তো চলব না! উঠ! বদলা লওন অখনও বাকি আছে।

পরমুহূর্তেই রূপ বদলে গেল গণেশ-সর্দারের। ঠিক কথা! যে দৈত্যটা তার সন্তানকে পদদলিত করে কর্দমপিণ্ডে রূপান্তরিত করেছে তাকে স্বহস্তে বধ করতে হবে! দ্বৈরথ-সমরে জোয়ান ছেলে হেরে গেছে—কিন্তু তার চোখে-ছানি-পড়া বাপ আজও বেঁচে আছে। অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদে যেন গাণ্ডীবী জেগে উঠলেন। মালখানা থেকে বাছা বাছা কয়েকটি রাইফেল বার করে নিয়ে জনা-চারেক দুঃসাহসী সহচরকে হাতীর পিঠে তুলে সে তখনই রওনা হয়ে পড়ল শাঙচিলিয়ার উদ্দেশে।

প্রতিশোধ নিতে যাবার আগে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করে যাবার কথা মনেও পড়ল না।

সন্ধ্যার আগেই তারা পৌঁচেছিল সে গ্রামে। শাঙচিলিয়ার বৃদ্ধ মোড়ল বলভদ্র এগিয়ে এসে বলল,—কর্তামশাই বসে আছেন ওর গোয়ালঘরে। দু'দিন আগে তিনি সেই যে ঢুকেছেন ঐ ঘরে, আর বার হন নি। কুটোটি পর্যন্ত দাঁতে কাটেন নি। শুধু পাঁট পাঁট মদ গিলে চলেছেন। মদের জোগান দিয়ে চলেছে বলভদ্র—নিজে নয়, সে সাহস তার হয় নি। তার নাবালক পুত্র সাত-বছরের চন্দন পৌছে দিয়ে আসে মদের পাত্র। তাকে উনি কিছু বলছেন না।

গণেশ-সর্দার তার সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গোয়ালঘরের দিকে। গোলপাতায় ছাওয়া ছিটে-বেড়ার একখানা ঘর। একটা অব্যবহৃত ঢেঁকির উপর স্থির হয়ে বসে ছিলেন লালচাঁদ। তাঁর পরনে তখনও সেই ল্যাঙট। সর্বাঙ্গে পাঁক-মাটি শুকিয়ে উঠে বীভৎস দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে। সামনে একটা মাটির হাঁড়ি আর গোটাকতক নারকেলের মালা। হাঁড়ি থেকে ঐ নারকেলের মালায় গ্রাম্য মধুক ঢেলে ক্রমাগত পান করে চলেছেন তিনি। হাতী দুটো—বড়ামাঈ আর ছোটামাঈ দাঁড়িয়ে আছে সামনের মাঠে। আশ্চর্য! আজ দু'দিন তারাও কিছু খায় নি। পাশেই বলভদ্রের কলাবাগান। সেদিকেও যায় নি। বলভদ্র গাছ-পাতা কেটে এনে দিয়েছে ওদের মুখের সামনে। মুখ ফিরিয়েও দেখে নি তারা। নড়ে নি পর্যন্ত। যেন দড়ি দিয়ে কেউ

ওদের বেঁধে রেখেছে গাছতলায়। কী জানি কী করে হাতী দুটো ধরে দিয়েছে তারাই বুঝি অপরাধী।

ওদের আসতে দেখে লালচাঁদ তাঁর ঘোর রক্তবর্ণ চোখ দুটো তুলে তাকালেন। কথা বললেন না।

গণেশের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল সে। বসে পড়ল মাটিতে, কর্তামশাইয়ের পায়ের কাছে। শুধু বললে,—কর্তা!

মাথাটা নেড়ে লালচাঁদ এতক্ষণে বললেন, হ্যাঁরে, পারলাম না হতভাগাটাকে বাঁচাতে!

দু'চোখ বেয়ে এতক্ষণে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ে।

গণেশ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, তুমি কিয় কান্দিছ দেউতা? তোমার কান্দন মই কান্দি শেষ করিম! নেকান্দিবা তুমি! লরাজনাব ভুল হইছিল মানো; দাইমার কতাটো সি খেযাল করে নাই।

—হুঁ! নারকেলের মালাটার দিকে হাত বাড়ান লালচাঁদ।

হরিশ-মাঝি বলে ওঠে, কামটো তো এখনও শেষ হয় নাই কর্তা! আমাগো বদ্লা লওন লাগব! বন্দুক আন্‌ছি, আহেন আপনি!

চমকে ওঠেন লালচাঁদ, বন্দুক! বন্দুক কি হবে রে?

—তিনটারেই খতম করুম।

—পাগল হয়েছিস হরিশ। মারব কেন ওদের?

হরিশ অবাক হয়ে যায়। কর্তা কি একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন? অন্য সময় হলে কর্তার সম্মান রেখেই সে কথা বলত—কিন্তু বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে সে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। বলে ওঠে, কী কইছেন কর্তা? বদ্লা নিবাম না?

কর্তা দৃঢ়স্বরে বলেন, না! বদ্লা নেবার কোন কথাই উঠছে না! ভুল ভুলই।

হরিশ হঠাৎ ক্ষেপে যায়। সেও দৃঢ়স্বরে বলে, রাখেন! আপনি বদ্লা না নেন আমি অগো ছাড়ুম না!

লালচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন এক পা। ঠাস্ করে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন হরিশের গালে। তারপর তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিলেন। গোয়ালের প্রান্তে পড়ে-থাকা মোটা ফাঁসের দড়িটা তুলে নিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যা! ক্ষমতা থাকে তো বদ্লা নে গে যা! বন্দুক নয়। ফাঁস দিয়ে বদ্লা নিতে হয়! বুঝেছিস্! কী? পারবি?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল হরিশ-মাঝি।

গণেশ এতক্ষণ আর কোন কথা বলে নি। এবার বললে—একেবারে অন্তস্বরে, করুণ সুরে, পুণ্ডুরে মাটি দিবলৈ যাবা না, দেউতা ?

লালচাঁদও শান্ত হয়ে যান। একেবারে অন্য সুরে বলেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ গণেশ-কাকা। হতভাগাটাকে কবর দেওয়া বাকি আছে।

প্রতিশোধ নিতে নয়, মাটির মানুষকে মাটির কোলে ফিরিয়ে দেবার জন্য আবার যেতে হল ঘটনাস্থলে। মাহুতদের পোড়ানো হয় না, কবর দেওয়াই ওদের রেওয়াজ। প্রতিশোধ কিসের ? সদ্যোজাত সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য হস্তিজননীর এ তো স্বাভাবিক বৃত্তি! মারবার অধিকার তোমার আছে, তাই বলে কি বাঁচবার অধিকার ওদের নেই ? ভুল ভুলই। তার জন্য কার উপর রাগ করবেন লালচাঁদ ? কাকে দোষারোপ করবেন। আদি পুরুষ সোমুত্তর-এর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে এসেছিলেন তিনি: মানুষের হাতে 'পাশ' আর হাতীর হাতে 'বজ্র'। দ্বৈরথ সমরে মৃত্যুর দাবী সমান-সমান! কখনও এ জেতে, কখনও ও। খেদায় হাতী শিকার করে এসেছে বড়গোঁহাই পরিবার—লক্ষ্মীমন্ত হয়েছে, জমিদার হয়েছে। কিন্তু কথা দেওয়া আছে: বছরে একদিন সমানে-সমানে দাঁড়াতে হবে হাতীর সামনে। কুলধর্মের প্রায়শ্চিত্ত! শত্রু-ভাবে ভজনা করতে হবে বজ্রপাণিকে, পাশ-সম্বল হয়ে। এবার সে খেলায় তিনি হেরে গেছেন! উপায় কি ?

পুণ্ডরীকের দলিত-মথিত মৃতদেহটা আহরণ করে আনতে কোন বেগ পেতে হয় নি ওঁদের। বন্যহস্তীরা ইতিপূর্বেই স্থানত্যাগ করেছে। মৃতদেহের যা অবস্থা হয়েছিল তাতে সেটাকে লক্ষ্মীর কাছে নিয়ে আসা যেত না। বস্তুত সেটাকে স্থানান্তরিত করা যায় নি। ঘটনাস্থলেই তার দেহাবশেষ কবর দেওয়া হল। সংকার সমাপ্ত করে ওঁরা ফিরে এলেন মোহনপুরে।

পরদিন সকালবেলা পদব্রজে লালচাঁদ এসে উপস্থিত হলেন মাহুত-পাড়ায়, মাথা নিচু করে, অপরাধীর মত সেই উদ্‌বাস্তু মেয়েটির কাছে তাঁর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি আছে। তার দেওয়া শাস্তি তিনি মাথা পেতে নিতে বাধ্য।

কিন্তু লক্ষ্মীর দেখা পেলেন না লালচাঁদ। লক্ষ্মী তার ছ'-মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে তার আগেই। না! শ্বশুরের ঘর সে করবে না! যে-শ্বশুর তার স্বামীকে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলতে পারে তার ঘর সে করবে না! সে কোথায় গিয়েছিল তা বলে যায় নি।

লালচাঁদ মাহুত-পাড়ায় এসে দেখলেন গণেশ-সর্দার একা বসে আছে তার দাওয়ায় উদাস দৃষ্টি মেলে। মা গেছে, দুই বউ গেছে, ছেলে গেছে—এবার বেটার বউও নাতনিকে নিয়ে চলে গেল। গণেশ-সর্দার অজয়-অক্ষয় আয়ু নিয়ে পড়ে আছে তার শূন্য ঘরে!

দেউতাকে দেখে সে বুকফাটা হাহাকার করে উঠল।

না। পুত্রের শোকে নয়, পুত্রবধূর গৃহত্যাগে নয়, এমন কি নাতনিকে হারানোর দুঃখেও নয়। দুর্বোধ্য ভাষায় সে যা বলল তার অর্থ: ছোটগিন্নি অনশনে বুঝি আত্মহত্যা করতে বসেছে! কিছুই সে মুখে দিচ্ছে না। কেউ তাকে খাওয়াতে পারছে না! কেমন করে জানি অবোলা জীবটা বুঝে নিয়েছে গণেশ-সর্দারই সব সর্বনাশের মূল।

হরিশ-মাঝির পাগলামিতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যেমন তাকে এক প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন—ঐ উদ্‌বাস্তু মেয়েটি যদি প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার লাল-চাঁদের গালে ঠিক অমনি করে একটা চড় কষাতো তবে যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা হত লালচাঁদের। তা সে করে নি। কোনও প্রতিবাদই সে করে নি। নীরবে নিঃশব্দে ছ'-মাসের কন্যাটি নিয়ে সে শুধু নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লালচাঁদকে ক্ষমা চাইবার অবকাশই সে দিল না।

লক্ষ্মীর কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ তাই পেলেন না। লালচাঁদ এসে হাজির হলেন হাতিশালে। ক্ষমা চাইলেন পুণ্ডরীকের ছোটগিন্নির কাছে। হাতজোড় করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মা রে, তুই আমাকে ক্ষমা কর! তুই যদি এমন পাগলামি করিস তবে আমরা সবাই যে মারা যাব। আমাদের কারও মুখে যে অন্ন রুচবে না, মা!

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস পড়ল ছোটগিন্নির। সে ক্ষমা করল বোধকরি লালচাঁদকে।

চতুর্দিকে চর পাঠালেন লালচাঁদ। খুঁজে ওকে বার করতেই হবে। মোহনপুর থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া বড় সহজ কথা নয়। রেল স্টেশন হাঁটা-পথে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। নদী আছে, নৌকা চলে না এখন। বাস্-এর সড়ক নেই কাছে পিঠে। ট্রাক আসে কাঠ নিয়ে যেতে—কিন্তু তাতে করে পালাবার চেষ্টা করলে সে ধরা পড়বেই। কারণ সব ক'টি লরির মালিককে উনি জানিয়ে রেখেছিলেন। ওঁর জমিদারীর কেন্দ্রস্থল এই মোহনপুর। যেদিকেই যাও বিশ-মাইলের আগে ওঁর এলাকার বাইরে পা দিতে পারবে না। সব গাঁয়েই খবর দেওয়া আছে—অসমীয়া বলতে পারে না এমন একটি বিশ-বাইশ বছরের বিধবা

মেয়ে ছ'-মাসের শিশুকন্যা নিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিলেই তিনি খবর পাবেন। তাহলে? মেয়েটি কি আত্মহত্যা করল? শিশুকন্যা সমেত?

রাত্রে ঘুম হয় না লালচাঁদের! বারে বারে তাঁর মনে পড়ে যায় সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যাটির কথা। সাদা-কালো চৌকা পাথরের মেঝেতে বসে ঐ মেয়েটি যখন দৃঢ়কণ্ঠে অভিযোগ এনেছিল, বলেছিল: এ আপনাদের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাদা-কালো চৌখুপি-ঘর-কাটা মার্বেলের মেঝেটার যেখানটিতে সেদিন মেয়েটি বসেছিল সেই শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে ওঁর মনে হত—ঐ মেয়েটি কি ছিল একটা দাবার ঘুঁটি? কোণাকুণি ছুটে এসে গজ যে তাকে আক্রমণ করে বসতে পারে এটা সে খেয়াল করে নি? ইচ্ছে করে, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে কোথাও বেরিয়ে চলে যান কিন্তু তারও যে উপায় নেই। দাবার রাজা মাত্র একটি ঘরই যেতে পারে। নিজ এলাকায় সামান্য পরিসরে ঘুরে মরছেন আজীবন—দূরে যেতে পারেন না তিনি। খেলার আইন সে-অনুমতি দেবে না তাঁকে। আর এখন তো তিনি একেবারে চলৎশক্তি হীন। মেয়েটি যেন চালমাৎ করে গেছে রাজাকে!

শেষ পর্যন্ত তার সন্ধান পেয়েছিলেন দেড় বছর পরে। ওঁর এলাকার বাইরে যায় নি লক্ষ্মী—আছে সা'গঞ্জে মজুমদার-মশায়ের বাড়িতে। মজুমদার-মশাই হচ্ছেন সাহাগঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জার। তাঁর বাড়িতেই মেয়েটি ঝি-গিরি করছে।

মজুমদার-মশাই লালচাঁদের অপরিচিত নন। পরদিনই গণেশ-সর্দারকে নিয়ে ছোটগিন্নির পিঠে তিনি রওনা হয়েছিলেন সা'গঞ্জে।

কিন্তু দেখা হয় নি। দেখা করে নি লক্ষ্মী। আপ্যায়ন করে মজুমদার-সাহেব লালচাঁদকে বসিয়েছিলেন তাঁর ড্রইংরুমে। গণেশ-সর্দার উবু হয়ে বসেছিল বাইরের বারান্দায়—আর ছোটগিন্নি দাঁড়িয়েছিল বাগানের বাইরে একটা ঝাঁকড়া রেইনট্রি গাছের তলায়। মজুমদার-সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা বারে বারে অনুরোধ করেছিলেন লক্ষ্মীকে; কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হয় নি তার শ্বশুর অথবা জমিদার লালচাঁদের সম্মুখে আসতে। শুধু তাই নয় দু'বছরের মেয়েটিকেও সে দেয় নি দাদুর কাছে যেতে। লালচাঁদকে রেঞ্জার-সাহেব বলেছিলেন, মেয়েটি যে মাহুত-ঘরনী তা আমি আদৌ জানতাম না। আমার ধারণা ছিল ও পূর্ববঙ্গের মেয়ে, উদ্‌বাস্তু।

—দুটোই ঠিক। উদ্‌বাস্তু হিসাবেই সে প্রথমে এসেছিল মোহনপুরে।

একেবারে একা—নিঃস্ব হয়ে। তারপর আমার বাবার আমলের হেড জমাদার, ঐ গণেশ-সর্দারের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। হাতী-শিকারের সময় স্বামী মারা যায়—আমার চোখের সামনেই। খুব স্যাড কেস। আমি নিজেকেই এজন্য পরোক্ষভাবে দায়ী মনে করি।

—সে তো বুঝতে পারছি। আপনি মহানুভব—তাই নিজে থেকে ওকে নিয়ে যেতে এসেছেন—

বাধা দিয়ে লালচাঁদ বলে ওঠেন, না না, অমন করে বলবেন না। আমি ওর সর্বনাশ করেছি। সে ক্ষতির পরিপূরক নেই। তবু মেয়েটি যাতে কষ্টে না পড়ে, তার সন্তানকে মানুষ করতে পারে তাই ছুটে এসেছি আমি!

—আমিও তো তাই বলছি মিস্টার বড়গোহাই। হস্তী-ব্যবসায়ীদের কি আর আমি চিনি না? 'কম্পেনসেশন' নিজে থেকে কেউ কখনও দিতে আসে? চেয়ে-চিন্তেও ওরা আদায় করে উঠতে পারে না।

মোটকথা লক্ষ্মী কিছুতেই দেখা করতে রাজী হল না।

মজুমদার-সাহেব বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত; কিন্তু সে নিজে থেকে দেখা করতে না চাইলে আমি কি করতে পারি বলুন? সে দেখা-তো করবেই না, আপনার দেওয়া কোন সাহায্যও সে নেবে না তা আমার স্ত্রীকে সে জানিয়ে দিয়েছে।

লালচাঁদ যেন চুরি করেছেন। চারিদিকে উঁকি মেরে একবার দেখে নেন। না, কেউ লক্ষ্য করছে না ওঁদের। এক তাড়া নোট মিস্টার মজুমদারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, ও যেন জানতে না পারে। আপনি ওর মাইনে বাড়িয়ে দিন। বাচ্চাটাকে খেলনা কিনে দিন—ওর শাড়ি-জামা যা লাগবে—

মজুমদার-সাহেব আপত্তি জানিয়ে বলেন, কাজটা কি ঠিক হবে? মেয়েটিকে না জানিয়ে—

ওঁর হাত দুটি চেপে ধরে লালচাঁদ বলেন, কাকপক্ষীতে টের পাবে না। শুধু আপনি জানলেন আর আমি। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। প্লীজ—

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মজুমদার-মশাই ওঁদের সে রাত্রে থেকে যেতে বললেন; কিন্তু রাজী হলেন না লালচাঁদ। বললেন, লক্ষ্মী যদি গণেশ-কাকার সামনে আসত—বুক-ফাটা কান্না কাঁদত, তাহলে নিশ্চয়ই আমি থেকে যেতাম মজুমদার-সাহেব। আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতাম। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। এখানে যতক্ষণ থাকব, ঐ বুড়োটার বুকের উপর পাথর চেপে থাকবে।

তাছাড়া মেয়েটার কথাও ভাবুন। আমরা যতক্ষণ না চলে যাব তারও মনের ভিতর মুচড়ে মুচড়ে উঠবে। আমরা চলে গেলে বোধহয় মেয়েটা বুক-ফাটা কান্না কেঁদে মনটা হাল্‌কা করবে। আমাদের যেতে দিন।

—কিন্তু সা'গঞ্জ থেকে কুকড়াহাটি যাবার পথে যে জঙ্গলটা পড়ছে সেখানে একটা ম্যান-ঈটার বেরিয়েছে। রাত করে—

হাসলেন লালচাঁদ। ফোর-ফিফ্‌টিফোর হাণ্ড্রেড ডব্‌ল্‌ ব্যারেলটার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, তা হোক—

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখনও গোধূলির শেষ আলো মুছে যায় নি। পায়ে পায়ে ওঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেকটা বাগান পার হয়ে বড়-রাস্তায় এসে হাতীতে উঠতে হবে। রেঞ্জার-সাহেবের বাগানের গেটটা জীপ ঢোকার মত চওড়া, হাতী ঢোকার মত উঁচু নয়। উপরে মাধবীলতার মঞ্চ গেটের এ-প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে ও-প্রান্তের সঙ্গে। ছোট-গিন্নিকে তাই বাগানের বাইরেই রেখে এসেছিলেন।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন লালচাঁদ। ওঁদের থামতে ইঙ্গিত করেন। মজুমদার-সাহেব চম্‌কে ওঠেন ওঁর ভঙ্গিতে। সাপ নাকি? বাগানের হাতায় আর কোন জন্তু তো আসবে না।!

না। জন্তু নয়—লক্ষ্মী!

ছোটগিন্নির শুঁড়টা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদছে লক্ষ্মী।

আশ্চর্য! জমিদার অথবা শ্বশুরকে প্রত্যাখ্যান করলেও ছোটা-মাঈয়ের কাছে বুকভাঙা কান্না উজাড় করে দিতে সঙ্কোচ করে নি লক্ষ্মী। পুণ্ডরীকের বড় প্রিয় হাতী ছিল এই ছোটামাঈ। সে তাকে খাওয়াত, নাওয়াত, তার সঙ্গে আগড়ম-বাগড়ম গল্প করত! দীর্ঘ দু'বছর পরেও ছোটামাঈ অনায়াসে চিনে নিয়েছিল পরিচিত লক্ষ্মীর গায়ের গন্ধ। ওর গায়ে মাথায় শুঁড় বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল এতক্ষণ! দু'জনের একই দুঃখ! ওরা সতীন নয়,—একই ব্যথার ব্যথী!

লালচাঁদের চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত তখনও বাকি ছিল তাঁর।

দিন-সাতেক পরে তাঁর কাছে এল একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি। পাঠিয়েছেন সা'গঞ্জের ফরেস্ট-রেঞ্জার মজুমদার-সাহেব। খামের ভিতর তাঁর চিঠি আর একটি ব্যাঙ্ক-ড্রাফট। লিখেছেন, 'আমি সেদিনই বলেছিলাম বড়গোঁসাই সাহেব, কাজটা ভাল হল না। লক্ষ্মী কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে।

কোথায় গেছে জানি না। সে বুঝতে পেরেছিল, আপনার দেওয়া টাকাই ওকে দিতে গিয়েছিলাম আমি।'

ব্যাঙ্ক-ড্রাফট ছাড়া খামের ভিতর ছিল বাঁকা বাঁকা মেয়েলি হাতের একটি চিঠি :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার 'শিকার-শিকার খেলায়' শ্বশুরের ভিটে থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলাম। আপনার 'সহানুভূতির খেলায়' এবার মজুমদার-সাহেবের নিরাপদ আশ্রয় থেকে উচ্ছেদ হলাম। আপনি আমাকে রেহাই দেবেন কি ?"

চড় নয়, চাবুক মেরেছে এবার !

আত্মগ্লানিতে ছটফট করতে থাকেন। ভাবেন এই ওঁর শাস্তি. এভাবেই হবে ওঁর প্রায়শ্চিত্ত ! আর খোঁজ করেন নি লক্ষ্মীর।

কিন্তু মেয়েটি নিজ থেকেই ধরা দিলে আরও বছর তিনেক পরে। গৌহাটি সরকারী হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লালচাঁদকে জরুরী চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে. তাঁর হাসপাতালের একটি মরণোন্মুখ রোগিণী তার একমাত্র আত্মীয় বলে স্বীকার করছে—মোহনপুরের গণেশ-সর্দারকে।

আবার ছুটে গিয়েছিলেন লালচাঁদ গণেশ-সর্দারকে নিয়ে। এবার ঐ কাঁসিয়াড আর সাকরেদের ঠাঁই বদল হয়েছে। কর্তা-মশাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন হাসপাতালের বাইরের বারান্দায়—আর ছানি-পরা দু'চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ফিমেল-ওয়ার্ডে ঢুকে গেল গণেশ। একটু পরেই এল সে। তার বিচিত্র ভাষায় বললে, ভিতরে যান দেউতা, লক্ষ্মী আপনাকেই খুঁজছে। কথা বলতে পারছে না, কিন্তু জ্ঞান আছে।

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে ঘরে প্রবেশ করলেন লালচাঁদ।

জেনারেল ওয়ার্ড নয়, ছোট্ট একটা কেবিন। মৃত্যু আসন্ন বুঝে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে ওকে সরিয়ে আনা হয়েছে। অন্যান্য রোগীর চোখের সম্মুখে মৃত্যুটা বাঞ্ছনীয় নয়—তাতে আর পাঁচটা রোগীর মনোবল কমে যায়। বিছানার উপর পড়ে আছে লক্ষ্মী—না, লক্ষ্মী নয়, তার কঙ্কাল। চেনাই যায় না তাকে। আর তার বিছানার পাশে টুলের উপর টুমটুম হয়ে বসে আছে ইজের-পরা উদাম-গা একটি রুক্ষচুল অনাহারজীর্ণ বাচ্চা মেয়ে !

লালচাঁদ ঝুঁকে পড়লেন মৃত্যুপথযাত্রিণীর দিকে। বললেন, কষ্ট হচ্ছে মা ?

মেয়েটির দু'চোখের কোল বেয়ে নেমে এল অশ্রুর একটা ধারা।

মাথা নেড়ে জানালো, না !

—কিছু বলবে আমাকে ?

মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ !

নার্স পাশ থেকে বললে, কথা বন্ধ হয়ে গেছে ওর !

বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল লালচাঁদের। এতদিন পরে অভিমানী মেয়েটা তাকে কিছু বলতে চায়, অথচ আজ আর তার সে শক্তি নেই। লক্ষ্মী আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিছু একটা বলতে—পারছে না !

হঠাৎ খেয়াল হল লালচাঁদের। ধূলিমলিন মেয়েটিকে টপ্ করে কোলে তুলে নেন, বলেন, কুহুর কথা বলতে চাইছ কি ? ওর জন্যেই তোমার ভাবনা ?

ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

দু'হাতে বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কুহু আজ থেকে আমার মেয়ে। কোন চিন্তা ক'র না তুমি। ওকে আমি নিলাম, ওর সব দায়িত্ব আমার।

আরামে চোখ বুঁজল লক্ষ্মী।

আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লালচাঁদ বললেন, আমাকে বলে যাও ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে গেলে কিনা সে-কথা বলে যাও লক্ষ্মী !

চোখ খুলে তাকালো এবার।

—আজ পাচবছর আমার ঘুম নেই মা ! ইষ্টস্মরণ করতেও পারি না ! চোখ বুঁজলেই আমি তোমার মুখখানা দেখতে পাই। তোমার মার্জনা না পেলে মরেও যে আমার শান্তি নেই লক্ষ্মী।

ম্লান হাসল এতক্ষণে ! আবার চোখ বুঁজল। আরামে।

এবার নিশ্চিন্তে ঘুমাবে উদ্‌বাস্তু মেয়েটি। এতদিনে সে স্থায়ী বাস্তু পেয়েছে ! আর উদ্‌বাস্তু হবে না !

লালচাঁদ ছুটে বেরিয়ে এলেন। মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে তার কোলে। ওকে কিছু খাওয়াতে হবে, স্নান করাতে হবে, নতুন জামাকাপড় কিনে পরাতে হবে। কিন্তু এসব যে কিছুই জানেন না তিনি। কি করে কি করবেন ? বলেন, গণেশ-কাকা, এতটুকু মেয়েকে নিয়ে কি করি বল তো ?

গণেশ ওঁর কোল থেকে ঘুমন্ত শিশুকে নিজের কোলে তুলে নেয়। দু'বছর আগেকার কথাটাই পুনরুক্তি করে : লক্ষ্মীরে মাটি দিবলৈ যাবা না, দেউতা ?

চকিতে মনে পড়ে যায় লালচাঁদের—হ্যাঁ, ঠিক কথা। ঠিকই বলেছে গণেশ-কাকা ! লক্ষ্মীকে কবর দেওয়ার কাজটা বাকি আছে বটে !

ক্যুভিয়ে বলল, পণ্ডিতজী, আগের দিন আপনি যে আলোচনা করেছিলেন তা শুনে আমার মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে—

পণ্ডিতজী অভ্যাস-মতো তাঁর চশমা-জোড়া খুলে কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, করেক্ট। আগের দিন কোশ্চেন-আওয়ার্সের আগেই আমাদের ক্লাস শেষ হয়েছিল। বলুন—

—প্রথমতঃ, ম্যাস্টডনের সেই দাঁতের ছবিটা। আপনি বলেছিলেন সেটা ম্যাস্টডনের একপাটি দাঁত, একটা দাঁত নয়। মানুষের একপাটি দাঁত দেখতে দেখতে পাই, বাঁধানো দাঁত হলে, অথবা গোটা চোয়ালের অস্থি হলে। ম্যাস্টডনের পাশাপাশি তিনটি দাঁত অমন জুড়ে গেল কি করে?

পণ্ডিতজী বলেন, সঙ্গত প্রশ্ন। ছবিটা ম্যাস্টডনের নিচের এক দিকের চোয়ালের গোটা দাঁতের পাটি। হাতীর গজদন্ত ছাড়া চিবানোর জন্য যে দাঁত আছে তার সম্বন্ধে এবার বলি। মানুষের মত একটা-একটা আলাদা দাঁত ওদের গজায় না। চোয়ালের এক-এক দিকে একপাটি দাঁত গজায়। সারা জীবনে হাতীর সর্বসমেত চব্বিশটি অমন দাঁত গজায়। উপরে ও নিচের চোয়ালে, ডাইনে ও বাঁয়ে তাহলে এক-এক দিকের ভাগে পড়ল ছ'খানা করে। কিন্তু জীবনের যে-কোন পর্যায়ে হাতী মাত্র ঐ-রকম চারটি দাঁত ব্যবহার করে। মানুষের যেমন দুধে-দাঁত গজায়, হাতীরও তেমনি প্রথমে চারটে দাঁত গজায়, এক-এক চোয়ালে এদিকে একটি ওদিকে একটি। এই চারটি দাঁত ব্যবহারে যখন ক্রমশঃ ক্ষয়ে আসে, ঠিক মানুষের মতই তাদের তলায় আবার চারটি নতুন দাঁত দেখা দেয়। ঐ চারটি দাঁত যখন মাড়ি ভেদ করে উদ্‌গত হয় তখন দুধে-দাঁত চারটি পড়ে যায়। সেই চারটি নতুন দাঁতের পাটি যখন ক্ষয়ে আসে তখন আবার চারটে নতুন দাঁত উদ্‌গত হয়। এভাবে প্রতিটি চোয়ালের এক-এক দিকে সারা জীবনে ওদের ছ'বার দাঁত গজায়। প্রতিবারই পুরাতন দাঁতের চেয়ে নূতন দাঁত আকারে বড় হয়, কারণ চোয়ালটাও বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকারে বেড়েছে। এই হিসাবে চার-ছয় চব্বিশটি দাঁত গজাবার পরেও যদি হাতী বেঁচে থাকে তখন আর তার চিবানোর উপযুক্ত দাঁত থাকে না। হাতী চর্বণ-দন্তহীন হয়ে পড়ে প্রায় ষাট-বছর বয়সে। তারপর আর সাধারণতঃ ওরা বাঁচে না। খনার বচন 'নরাগজা বিশে শয়' হলেও—মানুষও যেমন একশ'বিশ বছর কদাচিৎ বাঁচে, হাতীও সচরাচর অতদিন বাঁচে না। হাতীর বয়স সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই অতিরঞ্জিত খবর পাই।

ক্যুভিয়ে বলে, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে। আপনার আগের

দিনের বক্তব্যের সঙ্গে বিবর্তবাদের মূল প্রতিপাদ্যের একটা অসঙ্গতি আমার নজরে পড়েছে।

পণ্ডিতজী উৎসাহিত হয়ে বলেন, কি রকম?

—'থিওরি অফ এভোলিউশান', মানে বিবর্তনবাদের মূল কথা হচ্ছে—জীব দুনিয়ায় টিকে থাকতে চায়। বেঁচে থাকার তাগিয়ে নিজের অজান্তে তারা বংশানুক্রমিকভাবে বিবর্তিত হয়। জেব্রার গায়ের ডোরা-কাটা দাগ, জিরাফের গলার দৈর্ঘ্য, মোষের শিঙ, বাঘের নখ বা দাঁত, এমন কি গঙ্গাফড়িঙের গায়ের রঙ সবই হয়েছে ঐ বিবর্তনের জন্য—বেঁচে থাকার তাগিদে। অথচ আপনি যে-সব জীবের বর্ণনা দিয়েছেন তাদের দেহ তো সেভাবে বিবর্তিত হয় নি! ডাইনো-থেরিয়ামের উল্টো-দিকে-বাঁকা দাঁতের প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন ও-দুটো দাঁত ওদের কোন কাজেই লাগত না, এ্যানান্‌কাসের প্রসঙ্গে মৌচকুন্দ-সর্দারের গল্প আপনার মনে পড়ে গিয়েছিল—অতবড় দাঁত নিয়ে তারা লড়াই করতে পারত না। তাছাড়া ম্যামথের দাঁত দুটি এমনভাবে বাঁক নিত যাতে লড়াই করা যায় না। এই সব তথ্য বিবর্তনবাদের বিপক্ষে যাচ্ছে না?

—এক্‌সেলেণ্ট। এক্‌সেলেণ্ট! আপনি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন ব্যারন ক্যুভিয়ে। কী কুহু? তুমি কিছু বলতে পার এ সম্বন্ধে?

কুহু বললে, আমার মনেও দুটি প্রশ্ন জেগেছে। প্রথমতঃ, হাতীর শুঁড় বা দাঁত ওভাবে গজালো কেন, দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় হাতী এত প্রকাণ্ড শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তুমি কেন বললে হস্তী-বংশ পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—

—জাস্ট এ মিনিট। জাস্ট এ মিনিট। তুমি দুটো প্রশ্ন পেশ করবে বলেছিলে, কিন্তু আসলে পেশ করলে চারটে প্রশ্ন। এক নম্বর, হাতীর শুঁড় জন্মালো কেন? দুই, জীব-বিবর্তনের কোন তাগিদে তার দুটি দাঁত অত বড় হয়ে গেল? তিন, মহাশুণ্ডিবংশীয়দের দেহ ক্রমশঃ কেন বড় হয়ে গেল এবং চার নম্বর প্রশ্ন—এই শক্তিশালী স্তন্যপায়ী জীবটি কেন ক্রমশঃ অবলুপ্ত হচ্ছে! বেশ, এ সব প্রশ্নের জবাব আমি দেব। কিন্তু আমার প্রশ্নটা তা ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ব্যারন ক্যুভিয়ের প্রশ্নটি সম্বন্ধে তোমার কি মতামত?

কুহু বলে, ওটার জবাব আমি জানি না।

পণ্ডিতজী বলেন, বেশ, এবার একে একে আলোচনা করি। প্রথম কথা: শুঁড়। আমরা আগেও এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, মহাশুণ্ডিবংশীয়দের আদিপুরুষ মরিথেরিয়ামের কোন শুঁড় ছিল না। এই

মরিথেরিয়ামেরা প্রায় চার-কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। শুঁড় না থাকায় তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। কারণ তারা আকারে ছিল ছোট, অনেকটা আজকের দিনের শুয়োরের মত হবে উচ্চতায়। কেন পরবর্তী মহাশুণ্ডিরা আকারে বড় হয়ে উঠল তা বলেছি। ধারে না হলেও তারা ভারে কাটতে চাইল। তখন মাটি থেকে খাবার তুলে নিতে তাদের অসুবিধা হল। জিরাফ, হরিণ, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুরা এ সমস্যার সমাধান করেছিল—গলাটাকে লম্বা করে। মহাশুণ্ডিরা তা করতে পারল না, কারণ দেহের তুলনায় এদের মাথাটাও যে বেড়ে গেল বেয়াড়া-রকমভাবে। বলবিদ্যা বা মেকানিক্সের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে, অতবড় মুণ্ডুকে যদি লম্বা ঘাড়ের সাহায্যে ওঠাতে-নামাতে হয় তবে ঘাড়ের কাছে মাংসপেশীতে এবং হাড়ে তার টান (strain) এবং ভ্রামক (moment) অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়ে। অথচ তাড়াতাড়ি মাথা নামাতে-ওঠাতে এবং নাড়াতে না পারলে তারা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। হরিণ বা ঘোড়ার তুলনায় খাদ্যদ্রব্য থেকে ওদের মুখের দূরত্ব এবং মাথার ওজন দুটোই যে বেড়ে গেছে। তাই ঘাড়টা লম্বা হলে হরিণ বা ঘোড়ার মত চকিতে গ্রীবা-সঞ্চালনের ক্ষমতা ওদের থাকত না। এ অবস্থায় বিবর্তনের তাগিদে মুখটাকে লম্বা করা ছাড়া মহাশুণ্ডির আর উপায়ান্তর কি ছিল বল? বেলচা-দাঁতো বা খনিত্রদন্তীদের উপর-নিচ দুটি চোয়ালই বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ক্রমশঃ এই মহাশুণ্ডিরা প্রণিধান করল—নিচের চোয়ালটা বড় হয়ে যাওয়ায় তাদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বাড়ছে। বরং উপরের ঠোঁটটা লম্বা করতে পারলে সহজেই মাটি থেকে খাবার তুলে নেওয়া যায়। তাই ক্রমশঃ নিচের চোয়ালের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে উপরের ঠোঁটটা আকারে বড হয়ে গেল। শুধু ঠোট নয়, নাক-সমেত ঠোঁটটা। অধরপ্রান্ত বৃদ্ধি বন্ধ হল—অধর-বৃদ্ধিতে খাদ্যদ্রব্য অধরাই থেকে যাচ্ছে। বৃদ্ধি হল নাসিকৌষ্ঠ! এই দীর্ঘায়ত নাসিকা-যুক্ত-ওষ্ঠই হল শুঁড়। কিন্তু নাসিকা কেন? কারণ ইতিমধ্যে ঐ জীবটি দেখেছে শুঁড়টা উঁচুতে তুলে স্থানীয় ফুল-ফলের গন্ধকে এড়িয়ে বহুদূর থেকে ভেসে-আসা শত্রুর দেহগন্ধ ওরা বুঝে নিতে পারছে। ঘ্রাণশক্তিটাও তাই ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটা কথা বলে রাখি,—কুহু, তোমাকেই বলছি, ব্যারন ক্যুভিয়েকে নয়—কোন একটা বিশেষ মহাশুণ্ডি বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বা সজ্ঞানে এভাবে নিজের শুঁড় বড করার চেষ্টা করে নি—বিবর্তনবাদ তা বলে না—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের তাগিদে আপনা থেকেই এমনটা ঘটেছে!

কুহু বলে, আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা বরং আমি তুলে নিচ্ছি—অর্থাৎ শুঁড়ের মত সামনের দাঁতদুটো ওদের কেন বেড়ে গেল তা আমি বুঝতে পেরেছি।

পণ্ডিতজী হেসে বলেন, মোটেই বুঝতে পার নি। কারণ এ প্রশ্নটার সঙ্গে আরও অনেকগুলি প্রসঙ্গ জড়িত। এর সমাধান অত সহজে হবার নয়।

—কেন নয়?

—বেশ, আমাব প্রশ্নের জাবাব দাও তাহলে। আমি মেনে নিচ্ছি—কোন কোন ক্ষেত্রে দাঁত বড হওয়ায় মহাশুণ্ডিদের সুবিধা হয়েছিল। সেটা হয়েছিল তাদের লডাইয়েব মোক্ষম হাতিয়ার; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তো তা হয় নি। যেমন এ্যানান্‌কাসের বেয়াডা রকম লম্বা দাঁত, যার ভারে বেচারি সহজে ঘাড ঘোরাতেই পাবত না, কিংবা ডাইনোথেরিয়ামের উল্টোদিকে বাঁকা দাঁত, অথবা ম্যামথের বলয়াকৃতি দাঁত। এভাবে আত্মঘাতী বিবর্তন কোন কোন ক্ষেত্রে কেন হল?

ক্যাভিয়ে প্রতিবাদ করে। বলে, এ আপনার অন্যায় হচ্ছে পণ্ডিতজী। এ প্রশ্ন আমি আগেই করেছি। আপনি তার জবাব না দিয়ে সেটা কুহু দেবীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন!

পণ্ডিতজী হেসে বলেন, আমি কেন চাপাব? ও তো নিজে থেকেই এ দায় ঘাড়ে নিচ্ছে।

কুহু বলে, আচ্ছা, তাহলে সেই ব্যাপারটাই আগে বুঝিয়ে দাও। সত্যিই. কেন এমন হয়? ম্যামথের কথা আমি জানতাম না, কিন্তু অনেক বুড়ো মোষের শিং ঐভাবে বাঁকতে দেখেছি। শিং যখন আত্মরক্ষার অস্ত্র তখন মোষের ক্ষেত্রেই বা অমনভাবে সেটা বাঁকে কেন?

পণ্ডিতজী বলেন, বলছি। এ সম্বন্ধে বিবর্তনবাদীরা দুটি ভিন্নমত পোষণ করেন। একদল বলেন, আমরা মনে করছি বটে যে, এতে ওদের অসুবিধা হত, কিন্তু আসলে নিশ্চয় তা হত না—কারণ বিবর্তনবাদের মূল প্রেরণাই হচ্ছে 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট'। অর্থাৎ প্রতিটি জীব জীবন-যুদ্ধে জিতবাব জন্যই তিল তিল করে বিবর্তিত হচ্ছে। দ্বিতীয় দল বলেন, না,—বিবর্তনের পথে কোন একটা অঙ্গ বাডতে বাডতে সেটা বাঞ্ছনীয় পরিমিতির সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। 'সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্' নীতিতে সে-ক্ষেত্রে নিজের ভালর জন্য যেটা এতদিন হচ্ছিল সেটা পরিমিতি-সীমা লঙ্ঘন করায় আত্মবিনাশের কারণ হতে পারে।

—আপনি এই দুই মতের কোন্‌টা বিশ্বাস করেন?

—কোনটাই নয়। দুটোই ভ্রান্ত বলে মনে করি আমি। প্রথমটা যুক্তি দিয়ে, বোধ দিয়ে মানতে পারছি না বলে। বিজ্ঞান অমন আপ্তবাক্য মেনে দিতে রাজী নয় বলে। কুহু যে উদাহরণ দিল—বুড়ো মোষের জোড়া-শিং অথবা ঝুলে-পড়া শিং সেটা অসুবিধাজনক হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ বুঝতে পারছি বলে। দ্বিতীয় মতটা তো একেবারেই মেনে নেওয়া চলে না। কারণ, দেখা গেছে ঐসব অসুবিধা যে-সব জীবের দেহে লক্ষ্য করা গেছে তারা তা সত্ত্বেও অতি দীর্ঘদিন এ পৃথিবীতে টিকে ছিল। ম্যামথেরা অনেকদিন টিকে ছিল, এ্যানান্‌কাস আর ডাইনোথেরিয়ামও দীর্ঘদিন টিকে ছিল দুনিয়ায়। তোমরা ছোরা-দেঁতো বাঘের কথা শুনে থাকবে—ইংরাজিতে তাকে বলে 'সাব্‌র-টুথেড টাইগার' —তারা ঐ অকেজো এবং অসুবিধাজনক দাঁত নিয়ে না-হক চার-কোটি বছর পৃথিবীতে টিকে ছিল।

ক্যাভিয়ে বলে. তবে কি এটা বিজ্ঞানের একটা অমীমাংসিত সমস্যা?

পণ্ডিতজী বলেন, না। দুটি ছাড়া আরও একটা থিয়োরি আছে। সেটা এবার বলি। কিন্তু তার আগে তোমাদের একটা কথা বলব। জীব-বিবর্তনের প্রেরণায় জীবের দেহে যে পরিবর্তন হয় তাব মূল উদ্দেশ্য কোন একটি প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচিয়ে রাখা নয়, বংশগতভাবে বাঁচিয়ে রাখা—ইণ্ডিভিজুয়াল নয়, স্পেসিস্‌টাকে টিকিয়ে রাখা।

ক্যাভিয়ে প্রতিবাদ করে, আপনার বক্তব্যটা স্বয়ং-বিরোধী হয়ে পড়ছে না কি? এককভাবে জীবটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই তো সমষ্টিগতভাবে জীবটা বেঁচে থাকবে? ব্যক্তি নিয়েই তো সমষ্টি।

—না! ঐখানেই ভুল হচ্ছে তোমাদের। আর তাই এ সমস্যার প্রকৃত সমাধানটা কিভাবে হবে তা বুঝে উঠতে পারছ না। বুঝিয়ে বলি। শোন: আমরা এ পর্যন্ত যে ক'টি উদাহরণ দিয়েছি—অর্থাৎ ছোরা-দেঁতো বাঘের শ্ব-দন্ত, এ্যানান্‌কাসের অতিদীর্ঘ দন্ত, ডাইনোথেরিয়ামের উল্টোদিকে বাঁকা দাঁত, অথবা ম্যামথের বলয়াকৃতি গজদন্ত কিংবা বুড়ো মোষের জোড়া-শিং—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ সবগুলিই পরিলক্ষিত হচ্ছে সেই জীবটির বৃদ্ধ বয়সে। যৌবনকালে ঐ অঙ্গ নিশ্চয় ও-ভাবে বাড়ত না। পরিণত বয়সেই ঐ অবস্থা হত তাদের। ধরা যাক একটি বিশেষ এ্যানান্‌কাসের কথা। মধ্যবয়সে ঐ বিশেষ এ্যানান্‌-কাসের দাঁত এতবড় হয়নি যাতে সে তা-দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে না; তারপর যখন বুড়ো হয়ে গেল তখন দাঁতের ভারে তার মাথাটা ভারি হয়ে গেল। কিন্তু ততদিনে ঐ বৃদ্ধ এ্যানান্‌কাসটি প্রজনন-ক্ষমতাও হারিয়েছে। জাতিগতভাবে

সেই বৃদ্ধ এ্যানান্‌কাসটি তখন নিজ স্পেসিস্‌-এর কাছে, জাতির কাছে বোঝা মাত্র। সে বেঁচে থেকে অন্যান্য অল্পবয়সী স্বজাতীয়দের খাদ্যে ভাগ বসাচ্ছে মাত্র। বিবর্তন যেহেতু জাতিগতভাবে এ্যানান্‌কাস-স্পেসিস্‌টাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তাই সে ঐ অবাঞ্ছিত বৃদ্ধ বিশেষ-এ্যানান্‌কাসটিকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছুক। ফলে, বৃদ্ধ বয়সে দাঁতের ঐ অতিবৃদ্ধি বিবর্তনের সুরে সুর মেলানো! তুমি যে মোষের শিং-এর কথা বললে, খোঁজ নিয়ে দেখ সে-ও বৃদ্ধ। মধ্যবয়সী মোষের শিং অমন বিশ্রীভাবে বাঁকে না, বা ঝুলে পড়ে না। বৃদ্ধ ম্যামথ, ডাইনো-থেরিয়াম বা ছোরা-দেঁতো বাঘ বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বুঝতে পারত না যে, দুনিয়ায় তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই তাদের ঐ দুর্দশা। পারলে তারাও হয়তো বলত :

"তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ।"

কুহু বলে, ভারি আশ্চর্য তো!

—তা বলতে পার। তলিয়ে দেখলে কোন অসঙ্গতি নেই। এবার আমরা শেষ দুটি প্রশ্নের প্রসঙ্গে আসতে পারি—অর্থাৎ মহাশুণ্ডিরা কেন ক্রমশঃ বৃহদায়তন হয়ে গেল। আর কেনই বা তা সত্ত্বেও ঐ মহাবিক্রম-জীবটি অবলুপ্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। এ-দুটি প্রসঙ্গ পরস্পর-সংযুক্ত, তাই এক সঙ্গেই আলোচনা করি—

সাধারণভাবে বলা চলে যে, দেহাবয়বের বৃদ্ধি বিবর্তনের একটি সাধারণ প্রেরণা। যে জীব আকারে বৃহত্তর, আত্মরক্ষার সুবিধা তার তত বেশি। বাঘ, সিংহ, সাপের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা হাতীকে সহজে কাবু করতে পারে না শুধু তার প্রকাণ্ড দেহটার জন্য। জুরাসিক পিরিয়ডে, মানে মধ্য-জীবীয় কল্পে ঐ প্রেরণাতেই সরীসৃপের দেহ ক্রমবৃদ্ধির পথে জন্ম দিয়েছিল অতিবৃহৎ ডিপ্‌লোডকাস, স্টেগসরাস, ইগুয়ানাডোন প্রভৃতিকে। তাছাড়া শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী হলে প্রকাণ্ডদেহীরা বেশি-পরিমাণে তাপ সংরক্ষণ করতে পারে। ফলে মহাশুণ্ডিরাও বিবর্তন-পথে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। যদিও অবয়বের বৃদ্ধি সাধারণভাবে জীবের পক্ষে

কল্যাণকর, তবু একথা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত সত্য। সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে দেখা যাবে দেহবৃদ্ধিতে তাদের ক্ষতিই হচ্ছে। অবয়ব-বৃদ্ধির পরিপূরক হিসাবে সেই জীবকে কিছু অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। প্রচুরতর খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। শ্লথগতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহির্বিশ্বে কোন পরিবর্তন এলে প্রকাণ্ডদেহীদের পক্ষে অসুবিধা হয় বেশি করে। আমরা জানি, জুরাসিক পিরিয়ডে অতিকায় সরীসৃপদের এই জাতীয় অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। তাই ওরা ক্রমশঃ নির্মূল হয়ে যায়। মহাশুণ্ডিরা যেন ঠেকে শিখেছে—মরিথেরিয়াম থেকে ম্যামথে বিবর্তিত হতে গিয়ে ওরা সেই ভুলটা পুনরায় করেনি—এত 'অতি-বাড়' বাড়েনি, যাতে ঝড়ে পড়ে যায়!

এ-থেকেই আমরা আমাদের শেষ-প্রশ্নের সমাধানে আসতে পারি। দেহ-বৃদ্ধিতে মহাশুণ্ডিদের আত্মরক্ষায় সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তারা শ্লথগতি হয়ে গেল। অতবড় দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে তার প্রয়োজন হল গোদা-গোদা পা। তা নিয়ে জোরে ছোটা চলে না। হাতী ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার ছুটতে পারে। তুলনায় হরিণ ছোটে ঘণ্টায় সত্তর-আশি কিলোমিটার, চিতাবাঘ ছোটে ঘণ্টায় প্রায় একশ' কিলোমিটার!

কুহু বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু হাতীর পক্ষে জোরে ছোটার প্রয়োজন কোথায়? হরিণ জোরে না ছুটতে পারলে তাকে বাঘে ধরে ফেলে, বাঘ জোরে না ছুটতে পারলে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। হাতী তো তৃণভোজী, আর সে তো এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তার প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এমন কি বাচ্চা হাতীরও দৌড়ে পালাবার প্রয়োজন নেই। হাতীরা দল বেঁধে থাকে—বড়রাই বাচ্চাদের পাহারা দেয়।

পণ্ডিতজী হেসে বলেন, মানলাম! অকাট্য যুক্তি তোমার। কিন্তু ধর বিবর্তনের পথে উন্নত হতে হতে অন্য একটা জীব যদি এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন হাতীর ধারে-কাছে না এসেও সে লড়তে সক্ষম হয়? বাঘ, সিংহ দূর থেকে তার নখ-দন্ত ছুঁড়ে মারতে পারে না, কিন্তু এমন কোন জীব যদি বিবর্তনপথে এসে হাজির হয় যে দূর থেকে তার ঐ নখ-দন্ত ছুঁড়ে মারছে? তখন?

কুহু বলে, বুঝলাম! মানুষ!

—হ্যাঁ! তাই এই অতিকায় প্রাণীটি তার অমিতবিক্রম সত্ত্বেও এক সময় অসহায় হয়ে পড়ল। সেটাই হচ্ছে ম্যামথ-বংশের অবলুপ্তির কারণ। এশিয়া ও আফ্রিকায় হাতীর পূর্বপুরুষ বাস করত ঘন জঙ্গলে। আমি বিশ-ত্রিশ

হাজার বছর আগেকার কথা বলছি। তখন এশিয়া বা আফ্রিকাবাসী আদিম মানুষদের রীতিমত আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে হত। কারণ, সে-সব গভীর অরণ্যে মাংসাশী জীব বড় কম ছিল না। অপরপক্ষে শীতপ্রধান অঞ্চলে মাংসাশী জীব ছিল সংখ্যায় অনেক কম, অরণ্যও ছিল অপেক্ষাকৃত অগভীর—ফলে লোমশ ম্যামথদের ব্যাপকভাবে হত্যা করত সে-দেশের আদিম মানুষ। একটা ম্যামথ মারতে পারলে দীর্ঘদিন ধরে ভোজের উৎসব চলে—ঠাণ্ডার জন্য মাংসটা সহজে পচে না। তাই ম্যামথের দিকেই ওদের নজরটা বেশি। এভাবে অচিরে ম্যামথ-বংশ নির্বংশ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মানুষ আরও নতুন নতুন 'নখ-দন্তে'র সন্ধান পেয়েছে। আগুন, চাকা, তীর-ধনুক,—ক্রমে বারুদ, বন্দুক, রাইফেল। ফলে এশিয়া আর আফ্রিকাতে ক্রমশঃ শুরু হল অনুরূপ অত্যাচার। ম্যামথ নয়, এবার হাতী। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এই ব্যাপক হত্যালীলা অপ্রতিরোধ্যভাবে চলছিল। এর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার হল—যার ফল হাতীর পক্ষে হল মারাত্মক। যে দাঁত ছিল এতদিন তার অস্ত্র, এখন তাই হল তার সর্বনাশের কারণ। মানুষ লুব্ধ হল গজদন্তে। অসভ্য-মানুষ হাতী শিকার করত খাদ্যের প্রয়োজনে, ফলে তা ছিল সীমিত। কিন্তু অসভ্যতর সভ্য মানুষ এ হত্যা-উৎসব চালালো হাতীর দাঁতের লোভে, অর্থের লোভে। যার লালসার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আর তার চেয়েও লজ্জার কথা হাতী-মারার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার লোভ।

সুখের কথা গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ হত্যা-উৎসব বন্ধ হয়েছে। সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষ বুঝতে শিখেছে বন্য প্রাণীকে সংরক্ষণ না করলে সেটা পৃথিবীরই ক্ষতি। অত্যন্ত দ্রুতহারে ওরা নির্মূল হয়ে যাচ্ছিল। বাঘের কথাই ধর: এই শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ হাজার বাঘ ছিল বর্তমানে আছে মাত্র দু'হাজার। হাতীও ঐ-ভাবে ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। আইন করে হত্যা-উৎসব বন্ধ হয়েছে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল হয়েছে—তবু যে ক্ষতি আমরা ইতিপূর্বেই করে বসেছি বোধকরি তার পরিপূরক আজ আর সম্ভব নয়। জীববিজ্ঞানীদের একদল এমন কথাও বলছেন: এই বিংশ শতাব্দী-শেষ হবার আগেই, মানে আর মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে স্বাধীনচারী বন্যহস্তী বলে হয়তো কোন জীব থাকবে না। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হাতীকে দেখবে শুধু চিড়িয়াখানায় আর সংরক্ষিত অরণ্যে। কে জানে, হয়তো দ্বাবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যে সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হবে—তারা হাতী দেখতে পাবে যাদুঘরে

আর ছবির আজ যেমন আমরা ডোডো পাখি অথবা ম্যামথের ছবি দেখি !

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখছি, মানবভাগ্যের ওঠা-পড়ার সঙ্গে হাতীর ভাগ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শিল্পে, সমাজে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, আনন্দ-বিতরণে হাতী আছে মানব-ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাজার বছর আগে প্যালিওলিথিক যুগের অসভ্য গুহামানব তার গুহার দেওয়ালে হাতীর ছবি এঁকে গেছে। অসংখ্য চিত্র, পৃথিবীর নানা দেশে। তার তিনটি নমুনা এখানে পেশ করা গেল। প্রথমটি পাওয়া গেছে ফ্রান্সের Font-de-Gaume-এ। এখানে দেখছি একটা ম্যামথ খাঁচার ভিতর আটক পড়েছে। ব্যাপার কি ? যে আমলের কথা তখন মানুষ কাঁচা মাংস খায়, জামা-কাপড়ের ব্যবহার জানে না—তখন

প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে ম্যামথ
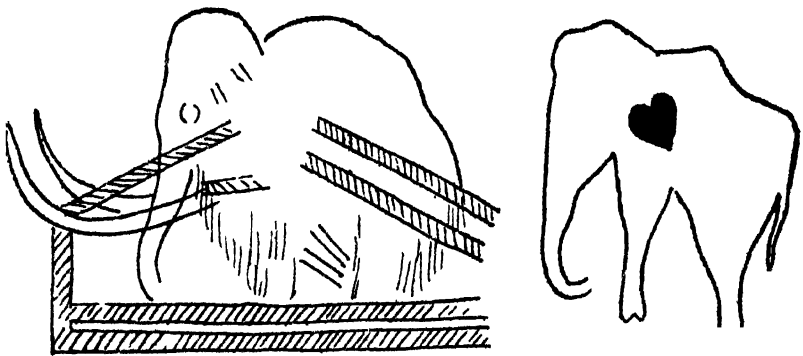
প্রথম: Font-de Gaume স্পেন: পিন্দাল

হাতী ধরে রাখার উপযুক্ত খাঁচা ওরা বানিয়েছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। একদল বিশেষজ্ঞ বললেন,—ছবি যখন এঁকেছে তখন ধরে নিতে হবে গাছের গুঁড়িকে লতাপাতা দিয়ে বেঁধে ওরা নিশ্চয় হাতীকে বন্দী করে রাখত। দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ দল বললেন,—তা নয়, খাঁচাটা হচ্ছে প্রতীক ! মানুষের হাতে হাতীরও যে নিস্তার নেই একথাই বলতে চেয়েছেন শিল্পী—ঐ ম্যামথের চারিদিকে একটা কাল্পনিক বেড়া এঁকে। অর্থাৎ ঐ অজ্ঞাত চিত্রকর হচ্ছেন কবি চণ্ডীদাসের

প্যালিওলিথিক সংস্করণ! শিল্পের মাধ্যমে তিনি ষাট হাজার বছর আগে বলে গেছেন: 'শুনহে মানুষ ভাই—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই!'

ষাট হাজার বছর পরে আমরা শুধু বলব—দুটি ব্যাখ্যার যেটাই সত্য হ'ক না কেন সেই আদিম পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমরা মাথার টুপি খুলতে বাধ্য। হয় ঐ খাঁচা-বানানোর পারদর্শিতার জন্য সেই আদিম এঞ্জিনিয়ারকে সেলাম করতে হবে, অথবা ঐ প্রতীকধর্মী শিল্পীর গূঢ় ব্যঞ্জনায় তাঁকে প্রণাম করতে হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি পেশ করছি স্পেন-দেশের পিণ্ডাল গুহা থেকে। এও প্রায় সমসাময়িক। এখানে লক্ষণীয় প্রস্তরযুগের শিল্পী ম্যামথটিকে এঁকেছেন বহিঃ-রেখায় বা আউট-লাইনে, কিন্তু তার হৃদপিণ্ডের অবস্থানটিকে দেখিয়েছেন ভরাট রঙে। এবারেও দেখছি বিশেষজ্ঞরা দ্বিমত হয়েছেন। প্রথম দল বললেন,—শিল্পীর উদ্দেশ্য একেবারে ব্যবহারিক দিক থেকে। দর্শকদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ম্যামথ দেহের ভাল্‌নারেব্‌ল্ পয়েণ্টটি,—অর্থাৎ 'বুলস্-আই'টা তোমরা চিনে নাও, বুঝে নাও কোথায় বর্শা বেঁধাতে হবে। দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতরা বললেন,—মোটেই তা নয়, হৃদপিণ্টা আঁকা হয়েছে 'টাবু' বা অন্ধবিশ্বাসের ফলশ্রুতি হিসাবে। গুহামানবেরা বিশ্বাস করত চিত্রের ম্যামথে ঐ হৃদপিণ্ডে যদি তারা তীরের ফলা অথবা বর্শার ডগা ছুঁইয়ে যায়, তবে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দণ্ডকারণ্যে দেখেছি অনেক আদিবাসী ফটো তুলতে দিতে নারাজ। ওদের পাটোয়ারি বা সর্দার বলে, আদিবাসীদের ধারণা ছবিটা যার কাছে থাকবে সে তার উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তা তেমন-তেমন ধারণা কি অতি-আধুনিকা চতুরিকা-নিপুণিকাদেরই নেই? তাদের কারও ফটো তোমার-আমার জামার বুক-পকেটে আবিষ্কৃত হলে আজও তাঁরা ক্ষেপে ওঠেন কেন? অনেক শিক্ষিত মানুষও বিশ্বাস করেন মারণমন্ত্র-বিশারদ তান্ত্রিক কারও কুশ-পুত্তলিকা তৈরী করে যদি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই কুশপুত্তলিকাকে সূচীবিদ্ধ করে তবে সেই মানুষটির রক্তবমি শুরু হয়ে যাবে। তা সে যা-ই হ'ক, এবারেও বলব—শিল্পীর কৃতিত্ব কিন্তু কোনভাবেই খাটো হচ্ছে না। হৃদপিণ্ডের নির্ভুল অবস্থান এবং হরতনের টেক্কার মত তার আকৃতি সম্বন্ধে তারা ধারণা করতে পেরেছিল এটা তো অস্বীকার করা চলবে না! সেই কৃতিত্বই কি কম? কী বলেন?—এবারও মাথার টুপি খুলতে হচ্ছে তো?

তৃতীয় যে উদাহরণটি সঙ্কলন করেছি সেটি ইউরোপ-খণ্ডের নয়, আফ্রিকার থর্ন নদীর অববাহিকায় একটি পার্বত্যগুহায় এই চিত্রটি পাওয়া গেছে। বয়স

হচ্ছে না কি যে, শিল্পী 'স্প্লিট সেকেণ্ড' সময়কাল মাত্র খুলে দিয়েছিলেন তাঁর ক্যামেরার এ্যাপারচার ? যেন একটি খণ্ড-মুহূর্ত ঐ গুহাপ্রাচীরে শাশ্বত হয়ে আছে। শুধু তাই নয়—এবার ছবিটি আগাগোড়া কালো—যাকে বলি

'স্তিলুয়ে'। কেন ? মাপ করবেন—আমার তো মনে হয়েছে, যে কারণে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' চলচ্চিত্রে বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক প্রাক্-টাইটেল প্রথম সিকোয়েন্সটা নেগেটিভে দেখিয়েছেন, ঠিক সেই কারণেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী এই মর্মান্তিক মৃত্যুদৃশ্যটিতে কালো ভরাট রঙের ব্যবহার এত বেশি করেছেন।

ফ্রান্সের প্যালিওলিথিক যুগের শিল্পী যদি চণ্ডীদাসের পূর্বসূরী হন, তবে থর্ন নদীর অববাহিকার এই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়ের পূর্বসূরী!!

বারে বারে আপনাদের মাথার টুপি খুলতে বলা অশোভন হবে। তাই এবার বরং ঐতিহাসিক যুগে আসা যাক। ঐতিহাসিক যুগে হস্তীর কথা সর্ব-প্রথম পাচ্ছি খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে—আসিরীয় সম্রাট দ্বিতীয় আস্থরনাশিরপাল তাঁর প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে একটি চিড়িয়াখানা বানিয়েছিলেন—তাতে সিরিয়া-অঞ্চলে ধৃত গুটিকতক হাতীও নাকি ছিল। ঠিক জানি না, এটাই বোধকরি ইতিহাস-স্বীকৃত প্রথম চিড়িয়াখানা। তার আগে পৌরাণিক ও মহাকাব্যের যুগে ভারতবর্ষে হাতীর কথা অবশ্য বারে বারে পেয়েছি। এরপর দেখছি

বাহিনীতে রণহস্তী ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সে-কথা লিখে গেছেন—লিখেছেন মেগাস্থেনিস। তাছাড়া একটি সে-আমলের মেডেল উদ্ধার করা গেছে

যাতে দেখছি সেকেন্দার শাহের মাথার মুকুটটা হচ্ছে হাতীর মাথার চামড়া দিয়ে বানানো। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এই মুদ্রায় সেকেন্দারের পুরু-বিজয় কাহিনীর ব্যঞ্জনা বিধৃত। হ্যানিবল হস্তিপৃষ্ঠে আল্‌পস্‌ পর্বত অতিক্রম করে উত্তর
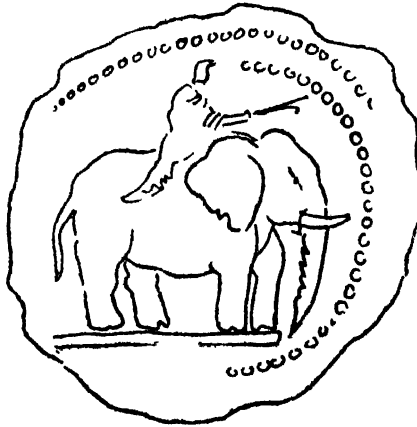
দিক থেকে রোম আক্রমণ করেছিলেন। স্পেনে প্রাপ্ত একটি মুদ্রায় হ্যানিবলকে হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখা যায়—নিঃসন্দেহে সেটি আফ্রিকার হাতী—'লম্বদন্তা'।

রোমান যুগে এ্যাম্ফিথিয়েটার, এরিনা বা সার্কাসে হাতীর সঙ্গে গ্লাডিয়েটারদের লড়াই ছিল একটা মারাত্মক মজাদার বিলাস। ঐতিহাসিক প্লিনির অনুসরণে এর প্রাচীনতম উল্লেখ পাচ্ছি এ্যান্টোনিনাসের রোমে.

ভেনাসের মন্দির নির্মাণ করে দেবার নামে সোট উৎসর্গ করার দিন রোম-সম্রাট পম্পেয়ী একটি খেলার আয়োজন করেছিলেন। এরিনাতে গোটা কুড়ি হাতীকে ছেড়ে দেওয়া হল, আর শতখানেক ক্রীতদাস গ্লাডিয়েটার বর্শা হাতে নামল তাদের বধ করতে। বর্শাবিদ্ধ ভীমকায় হস্তীর দল মরণান্তিক যন্ত্রণায় কীভাবে লড়াই করেছিল তার বিস্তারিত এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন ইতিহাসকার। বহু ক্রীতদাসকে ওরা পদদলিত করল, দাঁতে বিদ্ধ করল অথবা শুঁড়ে করে তুলে আছাড় মারল—কিন্তু তবু গ্ল্যাডিয়েটারদের সংখ্যাধিক্যে একে একে তারা প্রাণ হারাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নাকি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর ঐ হাতীগুলি শুঁড় আকাশের দিকে তুলে কাকে যেন অভিশাপ দিতে শুরু করে। তখন হাজার-হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে উঠেছিল নিজ নিজ আসনে। তারা এক-যোগে অনুরোধ করেছিল সম্রাটকে ঐ মারাত্মক খেলা সেদিনের মত বন্ধ করে দিতে। রোমের ইতিহাসে দর্শকদলের এমন ব্যবহার সচরাচর নজরে পড়ে না। তাই প্লিনির বর্ণনাটি আরও বেশি করে মনে দাগ কাটে।

জুলিয়াস সীজারের পালিতপুত্র সম্রাট অগস্টাস হচ্ছেন প্রথম রোম-সম্রাট। যীশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক তিনি। সম্রাট আগস্টাসের একটি মেডেল-এ দেখছি চারটি হস্তিচালিত শকটে শোভাযাত্রা করে সম্রাটকে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাতীর পিছনের পা ঠিকমত আঁকা হয়নি—শিল্পী যেন থাবা-ওয়ালা বাঘ অথবা সিংহের পিছনের পা এঁকেছেন।

রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় হাজার বছরের ভিতর ইউরোপ আর হাতীর মুখ দেখেনি। বিভিন্ন প্রাচ্যদেশ ভ্রমণকারী পর্যটকের মুখে ওরা হাতীর বর্ণনা বারে বারে শুনেছে। স্বচক্ষে ওরা আর হাতী দেখতে পায়নি—তার ফলে মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিত্রকর হাতীর যা ছবি এঁকেছেন তা কৌতুককর হয়ে পড়েছিল। তার দু-একটি নমুনা আমরা একটু পরে দেখব। তার আগে বলি—এই হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র দুটি হাতীর সংবাদ আমি পেয়েছি, যা ইউরোপ-ভূখণ্ডে আমদানি করা হয়েছিল এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে। তার প্রথমটির প্রেরক এবং প্রাপক দুজনেই ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তি। পোষা-হাতীটি পাঠিয়েছিলেন আব্বাস-বংশীয় বাগদাদের খালিফ হারুণ-অল-রসিদ; প্রাপক সম্রাট শার্লমেন। ঘটনাটি ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের। হাতীর নামটাও ইতিহাসবিখ্যাত লোকের অনুকরণে—হারুণ-অল-রসিদের পূর্বপুরুষ 'আবুল আব্বাস'-এর নামে। ইতালির পীসা (তখনও হেলানো-মিনার তৈরী হয়নি) শহরে তাকে জাহাজ থেকে নামানো হয়; হাঁটা-পথে আল্‌পস্ পার হয়ে সে শার্লমেন-এর রাজ্যে

আসে। সম্রাট শার্লমেনকে সে পিঠে করে বহুবার এ-রাজ্য সে-রাজ্য তারপর ইউরোপে পদার্পণের সতের বছর পরে জার্মানীতে আব্বাস মারা যায়। তার একটি গজদন্ত দিয়ে কারুকার্যখচিত একটি রণতূর্য বানানো হয়েছিল; সেটি আয়লা-শাপেলের গীর্জায় বহুদিন রাখা ছিল।

ইউরোপের ইতিহাসে দ্বিতীয় হাতীটির সন্ধান পাচ্ছি ঐ ঘটনার প্রায় সাড়ে চারশো বছর পরে। ফ্রান্সের নবম লুই ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় হেনরিকে এই হাতীটি উপহার দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের পরে এই প্রথম ১২৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে একটি হাতী পদার্পণ করল। খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে 'গল' বা ফ্রান্স দেশ থেকে জুলিয়াস সীজারের বাহিনীর সঙ্গে অবশ্য কিছু হাতী ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা রেখেছিল।

পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতেও ইউরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ মাঝে মাঝে হাতী আমদানি করেছিলেন অথবা উপহার পেয়েছিলেন—কিন্তু সংখ্যায় তা মুষ্টিমেয়। ইতালির পোপ দশম লিও, ফ্রান্সের দ্বিতীয় হেনরি, ইংলণ্ডের প্রথম এলিজাবেথ অথবা প্রাশিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়ানের এক-একটি রাজহস্তী ছিল। কিন্তু ইউরোপের সাধারণ মানুষের কাছে হাতী বস্তুটা তখন ছিল ড্রাগন বা ইউনিকর্ন-এর মতই একটা কল্পলোকের প্রাণী। পঞ্চদশ শতাব্দীর
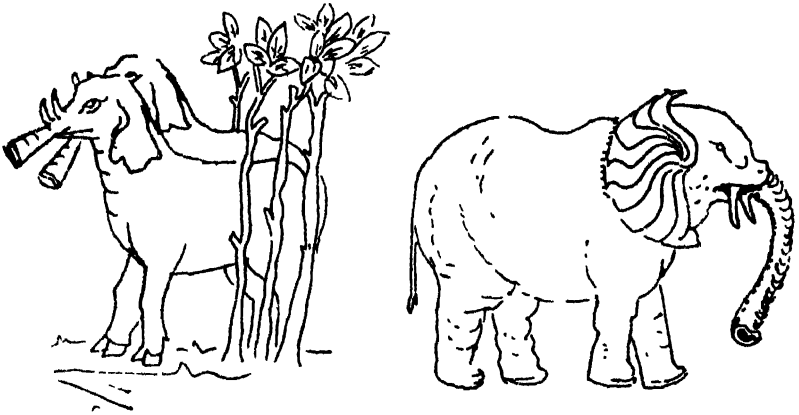
একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থে চিত্রকর হার্তাব যে ছবিটি এঁকেছিলেন তা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে রাখা আছে। পাঠকদের সেটির একটি অনুকৃতি উপহার দেওয়া গেল। জীবটির খুর গরুর মত। কান স্প্যানিয়াল কুকুরের অনুকরণে, চোখ মানুষের আর শুঁড়টার একমাত্র উপমান বোধকরি রথের মেলায় কেনা

তালপাতার ভেঁপু। সুকুমার রায় ছাড়া এমন জীবের কল্পনা যে আর কারও উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বার হতে পারে তা বিশ্বাসই হতে চায় না!

সপ্তদশ শতাব্দীতে এডওয়ার্ড টপসেল্ তাঁর 'ন্যাচারাল-হিস্ট্রি'-গ্রন্থে বর্ণনা দিয়ে হাতীর যে ছবিটি যুক্ত করেছেন [The Historie of Foure-footed Beasts : Of the Elephant. PP 190-211, London, 1607] তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজের কাছে হাতীর আকৃতি সে যুগেও ছিল অস্পষ্ট। টপসেল্-সাহেবের মহাগজ কানে লাগিয়েছে প্রকাণ্ড একটা সামুদ্রিক ঝিনুক—বোধকরি বত্তিচেল্লির 'ভেনাসের জন্ম' চিত্র থেকে। আর তার শুঁড় হিসাবে বেছে নিয়েছে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের হোস পাইপ।

সপ্তদশ শতাব্দীর একটি এনগ্রেভিঙ্-এ ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনারির দরবারের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি। ঘটনাটা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের। রুয়েন শহরে
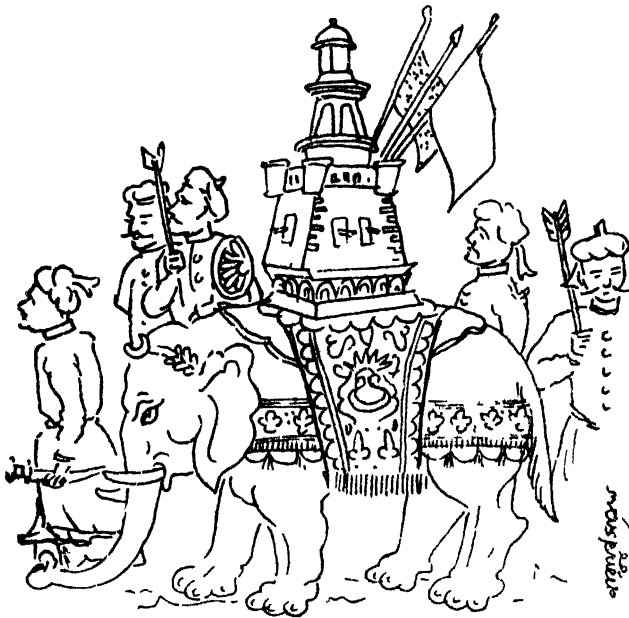
জাঁকজমকপূর্ণ এক শোভাযাত্রায় হস্তিপৃষ্ঠে চলেছে একটা নকলগড়—ফরাসী অনুচরেরা চলেছে সাথে, ভারতীয় সেপাইয়ের বেশে। এ ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, হস্তিপ্রবর উচ্চতায় প্রায় একটা সিংহের মত—তার পায়ে সিংহের থাবা, ঠ্যাঙের ডাঙটা গরুর মত আর লেজটা হুবহু ঘোড়ার!

একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, ইউরোপের চিত্রশিল্পীরা বাস্তবানুগ

বা রিয়ালিস্টিক—তুলনায় ভারতীয় চিত্রকরেরা নাকি কল্পনা-বিলাসী। দ্বিতীয়োক্তরা নাকি 'অ্যানাটমি'র ধার ধাবেন না। হাতীর ছবির ক্ষেত্রে অবস্থাটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। খ্রীষ্ট-পূর্বযুগে অজন্তার দশম গুহায় বিশ-ত্রিশটি হাতীর ছবি আঁকা হয়েছে—নিখুঁত সে-সব ছবি, 'অ্যানাটমি'র দিক থেকে—যাকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাষায় বলব ত্রুটিহীন 'রূপভেদ' আর 'প্রমাণ'। ভারতীয় ভাস্কর্যে—সাঁচী, ভারহুত কিংবা তারও আগের যুগে অশোকস্তম্ভে, ধৌলি শিলালেখে পেয়েছি নিখুঁত হাতীর প্রতিমূর্তি দেড়-দু'হাজার বছর পরেও যা পারেননি ইউরোপীয় চিত্রকর। বলতে পারেন—হাতী ওরা দেখেনি তা আঁকবে কেমন করে? কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়, কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপের চিড়িয়াখানায় যথেষ্ট হাতী এসেছে—তবু ওরা ঠিকমত হাতীকে আঁকতে পারেনি।

সে যা-ই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখছি ইউরোপের অনেক শহরে সার্কাসে বা চিড়িয়াখানায় হাতীকে দেখা যাচ্ছে। ১৮৩০ সালের একটি পত্রিকায় দেখছি বিজ্ঞাপন বার হয়েছে—'অ্যাডেলফি থিয়েটারে' একটি হস্তি-প্রবর অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন। ব্যাপার কি? একটু খোঁজ নিতেই দেখি সংবাদটা সত্য। হাতীর অভিনয় দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ভীড় করে দর্শকেরা আসছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনুন। বলছেন, কৃত্রিম আলোয় বা বাজনায় হস্তি-কুশীলব বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। নাটকে তাঁর ভূমিকা ছিল নায়কের বাহনরূপে। শেষ দৃশ্যে দেখা যেত রাজপুত্র শত্রুহস্তে বন্দী। দ্বিতল দুর্গের উপরের ঘরে রাজপুত্র আটক পড়েছেন—নিচের উদ্যানে নায়িকা রাজকন্যা 'প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর!' বলে করুণভাবে গান গাইতে গাইতে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন আর দ্বিতলে রাজপুত্র হা-হুতাশ করছেন। উদ্ধার পাবার আশা যখন আর কেউই করছেন না তখন প্রবেশ করেন গজরাজ। পিছনের পা মুড়ে বসে পড়েন ঐ দ্বিতল গৃহের সম্মুখে। ধীরোদাত্ত নায়ক মুক্ত-কৃপাণ হস্তে আবির্ভূত হন অলিন্দে, সঙ্গে তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর। দুর্গ-অলিন্দের উপর থেকে ভীমবেগে নিষ্ক্রান্ত হন রাজকুমার, প্রভুভক্ত বাহনের পিঠ বেয়ে সড়াৎ করে নেমে আসেন ভূতলে। ঠিক যে ভঙ্গিতে আজকের দিনের বাচ্চারা পার্কের স্লিপ থেকে নেমে আসে। প্রেক্ষাগৃহ তখন মহানন্দে ফেটে পড়ে: এনকোর! এনকোর!

অগত্যা সদ্যমুক্ত রাজপুত্র উইংস দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হন। পিছনের দ্বার দিয়ে

তাঁকে পুনরায় উঠতে হয় দুর্গের দ্বিতলে এবং দর্শকদলের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে কসরৎটা দ্বিতীয়বার দেখাতে হয়। পুনরায় মুক্ত-কৃপাণ হস্তে তাঁর আবির্ভাব এবং সডাং-নিনাদী ভূতল স্পর্শ।

অভিনয়ান্তে 'কার্টেন-কলে' সানুচর রাজপুত্র যখন 'বাও' করেন তখন তাঁর বাহন শুঁড় তুলে সেলাম করে। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের একটি চিত্রও প্রকাশিত

হয়েছিল সমসাময়িক পত্রিকায়। আমার পাঠকদের দুর্ভাগ্য—তাঁরা দেড় শ' বছর দেরি করে এসেছেন, তাই এই নাটকটির অভিনয় তাঁরা দেখতে পেলেন না। ছবি দেখে তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

প্রায় এই সময়েই লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় জ্যাকের আবির্ভাব ঘটে। জ্যাকের

আদি নিবাস ভারতবর্ষ। ১৮৩১ সালে লণ্ডন চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ তাকে ক্রয় করেন। লণ্ডনের বাচ্চাদের সে কী স্ফূর্তি! দলে দলে বাচ্চারা চলেছে চিড়িয়াখানায়: জ্যাক দেখব, জ্যাক দেখব!

চিড়িয়াখানার নথীতে দেখছি এক ভদ্রমহিলা ঐ হাতীর স্টলের সামনে একটি খাবারের স্টল খোলার অনুমতি চান। সেটা কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরও করেন। ঐ দোকানে শুধু জ্যাকের জন্য খাবার কিনতে পাওয়া যেত—বান-রুটি, কেক, ক্যাণ্ডি আর নানান জাতের ফল। 'টাইমস্' পত্রিকায় দেখছি ভদ্রমহিলা দিনে ছত্রিশ শিলিং পর্যন্ত বিক্রয় করেছেন। দেড়শ' বছর আগে খাদ্যদ্রব্যের যা দাম ছিল তাতে অনুমান করতে পারি জ্যাক বক-রাক্ষসের মত কেক-ক্যাণ্ডি খেত।

বছর পনের-ষোল জ্যাক ছিল লণ্ডন 'জু'-তে। তারপর তার অসুখ করল। জুয়োলজিক্যাল স্যোসাইটির একেবারে প্রথম দিককার ফেলো ডাবল্. জে. ব্রডারিপ এক রবিবারে তাকে দেখে এসে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন, "জ্যাকের দুরারোগ্য অসুখ করেছে। খাঁচার ধারে সে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হল বেচারির খুব কষ্ট হচ্ছে। ওর মাহুত আমাকে কাছে যেতে বারণ করল—বলল, ওর মেজাজ খুব খারাপ। কিন্তু জ্যাকের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব। আমি মাহুতের সাবধান-বাণী অগ্রাহ্য করে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। আশ্চর্য। আমাকে সে ঠিক চিনতে পারল, কারণ পরমুহূর্তেই সে শুঁড়টা উঁচু করে তার মাড়ির দাঁত বা 'মোলার টিথ'গুলি মেলে ধরল। জ্যাক জানত—জীববিজ্ঞানী হিসাবে তার ঐ দাঁতটা আমি বারে বারে পরীক্ষা করতে আসি। আমি ওকে একটা আটার ভূষির মণ্ড দিলাম। জ্যাক আমার হাত থেকে সেটা খেল। বেশ মনে হচ্ছিল সে ক্লান্ত, ধুঁকছে।"

ক্রমশই জ্যাকের অবস্থা খারাপের দিকে গেল। দর্শকেরা যাতে ওকে বিরক্ত না করে তাই দূর দিয়ে বেড়া দেওয়া হল। তবু লণ্ডনের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ভীড় লেগেই আছে। জ্যাক মারা যাচ্ছে! বাচ্চাদের চোখ অশ্রু-সজল। জ্যাক আর কিছু খায় না। দু'দিন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। শেষে একদিন আর সে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারল না। পিছনের পা বেকায়দায় মুড়ে বসে পড়ল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সে ঐ অবস্থায় ধুঁকছিল। তারপর ধীরে ধীরে সামনের পা দুটি সে লম্বা করে দিল। মাথাটা নেমে এল। ভারতীয় হাতীটি জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে শেষ সময়ে ভারতীয় প্রথায় কাকে যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল!

দূরে দাঁড়িয়ে যাঁরা এ-দৃশ্য দেখছিলেন তাঁরা ছিলেন স্তব্ধ, মৌন—সকলের

চোখই অশ্রুসজল। বোধকরি একমাত্র ব্যতিক্রম শিল্পী জর্জ ল্যাণ্ডশীয়ার। দ্রুতহস্তে তিনি ঐ শেষ প্রণামের ভঙ্গিতে শায়িত অতিকায় প্রাণীটার একটা স্কেচ এঁকে চলেছেন! পরদিন (১৯.৬.১৮৪৭) 'দ্য-ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ'-এ সেই স্কেচটি প্রকাশিত হয়।

'জ্যাক'-এর আত্মসমর্পণ - জর্জ ল্যাণ্ডশীয়ারের স্কেচ অনুসরণে
The Illustrated London News, June 19th 1847

প্রণামরত জ্যাকের প্রতি শিল্পীর শেষ সম্মান।

জ্যাকের পর লণ্ডন 'জু'তে এল জাম্বো। জ্যাকের মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন প্রভাতবাবুর 'আদরিণী' মৃত্যুঞ্জয়ী, তেমনি লণ্ডন 'জু'র ইতিহাসে জাম্বোও অমর। তফাৎ এই যে, 'আদরিণী' মানসকন্যা, জাম্বো বাস্তব।

জাম্বোর বাড়ি এশিয়ায় নয়, আফ্রিকায়। দুটি ভারতীয় গণ্ডারের বিনিময়ে প্যারিসের চিড়িয়াখানা থেকে জাম্বোকে যখন আনা হয়েছিল সে তখন নেহাৎ বাচ্চা—সাড়ে পাঁচ ফুট খাড়াই তখন তার। তার তিন মাস পরে সুদান থেকে এল একটা মাদি হাতী—তার নাম : এ্যালিস। ওদের রাখা হল পাশাপাশি দুটি খাঁচাতে। জাম্বো বেশ পোষ মানল। ওর খিদমদ্‌গার ছিল ম্যাথু স্কট। তার নির্দেশে সে সেলাম করতে শিখল, শুঁড় দিয়ে পেনি ওঠাতে শিখল। দর্শকদের দেওয়া কেক-ক্যাণ্ডিতে তার খুব উৎসাহ। কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাথু স্কটের নির্দেশে জাম্বো বাচ্চাদের পিঠে করে ঘুরিয়ে আনতেও শুরু করল। অচিরে লণ্ডনবাসী বালখিল্য বাহিনীর অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল জাম্বো।

বাচ্চাদের পিঠে নিয়ে জাম্বো যখন টহল দেয় তখন তাদের বাবা-মা দাঁড়িয়ে

দেখে, আর হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের শৈশবে তারাও অমনিভাবে জ্যাককে দেখতে আসত।

প্রায় বছর ষোল সে দিব্যি ছিল লণ্ডন 'জু'তে। প্রথম যুগে যারা জুলজুলে চোখে জাম্বোকে দেখতে আসত এখন তারা মা হয়েছে। তারা প্যারাম্বুলেটারে করে নিয়ে আসে নতুন যুগের নতুন দর্শক। নবীন দর্শক জুলজুলে চোখে দেখে জাম্বোকে। কিন্তু এর পরেই হল দুর্বিপাক। কি জানি কেন একদিন জাম্বোর মেজাজ হঠাৎ গেল বিগড়ে। এতদিন যে ছিল শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ—হঠাৎ সে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আফ্রিকার গহন অরণ্যের কথাই তার মনে পড়ল, না কি সঙ্গিনীর অভাবেই সে এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল? একদিন সকালে দেখা গেল বেড়া ভেঙে ফেলার উদ্যোগে সে উঠে পড়ে লেগেছে। সর্বনাশ। ছুটে এলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। কী ব্যাপার? ব্যাপারটা যে কী তা বোঝা গেল না – কিন্তু বেশ অনুধাবন করা গেল জাম্বো আর সে-জাম্বো নেই। হাতীচড়ার ব্যবস্থা তো স্থগিত রাখতে হলই, বেড়াটাকেও শক্ত খুঁটি দিয়ে আরও মজবুত করা হল। দর্শকদের দূরত্বের ব্যবধানটা বাড়িয়ে দেওয়া হল। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা কড়া নজর রাখলেন জাম্বোর উপর। পথ্য ও ঔষধ চলতে থাকে তাদের নির্দেশে। কিন্তু জাম্বোর মেজাজ দিন দিনই যেন খিটখিটে হয়ে উঠছে। শেষে চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বার্টলেট কর্তৃপক্ষকে একটি রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য হলেন। 'টাইমস' পত্রিকায় ১৪.১২.১৮৮১ তারিখে রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল। তার অনুবাদ

"কিছুদিন থেকেই এই চমৎকার প্রাণীটির বিষয়ে আমি উদবিগ্ন বোধ করছিলাম। জাম্বো এখন প্রায়—প্রায় কেন, পুরোপুরিই প্রাপ্তবয়স্ক। তার সাম্প্রতিক আচরণে আমি এবং আমার সহকারীরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একমাত্র জাম্বোর একান্তরক্ষক ম্যাথু স্কট মনে করে চিন্তার কোন কারণ নেই। এখন শুধু স্কটই তার খাঁচার ভিতর একা ঢুকবার সাহস রাখে। তাকে জাম্বো কিছু বলে না। অন্য কেউ খাঁচায় ঢুকলে, আমি নিঃসন্দেহ তার মৃত্যু অবধারিত। স্কটের কাছে অবশ্য জাম্বো আজও শান্ত ও বাধ্য। কতদিন এভাবে চলবে আমি জানি না। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমি এদিকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, ম্যাথু স্কট কোনদিন অসুস্থ অথবা আহত হয়ে পড়লে জাম্বোর পরিচর্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর কেউ ওর খাঁচায় ঢুকতে রাজী নয়, ঢোকা উচিতও ন। তখন হয়তো ঐ চমৎকার অথচ ভয়াবহ প্রাণীটিকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

উপসংহারে বলি, প্রয়োজনবোধে জাম্বোকে যাতে বিনাকালক্ষেপে আমি হত্যা করতে পারি তার অগ্রিম অনুমতি এবং মারণাস্ত্র আমাকে এখনই পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক।"

কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গনলেন। কী সর্বনাশের কথা! জাম্বোকে গুলি করে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলতে হবে?

নিতান্ত ঘটনাচক্রই বলতে হবে। ঠিক ঐ সময়েই আমেরিকান শো-ম্যান মিস্টার বার্নাম নিউইয়র্ক থেকে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠালেন—তিনি তাঁর সার্কাসের জন্য জাম্বোকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। হাতে স্বর্গ পেলেন যেন চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ। এর চেয়ে ভাল সমাধান আর কিছু হতে পারত না। তাঁরা তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করে জানালেন, জাম্বোকে বিক্রয় করতে তাঁরা প্রস্তুত। এজন্য তাঁরা দু'হাজার পাউণ্ড দাম চাইছেন, সর্ত এই যে, জাম্বোকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ও খরচ বার্নামকে বহন করতে হবে এবং জাম্বো যেখানে, যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়।

'এ্যাস ইজ হোয়্যার ইজ' হচ্ছে বিজনেস-এ টার্মের একটা বাঁধা বয়ান। 'হ-য-ব-র-ল'র কাক্কেশ্বরের ভাষায়— [illegible]।' বার্নাম তাই কথাটায় তেমন গুরুত্ব দিলেন না, সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে টাইমস্ পত্রিকায় যে সংবাদ বের হয়েছিল তা তাঁর নজরে পড়েনি। বার্নাম অতলান্তিক মহাসাগরের ওপার থেকে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করলেন টার্মস এ্যাকসেপ্টেড।—অর্থাৎ সর্ত মেনে নিলাম, চেক পাঠালাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল লণ্ডন জু-র কর্তৃপক্ষের।

কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের নাটক তখনও বাকি।

এ সংবাদটি টাইমস্ পত্রিকায় ছাপা হল ১৮৮২ সালের পঁচিশে জানুয়ারী।

তার ফল হল মারাত্মক। হঠাৎ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা দেশ। ইয়ার্কি নাকি? জাম্বো কি চিড়িয়াখানার মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি? জাম্বো তো ইংলণ্ডের জাতীয় সম্পদ। জাম্বো যে প্রতিটি লণ্ডনবাসী শিশুর পরম আদরের ধন। টাকার বিনিময়ে তাকে ক্রীতদাসের মত আমেরিকায় পাচার করার অধিকার কে দিয়েছে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষকে? এ ব্যবস্থা কেউ মানবে না!

প্রথম প্রথম সম্পাদকের কাছে কিছু প্রতিবাদ পত্র, পরে সভা-সমিতি, শেষে মিছিল। অনতিবিলম্বে শুরু হয়ে গেল রীতিমত একটা জাতীয় আন্দোলন। গড়ে উঠল 'জাম্বো-রক্ষা-সমিতি।' চিড়িয়াখানার কর্তাব্যক্তিরা পড়লেন মহা

করে দিতে চান। কথাটা চাউর হয়ে গেলে হয়তো খদ্দের ভেগে যাবে।

শেষ পর্যন্ত 'জাম্বো-রক্ষা-সমিতি' আদালতের শরণ নিলেন। বিচারক সাময়িক ইনজাংশন জারী করলেন!

সেদিন লণ্ডনবাসী বালখিল্য বাহিনীর কী আনন্দ! তারা দলে দলে ছুটল চিড়িয়াখানায়। জাম্বোর সম্মানার্থে স্কুল বন্ধ করে দিদিমনিরা চললেন চিড়িয়াখানায়। আশ্চর্য! ইতিমধ্যে জাম্বোও বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তার মেজাজও এখন সরিফ! আবার সে সেলাম করছে, ওদের দেওয়া কেক-রুটি-ক্যাণ্ডি মহানন্দে খেতে শুরু করেছে। ম্যাথু স্কট জনান্তিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলছে: কেমন স্যার? দেখলেন তো?

কিন্তু ব্যাপারটা ততদিনে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের হাতের বাইরে চলে গেছে। ইতিমধ্যে তাঁরা চুক্তিপত্রে সই করে বসে আছেন। টাকা নিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও তাঁরা আর পশ্চাদপসরণ করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে তাঁদের আদালতে পাল্টা দরখাস্ত করতে হল—সাময়িক ইনজাংশন তুলে নেবার জন্য। ফলে আন্দোলনও রইল অব্যাহত। প্রতিদিনই খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়, কার্টুন ছাপা হয়, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এমন কি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমেরিকায় মিস্টার বার্নামকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে শুরু করলেন। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার লণ্ডনবাসীর উৎসাহ দেখে স্বয়ং বার্নামকে একটি প্রিপেড তারবার্তা পাঠালেন:

"সম্পাদকের শুভেচ্ছা। গ্রেট-ব্রিটেনের কয়েক লক্ষ শিশু-বালক-বালিকা জাম্বোর বিদায়-সম্ভাবনায় মর্মাহত। শত শত পত্রলেখক আমার কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইছেন কী সর্তে আপনি জাম্বোকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত। প্রত্যুত্তরের মূল্য দেওয়া রইল।"

আসল কথা ইতিমধ্যে জাম্বো-রক্ষা-সমিতির সদস্যরা দু'হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলে ফেলেছে। খেসারৎ যা লাগে তা তারাই দিতে প্রস্তুত! অনতিবিলম্বে বার্নাম-সাহেবের জবাব এসে গেল:

"ডেলি টেলিগ্রাফ-এর সম্পাদক এবং ব্রিটেনবাসীকে আমার শুভেচ্ছা। পাঁচকোটি আমেরিকান জাম্বোর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে···তাদের আমি নিরাশ করতে পারব না, মাপ করবেন, লক্ষ পাউণ্ড পেলেও নয়।"

এখানেই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।

তৃতীয় অঙ্কের সুর একেবারে অন্য রকম। বার্নাম-সাহেবের টেলিগ্রাফ যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল তার পরদিন থেকেই সমস্ত আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। জাম্বোর বিদায়কে একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করল গ্রেটব্রিটেন। এর পরেও কাগজে ছাপা হল অনেক কিছু, কিন্তু সেগুলি ভিন্ন সুরে বাঁধা। করুণ-রসাত্মক বিদায় কবিতা, মর্মস্পর্শী কার্টুন,--গান বাঁধা হল এই উপলক্ষ্যে। আসন্ন বিদায় নিয়ে ব্যালে-নাচের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। 'এ্যালিস'কে সে নাটকে বা গানে নায়িকার ভূমিকায় দেখা গেল, যদিও বাস্তবে তারা কোনদিন এক খাঁচায় আসেনি। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে বার্নাম-সাহেব স্বয়ং এসে গেলেন। তৈরী হল বিরাট এক খাঁচা—চার ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাবে খাঁচাখানা। লণ্ডনের রাস্তায় সেদিন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ-মানুষ-আর-মানুষ,—তাদের হাতে ধরে, কোলে, কাঁধে ছলছল চোখে লণ্ডনের বালখিল্য বাহিনী। জাম্বো কোন প্রতিবাদ করল না, কারণ সজলচক্ষে ম্যাথু স্কট তাকে শেষ-খাবার খাইয়ে নিজেই উঠিয়ে দিল ঐ খাঁচায়। ম্যাথু স্কটের আদেশ জাম্বো চিরকাল নতমস্তকে মেনে এসেছে--আজও প্রতিবাদ করল না।

১৮৮২ সালের পয়লা এপ্রিল। রাজপথ দিয়ে জাম্বো চলেছে জাহাজঘাটার দিকে। দু'দিকে সার-দিয়ে দাঁড়ানো বাচ্চার দল শুধু বলছে, গুডবাই ডিয়ার ওল্ড জাম্বো।

হঠাৎ বোধহয় জাম্বো বুঝতে পারল ষড়যন্ত্রটা। কোথাও কিছু নেই, সে খাঁচার মধ্যে দিয়ে বার করে দিল তার শুঁড়। জড়িয়ে ধরল ঘোড়ার লেজটা। দিল আপ্রাণ টান। ব্যস্। আর যায় কোথায়! ঘোড়া চীৎকার জুড়ল তারস্বরে। অগত্যা স্থগিত রাখতে হল যাত্রা সেদিনের মত।

বাচ্চারা হেসেই খুন। জাম্বো বার্নাম-সাহেবকে এপ্রিল-ফুল বানিয়েছে। পরদিন কাগজে বার হল এই কৌতুককর দৃশ্যের কার্টুন।

কিন্তু পরদিন তো আর পয়লা এপ্রিল নয়। সেদিন জাম্বোকে যেতেই হল। লণ্ডনবাসী শিশুদের তরফ থেকে বার্নাম-সাহেবকে এক ইংরাজ কবি সংবাদপত্রের পাতায় সেদিন লিখলেন খোলা-চিঠি—কবিতায়। তার শেষ স্তবকটি ছিল :

"And if Mr. Barnum you take him away,
For Our sake, Flo, Fannie, and Bell,
And Maggie and Harry, Fred, Ernest and George,
Who love dear old Jumbo so well,

Be kind to the darling and please let us know,
Every post where you take Jumbo to,
And when he is tired and wants to come home,
Please bring him back safe to the Zoo."

নেহাৎ যাবেই ? শেষ অনুরোধ—শোন বার্নাম দাদু
আমরা সবাই—আমি লতু, মিঠু, প্রীতি, মৌ আর খাঁদু
শেফালী, কানাই, বাবলু, বিল্টু, মতি, রীতা আর আলো
বলি চুপি চুপি : জাম্বোরে মোরা সবাই বেসেছি ভাল।
জাম্বো-সোনা যে প্রাণের বন্ধু কষ্ট দিও না তাকে
জানিও চিঠিতে—কখন কোথায় কেমন জাম্বো থাকে।
আর যদি দেখ বেচারি ক্লান্ত, চাইছে এবার শুতে
দেশে তাকে ফিরে পৌঁছিয়ে দিও এই লণ্ডন-জু-তে॥

লণ্ডনবাসী শিশুদের এই শেষ-প্রার্থনাও রক্ষা করতে পারেননি বার্নাম-সাহেব। আমেরিকায় পুরো তিন বছর নানান অঞ্চলে জাম্বো খেলা দেখিয়েছিল ; কিন্তু তারপর তার মৃত্যু হল মর্মান্তিকভাবে।

অণ্টারিও শহরে খেলা দেখিয়ে একদিন জাম্বো যাচ্ছিল শহরের এক প্রান্ত দিয়ে। রাস্তার মাঝখানে একটা লেভেল-ক্রসিং। ট্রেন আসছে, গেট-ম্যান সঙ্কেত পেয়ে গেটটা বন্ধ করতেও নেমে এসেছে তার গুমটি ঘর থেকে। এমন সময় হঠাৎ বিকটাকার একটা দৈত্যকে দেখতে পেয়ে সে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। জাম্বোর চালক বা জাম্বো তাতে বিচলিত হল না। এভাবে পথের লোক হামেশাই জাম্বোকে দেখে ছুটে পালায়। খোলা গেট পেয়ে গজেন্দ্রগমনে হাসতে হাসতে জাম্বো উঠে পড়ল রেল-লাইনে ; আর তখনই ছুটে এল ইঞ্জিনটা !

প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে জাম্বো ছিটকে পড়ল একদিকে ! রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পাহাড়-প্রমাণ দেহটা ! ট্রেনটা থেমে পড়েছিল—শত শত যাত্রী দেখল জাম্বোর অন্তিম মুহূর্তকয়টি। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে শুঁড় তুলে একবার অন্তিম বৃংহতিতে সে কী-যেন প্রার্থনা জানাল। তারপর লুটিয়ে পড়ল তার রক্তাক্ত মাথাটা ! ঘুমিয়ে পড়ল যেন !

লণ্ডন শহরে তখন মধ্যরাত,—ফ্যানী-ম্যাগি-হ্যারি আর জর্জের দল

কোলে লালেবাই শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বোধকরি স্বপ্নে তারা দেখছে তাদের অতি প্রিয় জাম্বো-সোনাকে !

পিকনিকে যাওয়ার ধুয়োটা তুলেছিল কুহু নিজেই। ক্যাভিয়ে তো একপায়ে খাড়া। ওরা চেয়েছিল পণ্ডিতজীকেও সঙ্গে নিতে ; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বুবু যাবে বলে বায়না ধরেছিল। তাকে আবার নিতে রাজী হল না কুহু। ফলে ওরা দুজনেই রওনা দিল—সঙ্গে শুধু গণেশ-দাদু। আকাশের মেঘলা-মেঘলা অবস্থা দেখে ক্যাভিয়ে সৎ-পরামর্শ দিয়েছিল---মধ্যাহ্ন-আহারের প্যাকেট-লাঞ্চ সঙ্গে নিয়ে যেতে। কুহুর তাতে প্রবল আপত্তি। বনের মধ্যে কাঠ-কুটো কুড়িয়ে খিচুড়ি রান্না করতে না পারলে আবার বনভোজন কিসের ? অগত্যা বড়ামাঈয়ের পিঠে উঠল আর একটা বোঁচকা--চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম।

রওনা দেওয়ার মুখে আর এক বিপত্তি। কে একজন বৃদ্ধমত লোক এসে কুহুর সঙ্গে কী সব বৈষয়িক আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। শোনা গেল তিনি কুহুর বড়ুয়াকাকা, কাঠ-গুদামের ম্যানেজার। কাঠ গুদামটা আবার কি ? তারও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। বড়গোঁহাই পরিবারের জমিদারীর দিন শেষ হয়েছে। হাতী-ধরার ব্যবসাও টিমটিম করছে। তাই জমিদারীর খেসারত বাবদ যে টাকা পাওয়া গেছে এখন সেটা খাটছে ব্যবসায়ে। জঙ্গলের মানুষ আর কী ব্যবসা জানে ? ধরেছে কাঠ-চালান দেবার ব্যবসা। মোহনপুরেই খোলা হয়েছে একটা কাঠের গোলা এবং বিদ্যুৎচালিত কাঠ-চেরাইয়ের করাত-কল। বড়ুয়াকাকু তার সর্বেসর্বা। ঐ কাঠের কারবার থেকেই নাকি বর্তমানে বড়গোঁহাই পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। তবে অরণ্যচারী লালচাঁদ এবং গ্রন্থ-কীট ওঙ্কারনাথ ওসব ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজী নন। তাঁরা কিছুই দেখা-শোনা করেন না। যা-কিছু দায়িত্ব তা ঐ বড়ুয়াকাকুর। মায় দু'ভাই একেবারে ঝাড়া-হাত-পা হবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে কুহুকে এসব ব্যাপারে সইসাবুদ করার পাকা ওকালত-নামা দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড়ুয়াকাকুকে মাঝে মাঝে খাতাপত্তর এনে সই করিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

বড়ুয়াকাকু নবাগত সাহেবকে বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন তাঁর কাঠ-গুদামে একবার পদধূলি দিতে। ক্যাভিয়ে সবিনয়ে জানাল, সে নিশ্চয় আসবে দু-এক দিনের ভিতর।

বড়ুয়াকাকু চলে যাবার পর কুহুকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হল। একটু

উত্তেজিতও। ক্যাভিয়ে কারণটা জানতে চায়: উনি কি কোন দুঃসংবাদ দিয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ। ঐ চন্দন।

চন্দন! চন্দন কে? চকিতে মনে পড়ে গেল ক্যাভিয়ের। গদাধরের তীরে সেই অবাক-সন্ধ্যায় একটি বিচিত্রবর্ণা ময়ূরের কেকারব মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিয়েছিল ছোকরা। এবার কি কুহুরব বন্ধ করতে চাইছে? না হলে মেয়েটি এমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন হঠাৎ?

বললে, কী করেছে ছোকরা?

—বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে নাকি—

—লোকটা যদি ক্রমাগত গোলমালই পাকাতে থাকে তবে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—বাবা যে ওকে কী চোখে দেখেছেন, কোন কথাই শুনতে চান না।

বোঝা গেল। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। ছোকরা স্বয়ং বড়কর্তার পেয়ারের। তাই পাওয়ার-হাউসের বড়ুয়াকাকু অথবা কারবারের পাওয়ার-অফ-এ্যাটর্নি-হোল্ডার কোন পাওয়ার খাটাতে পারছেন না।

হাতীর পিঠে রওনা হবার পর ধীরে ধীরে কুহু আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। খোলা আকাশের এমনই মহিমা। মনটা আপনা থেকেই উদার হয়ে ওঠে। গল্পগুজবে বেশ মেতে ওঠে কুহু। তার মনের মেঘ খোলা হাওয়ায় কখন উড়ে গেছে। ক্যাভিয়ে জানতে চায়, আমরা কোথায় যাচ্ছি পিকনিক করতে?

—ওহো! সে কথা তো এখনও আপনাকে বলাই হয়নি। আমরা যাচ্ছি গদাধর আর মিতালী নদীর সঙ্গম-স্থলে। ভারি সুন্দর জায়গাটা।

—কী নাম জায়গাটার?

—নাম? ও হ্যাঁ, নাম জানার বাতিক আছে বটে আপনার। ওর দেশীয় নাম 'চুইর্ঘাবিয়া', যার ইংরাজি অনুবাদ হবে 'হনিমুন-স্পট'।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। এটার কথা তো আপনি আগেও বলেছেন।

—তা বলেছি। আপনার কপালের জোর থাকলে আজ দুর্লভ একটি বিবাহ-উৎসবও দেখতে পারেন—কারণ আজকের তিথিটা হচ্ছে পূর্ণিমা!

খুব খুশি হয় ক্যাভিয়ে। মুভি ক্যামেরা তার লোড করাই আছে। ভাগ্যে থাকলে সে আজ একটি মাহুতকন্যার বিবাহ-অনুষ্ঠান ক্যামেরায় তুলে নেবে। টেপ-রেকর্ডারও আছে। ব্যাটারী-সেট। ঐ সঙ্গে সেই গানটিও রেকর্ড করে নেবে। সেই—'নেকান্দিবি মা লো আমার।'

ওদের যাত্রাপথ বেশ চওড়া। বাঁধানো সড়ক। বিরাট একটা অরণ্যকে বেষ্টন করে পাক খেতে খেতে ওরা যাচ্ছিল গদাধরের অববাহিকা ধরে। পথের বাঁ দিকে বিরাট গাছের সারি—আসামের অরণ্যসম্পদ; আর ডানদিকে স্বচ্ছতোয়া কলনাদী গদাধর চলেছে নৃত্যের তালে তালে। পথটা পাকা নয়, পাথুরে। এ-পথেই গো-গাড়ি আর মহিষ-গাড়ি বোঝাই হয়ে অরণ্যসম্পদ আসে শহরাঞ্চলে। আসে বাঁশ, শাল, গাম্‌হার, চাকলাম। আজকাল ট্রাকও চলছে এ-পথে।

মাইল ছ'য়েক এই পথ ধরে এগিয়ে যাবার পর গণেশের নির্দেশে বড়ামাঈ নদীজলে নেমে পড়ল। গদাধর এখানে বেশ চওড়া, জল স্বচ্ছ, অগভীর। হাতী পারাপারের চিহ্নিত স্থান আছে। বড়ামাঈ অনায়াসে নদী পার হল। ওর পেটের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডুবে গেল বলে, হাওদা ভিজল না। ওপারে পৌঁছে এবার ওরা প্রবেশ করল গভীর অরণ্যে। আর চিহ্নিত সড়ক নেই—কাঠুরিয়াদের যাতায়াতের জন্য পথের লতাগুল্ম কেটে ফেলা হয়েছে। সেই চিহ্নরেখা ধরে এগিয়ে যেতে হবে। নদীর তীর বরাবর আদিগন্ত কী একটা গাছের ঝোপড়া—ভারি অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ আছে সেই ঝোপের। কুহুকে প্রশ্ন করে জানা গেল তাকে ওরা বলে বনতুলসী। ঐ ঝোপের পরেই বড় বড় গাছের সারি। তলায় হরেক রকমের অর্কিড আর লতাগুল্ম। হাল্‌কা বেগুনি রঙের এক জাতের ফুল ফুটেছে অজস্র—অনেকটা মর্নিং-গ্লোরির মত দেখতে আকারে কিছু ছোট। এছাড়া হলুদ আর লালে মেশা আর এক জাতের থোপা থোপা ফুলও ফুটেছে প্রচুর। তার নাম জানা গেল না। ওরা এককথায় তার জাত নির্ণয় করে জংলী-ফুল।

মাইল চারেক ঐ জঙ্গল ভেঙে একটা ফাঁকামত জায়গায় হাতীটাকে দাঁড় করানো হল। কোন এক জাতের ঘাস ছিল এককালে এই ফাঁকা মাঠে। হয় সেগুলি দাবানলে জ্বলে গেছে অথবা 'পড্ডুচাষ'-এর জন্য জংলীরা পুড়িয়ে জমি হাসিল করবার চেষ্টা করেছে। মোট কথা ঘাসের জঙ্গলটা পুড়ে গেছে। ক্যাভিয়ের নজর পড়ল অদূরে, একটা চালাঘর দেখা যাচ্ছে। ছেঁচা বাঁশের দেওয়াল, উপরে গোল-পাতার ছাউনি। এ বিজন অরণ্যে ওটা কার কুটির?

হাতীর শুঁড়ে পা দিয়ে কুহু মাটিতে নামে। সঙ্গীকেও ডাকে, আসুন, নেমে আসুন ক্যামেরাটা নিয়ে।

—কেন? নামব কেন? কী ব্যাপার?

—আঃ! বড় তর্ক করেন আপনি! রোমে এসেছেন, রোমান হতে হবে।

এটা হচ্ছে বুড়োবাবার আস্তানা। ঐ ঘরটা দেখছেন? ওখানে আছেন নেহালদাদা,—ঐ অরণ্যদেবতার সেবায়েত! এটা হচ্ছে চুইঘরে যাবার পথে একটা হল্টিং স্টেশান। এখানে নেমে বুড়োবাবার পূজা চড়িয়ে দিতে হবে—তবে চুইঘরে যাবার 'ভিসা' পাবেন। বুঝেছেন?

বাধ্য হয়েই নেমে আসতে হল ক্যাভিয়েকে। ওদের সাড়াশব্দ পেয়ে গোলপাতার ঘর থেকে বার হয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ ফকির অথবা সন্ন্যাসী। প্রায় গণেশ-দাদুর সমবয়সী। একমাথা সাদা বাব্‌রি চুল, একমুখ দাড়ি; পরনে গেরুয়া রঙের একটা লুঙ্গি, খালি গা. কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ত্রিশূল। কুহু আর গণেশ তাঁকে প্রণাম করল, ক্যাভিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল।

বৃদ্ধ রোদ-আড়াল-করা হাতের তলা দিয়ে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে ক্যাভিয়েকে আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে গভীরকণ্ঠে বললেন, লেতেরা-সাহেব আছে?

গণেশ-সর্দার মাথা নেড়ে শুধু বললে: হয়, দেউতা—

এটুকু কথোপকথনের মর্মোদ্ধার করা গেল, কিন্তু তার পরেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন একটা প্রশ্ন করলেন কুহুকে। মনে হয় সে প্রশ্নে কুহু অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে। মাথা নেড়ে সে দৃঢ়স্বরে কোন একটি অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। ওদিকে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে গণেশ-সর্দার। ব্যাপারটা কি হল বোঝা গেল না। শেষে গণেশ-সর্দারই ওদের সমস্যাটার মীমাংসা করে দিল। কুহু তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে নেহালদাদাকে প্রণামী দিল। তিনি আশীর্বাদ করলেন।

আদিবাসী আর মাহুতদের দেবতা বুড়োবাবার ফটো নেওয়া হল। বিরাট একটা অশ্বত্থগাছের তলায় সিন্দুর-চর্চিত এই পাথরের দেবতা নাকি খুবই জাগ্রত। পাথরে নাক-কান-চোখ-মুখের কোন আভাস পাওয়া গেল না। ঐ বৃদ্ধ নেহালদাদা এই অরণ্য-কুটিরে একেবারে একা থাকেন। পালে-পার্বণে মাহুতেরা পূজা দিয়ে যায়। চিরাগ জ্বালিয়ে যায়। তাছাড়া প্রায় প্রতি পূর্ণিমাতেই বরযাত্রী কন্যাযাত্রীরা বাবার পূজা চড়ায় এ-পথ দিয়ে চুইঘরে যাবার আগে।

নেহালদাদার কাছে বিদায় নিয়ে হাতীর পিঠে ফিরে এসে ক্যাভিয়ে জানতে চায় ওদের কথোপকথনের মর্মার্থ। এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল কুহু। বললে, সব কিছুতেই অত কৌতূহল ভাল নয়!

আবার অট্টহাস্য করে ওঠে গণেশ-দাদু। নিমেষে হাটের মাঝে হাঁড়িটা সে ফাটিয়ে দিল; বললে, নেহালদাদা ভাবিছে কি কুহুদিদি সাঙা করিবকে যাইছে! তোর সাথে উর সাঙা হব দিয়াছোন!

গণেশ-সর্দারের মত আকাশ-ফাটানো অট্টহাস হাসতে গেল ক্যাভিয়ে; কিন্তু পারল না। হাসিটা বেমক্কা আটকে গেল ওর গলায়! কী কাণ্ড! তা নেহালদাদাকে দোষ দেওয়া যায় না। আজ তিথিটা হচ্ছে পূর্ণিমা; মেয়েটি যতই কেন না আধুনিকার সাজে সেজে আসুক—নেহালদাদা জানে সে মাহুত-পরিবারের মেয়ে। ফলে এমন সন্দেহ জাগা খুব কিছু অস্বাভাবিক নয় বুড়োর পক্ষে।

চুইঘরিয়াতে ওরা এসে পৌছল আরও ঘণ্টা খানেক বাদে। জায়গাটা সত্যই অপূর্ব। না, আর কোন যাত্রী নে সমস্ত তল্লাটটা জনমানববর্জিত। দুর্ভাগ্য ওদের, আজ কোন মাহুতকন্যা স্বয়ম্বরা হচ্ছে না। হাতী থেকে ওরা নেমে পড়ল। ঘুরে ঘুরে দেখল চুইঘরটাকে। চারটে মোটা মোটা শালখুঁটির উপর মাটি থেকে প্রায় ফুট-দশেক উঁচুতে ঐ ঘরটি বানানো। চওড়ায় প্রায় হাত চারেক, লম্বায় ছয়-সাত হাত হবে। উপরে গোল-পাতার ছাউনি। চারটি খুঁটির পায়া লতাগুল্ম দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, আর তা থেকে ঝুলছে অসংখ্য ছোট ছোট পোড়ামাটির পুতুল। শোনা গেল, প্রতিটি বিবাহের সাক্ষ্য একজোড়া পুতুল। এই নাকি লোকাচার। বরবধূ স্বহস্তে এক-একটি পুতুল ঝুলিয়ে দিয়ে যায়।

আকাশে মেঘলা ভাব তখনও আছে। রোদের তেজ নেই। কুহু রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত। ক্যাভিয়ে আর গণেশ শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে দিল। বড়মাঈ বালতিতে করে জল বয়ে নিয়ে এল গদাধর থেকে।

ভারি ভাল লাগছিল অরণ্যের অন্তস্থলে এই নির্জন পরিবেশ। কুহু যতক্ষণ রান্না করল ক্যাভিয়ে ততক্ষণ ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু শিকার করল ওর ক্যামেরায়। কত রঙ-বে-রঙের প্রজাপতি, পাখি, বাঁদর মায় একজোড়া চিত্রল হরিণ। একটা কৌতুককর ঘটনাও ধরা পড়ল ওর মুভি ক্যামেরায়। বন থেকে হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে এল একটা মুরগী আর তার পিছন পিছন কেশর ফোলানো একটা বন-মোরগ। কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্ কোঁ করে এল। মুরগীটা তার প্রেমাস্পদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে এসে চারটি গাছের গুঁড়ির জঙ্গলে হঠাৎ যেন লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। লুকোচুরি খেলায় মত্ত ওরা দুজনেই খেয়াল করে দেখেনি যে, ঐ চারটি গাছের গুঁড়ির মালিক হচ্ছেন বড়মাঈ। ওগুলি

গাছ নয়—হাতীর পা। হঠাৎ এই নিদারুণ সত্যটা দুজনে একই সঙ্গে বুঝে ফেলল বড়ামাঈ বিরক্ত হয়ে একটা প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস ফেলায়। তৎক্ষণাৎ কুক্কুট-দম্পতির সে কী মর্মবিদারক তিরোভাব!

দৃশ্যটা কুহুও দেখেছিল। হেসে লুটিয়ে পড়ে সে। বলে, ধরতে পেরেছেন ক্যামেরায়?

—সিওর। আদ্যোপান্ত সবটা!

—ফটো উঠলে আমাকে পাঠাবেন তো?

নিশ্চয়!

—এদিকে আমার রান্না হয়ে গেছে। চলুন স্নান করে আসি।

— স্নান? সে তো সকালেই করে এসেছি!

—তাতে কি? এমন জল দেখে জলে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না।

—আমি যে কোন চেঞ্জ আনিনি।

—তা কি আমিই এনেছি ছাই? ও ভিজে কাপড় আপনিই গায়ে শুকিয়ে যাবে। আসুন!

ক্যাভিয়ে এ পাগলামিতে রাজী হতে পারে না। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, এখন 'চেঞ্জ-অফ-সিজন'। এ সময় সারাদিন গায়ে ভিজে কাপড় শুকানো ঠিক নয়। অগত্যা কুহু বলে, তবে আসুন লুকোচুরি খেলি।

—লুকোচুরি। মানে?

—হাইড-এ্যাণ্ড-সীক্। আমি জঙ্গলে গিয়ে বলব—'টুকি'। আপনি আমাকে খুঁজে বার করবেন।

ক্যাভিয়ে এক কথায় ওকে থামিয়ে দেয়, ক্ষেপেছেন? আমরা কি বাচ্চা? শেষ পর্যন্ত আমাদের অবস্থা ঐ কুক্কুট-দম্পতির মত হবে। হঠাৎ দেখব কোন ম্যান-ঈটারের চারপায়ের মধ্যে আমরা লুকোচুরি খেলছি।

খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে কুহু। বলে, আপনি কোন কাজের নন ব্যারন-সাহেব।

আজকাল কুহু মাঝে মাঝে ওকে ব্যারন-সাহেব বলে ডাকছে।

আহারাদির পর ক্যাভিয়ে বললে, মিস্ কুহু, এবার আপনি একটা গান করুন, আমি টেপ-রেকর্ড করব!

কুহু বলে, ওমা! আগে বলতে হয়! ভর পেট খিচুড়ি খেয়ে গান গাইব কি ব্যারন-সাহেব? তার চেয়ে আমি বরং একটা পোস্ দিয়ে দাঁড়াই। আমার একটা ফটো তুলুন।

—ফটো? আপনার অসংখ্য ফটো তো ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছি।

—সে কি! আমি যে জানতেও পারিনি!

—টেলিফোটো লেন্সে জানবার সুযোগ আপনি পাবেন কেমন করে? জানতে পারলে বনের কোন পাখি আমাকে কি ফটো তুলতে দিত? আগেই উড়ে পালাত।

—আমি কি বনের পাখি?

—ঠিক তাই। আপনার নামেই তার পরিচয়।

কুছ মিষ্টি হেসে বললে, আজ ব্যারন-সাহেবকে একটু বেশি রকম রোমান্টিক মনে হচ্ছে যেন।

ক্যাভিয়ে হেসে বলে, অস্বীকার করছি না—জানি না স্থান-মাহাত্ম্যে, না সঙ্গদোষে।

—লক্ষণ ভাল নয়। এবার চলুন আপনাকে চুইঘরটা দেখিয়ে আনি।

—আচ্ছা, ওতে ওঠে কেমন করে? কোন মই তো দেখছি না?

—আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

চুইঘরে প্রবেশের একটিই সিংহদ্বার। গজপৃষ্ঠে। ওরা তিনজনেই আবার উঠল বড়ামাঙ্গীয়ের পিঠে। বড়ামাঙ্গীকে গণেশ চালিয়ে নিয়ে এল চুইঘরের প্রবেশ-দ্বারের কাছে। এখন ওদের হাওদা আর ঐ ঘরের মেঝে প্রায় এক সমতলে। দেখা গেল ঘরের মেঝেটা চেরা-বাঁশের। তার উপর পুরু করে বিছানো আছে বিচালি এবং বিচালির উপরে বেতের-বোনা একটা চাটাই। অনেক শুকনো ফুল ছড়ানো রয়েছে সেই চাটাইয়ের উপর। বোঝা যায়, মাস-খানেক আগে এখানে একটি সদ্য-সীমন্তিনী তার ফুলশয্যা পেতেছিল

ক্যাভিয়ে সাবধানে হাতীর পিঠ থেকে চুইঘরে লাফিয়ে নামে। তারপর এদিকে ফিরে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। বলে, আসুন। সাবধানে পা ফেলুন।

কুছ হঠাৎ ভীষণ লজ্জা পায়। দৃঢ়স্বরে মাথা নেড়ে বলে, না, না, না।

আর গণেশ-সর্দার আকাশ-ফাটানো অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

কী ব্যাপার?

কুছ দুর্বোধ্য ভাষায় তার দাদুকে ধমক দেয়। তাতে কিন্তু বুড়োর হাসির বেগ বেড়েই যায়। এতক্ষণে ক্যাভিয়ে বুঝতে পেরেছে তার ভুলটা। কোন কুমারী মাহুতকন্যা চুইঘরে এভাবে ঢোকে না পর-পুরুষের হাত ধরে! যতই আধুনিকা হ'ক, পুণ্ডরীকের কন্যা তার এ আদিম সংস্কারকে জয় করতে পারে-

নি। লজ্জিত হয় ক্যুভিয়ে, ক্ষমা চায়। বলে, আয়াম সরি। আমি ভেবে-ছিলাম আপনার ও-জাতীয় সংস্কার নেই।

হঠাৎ কি হল, মত বদলে গেল কুহুর। হাতীর পিঠে চট করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, নেই-ই তো। আমার হাতটা ধরুন তো—

ক্যুভিয়ে আবার হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ গণেশও চটে উঠল। কী যেন বলল। দাদু ও নাতনীর দু-চারটে দুর্বোধ্য-ভাষায় আলাপচারী। কাটা-কাটা কথা কেটে-কেটে বসল যেন। তারপর গণেশ প্রায় একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। গজভাষায় কী একটা আদেশ করল বড়ামাঈকে। তৎক্ষণাৎ এক পা হটে এল হাতীটা। চুইঘরের প্রবেশপথ থেকে হাত দু'য়েক দূরত্ব সৃষ্টি হল, কিন্তু বেপরোয়া দুর্ধর্ষ মেয়েটি ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সামনের দিকে

পদস্খলন হলে ঐ দশফুট উঁচু থেকে সে পড়ত ভূপৃষ্ঠে, কিন্তু মেয়েটা যেন চিতাবাঘিনী। লাফ দিয়ে সে পৌঁছে গেল চুইঘরে। ক্যুভিয়ের প্রসারিত হাতটা সে ধরতে পারেনি। সবলে আলিঙ্গন করে ধরল তাকে। দুজনেই উল্টে পড়ল খড়ের গাদায়। চাটাইয়ের উপর।

গণেশ-সর্দারের চোখ দুটো তখন জ্বলছে। ভ্রূক্ষেপ করল না কুহু। ভারসাম্য রক্ষা করতে যে ক'টি মুহূর্ত ওকে জড়িয়ে ধরে থাকার কথা তার চেয়ে বোধকরি কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল ক্যুভিয়ের। নারীদেহের স্পর্শ তার একেবারে অজানা নয়, কিন্তু আজ কী যে হল তার—

সম্বিত পেয়ে দুজনে যখন উঠে দাঁড়াল তখন দেখা গেল গণেশ-সর্দার বড়া-মাঈকে চালিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে ও? ক্যুভিয়ে চীৎকার করে ডাকল তাকে। ভ্রূক্ষেপ করল না গণেশ। গোঁজ হয়ে সে বসে আছে হাতীটার চুলটি ধরে। হেলতে দুলতে বড়ামাঈ মিশে গেল অরণ্যে।

কী কেলেঙ্কারী। ওরা দুজনে মাটি থেকে দশফুট উঁচুতে বন্দী! গণেশ-সর্দার যদি নিজে থেকে ফিরে না আসে তাহলে এই ত্রিশঙ্কু-লোক থেকে কেমন করে সভ্যজগতে ফিরবে ওরা? ক্যুভিয়ে ইতস্ততঃ করে বলে, আপনি ওর অবাধ্য না হলেই পারতেন।

কুহু একেবারে অন্যমনস্ক ছিল। কী ভাবছিল সে। অন্যমনস্কের মতই বললে, উঁ?

—বলছিলাম, গণেশ-দাদু যদি নিজে থেকে ফিরে না আসে তাহলে নামব কেমন করে?

অদ্ভুতভাবে হাসল কুহু। সম্বিত ফিরে পেয়েছে সে। বললে, নেমে কি হবে?

—বাঃ! এখান থেকে উদ্ধার পেতে হবে না?

—এখন এই কথাটাই মনে হচ্ছে আপনার?

—হবে না? কী বিশ্রী অবস্থায় পড়েছি বলুন তো?

কুহু নিজের জামা-কাপড় সামলে নেয়। বলে, তা ঠিক। তবে আপনার ভয় নেই। গণেশ-দাদু এখনই ফিরে আসবে।

এলও তাই। গণেশ-সর্দার তো আর পাগল নয় যে, ওদের ঐ অবস্থায় রেখে ফিরে যাবে! রাগ পড়ে যেতে সে ফিরে এল। ওরা নেমে এল মাচাও থেকে। গণেশ ইতিমধ্যে বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। কুহুও। দুজনের কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে। মাচাও থেকে নেমে এসে ক্যাভিয়ে কিন্তু উৎফুল্লতা ফিরে পেয়েছে। ক্রমে কুহুও স্বাভাবিক হয়ে এল।

কথা ছিল সন্ধ্যার পরও ওরা কিছুক্ষণ থাকবে। এক মুঠো পূর্ণিমা রাত্রির স্বাদ নিয়ে আসবে, কিন্তু কী যে হল কুহুর—সে কিছুতেই এখন তাতে রাজী হল না। অগত্যা দিনের আলো থাকতে থাকতেই ওরা ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হল। ক্যাভিয়ে বলে, এর চেয়ে ভাল হনিমুন-স্পট আমি চিন্তাই করতে পারি না।

কুহু তার বাসন-পত্র গুছিয়ে তুলছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বললে, তাই নাকি? তাহলে নিমন্ত্রণ করে রাখলাম। বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে এখানে চলে আসবেন। 'চুইঘরে' ফুলের বিছানা পেতে দেব।

ক্যাভিয়ে ওকে হাতে হাতে সাহায্য করছিল। বললে, সে প্রতিশ্রুতি কোন্ ভরসাতে দিই বলুন কুহুদেবী? যাকে বিয়ে করব তিনি হয়তো হনিমুনের জন্য কোন খানদানি হোটেলের বাতানুকূল-করা কক্ষের স্বপ্ন দেখছেন।

—তা বটে!

—এই জন্যেই তো আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে কাউকে ও-ডাক দিতে সাহস পাইনি।

এবারও মুখটিপে কুহু সংক্ষেপে বললে, ভেরি স্যাড।

ক্যাভিয়ে একটু আহত হল। বললে, আপনি ব্যঙ্গ করছেন!

—কী বলতে চাইছেন বলুন তো?—হাতের কাজ সরিয়ে রেখে কুহু তার কাজলকালো চোখের দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করে।

—আমি অরণ্যকে ভালবাসি, প্রকৃতিকে ভালবাসি—সহজ-সরল জীবনকে ভালবাসি। এটা কি আমার অপরাধ?

—কে বলছে অপরাধ?

—না, কেউ বলছে না! অথচ আমার জীবনে আমি এমন মেয়ের সাক্ষাৎ পেলাম না যে আমার মত করে বাঁচতে চায়। যে আমার মত প্রকৃতিকে ভালবাসে, অরণ্যকে ভালবাসে—নাগরিক-জীবনের মোহে যে নিজের আত্মা বিকিয়ে দেয়নি! এমন মেয়ের দেখা সত্যিই আমি পাইনি যে, ঐ চুইঘরে আমার হাত ধরে হনিমুনের রাত কাটাতে রাজী হবে।

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে কুহু। বলে, ওমা, তা এতক্ষণ বলেননি! কেন? আমিই তো রাজী আছি! বলেন তো আজ রাতে আমরা দুজন ওখানেই থেকে যেতে পারি। গণেশ-দাদুকে শহরে পাঠিয়ে দিই —একজোড়া মাটির পুতুল কিনে আনুক!

বেদনায় অন্তঃকরণটা মুচড়ে ওঠে ক্যাভিয়ের। বুঝতে পারে—এতদিন একটা দিবাস্বপ্নই দেখে এসেছে সে। কুড়ি বছরের ব্যবধানটা এতই দুর্লঙ্ঘ্য যে কুহু এমন একটা মারাত্মক ঠাট্টা করতে কোন সঙ্কোচ বোধ করছে না। ভাগ্যে সে নিজের মন মেলে ধরেনি মেয়েটির কাছে। ঠিকই তো। ওর আর লুকোচুরি খেলার বয়স নেই, শুকনো বপ্নের কথা ভুলে তরঙ্গমুখর জলস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ার যুগ সে পার হয়ে এসেছে।

—কি হল? আমাকে পছন্দ হয় না ব্যারন-সাহেবের?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল ক্যাভিয়ে। ম্লান হেসে বললে, তোমার সঙ্গে যে আমার বিশ বছরের ব্যবধান কুহু।

হঠাৎ সে নিজেকে এতবড় বলে অনুভব করল যাতে ওর নাম ধরে ডাকতে আর কোন কুণ্ঠা বোধ করল না। এ তো আর অন্য সুরে নাম ধরে ডাকা নয়। কুহু কিন্তু একই সুরে বললে, সো হোয়াট? গণেশ-দাদুর চেয়ে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিশ বছরের ছোট ছিল।

—জানি। তাই গণেশ-দাদুকে নিয়ে তিনি সুখী হতে পারেননি।

—না। ভুল বুঝেছেন আপনি। বয়সের তফাৎটা তার কারণ নয়। আমার ঠাকুমা ছিল মাহুতের মেয়ে। ফাঁস দিয়ে হাতী ধরার নেশা ছিল তার রক্তে। তাই সে ঘর ছেড়েছিল।

—বুঝলাম না!

—বুঝলেন না? গণেশ-দাদু তার কাছে ছিল পোষমানা কুম্‌কি হাতী। তাকে নিয়ে মন ভরেনি আমার ঠাকুমা, ময়নার। তার নজরে পড়েছিল একটা বুনো হাতী—জোয়ান, দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া—ঐ দিলদার! 'তোমার হাতে বজ্র,

আঁচলের ফাঁস দিয়ে পাগলা হাতী ধরতে।

—আর তোমার মা? তিনি কেন ঘর ছেড়ে ছিলেন?

—সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে। তিনি মাহুতের মেয়ে ছিলেন না। তিনি ছিলেন লেখাপড়া-জানা সভ্য দুনিয়ার মেয়ে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বিদ্রোহীর মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

—আর তুমি?

—কী আমি?

—তুমি কেমন মানুষের স্বপ্ন দেখ? জোয়ান, দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া? দিলদারের মত গুণ্ডা হাতী?

এক মুহূর্ত নীরব রইল কুহু। তারপর মুখ নিচু করে বললে, কি জানি! আমি ওটা ভেবে দেখিনি।

হঠাৎ ওর হাতখানা তুলে নিল ক্যাভিয়ে। দু'হাতে মৃদু চাপ দিয়ে গাঢ় আবেগের সঙ্গে বললে, কিন্তু ভেবে দেখার সময় তো হয়েছে কুহু। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ না একবার—তুমি তোমার ঠাকুমার নাতনি, না মায়ের মেয়ে?

কুহু সত্যই অবাক হল কি না বোঝা গেল না—অবাক দুটি চোখ মেলে শুধু বললে, ঠিক কি বলতে চাইছেন বলুন তো?

—আমি দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া নই, তবে আমি কাপুরুষও নই। লুকোচুরি খেলার বয়স আমার পার হয়েছে—তবু ঘর বাঁধার দিন আমার ফুরায়নি। তোমারই মত আমি অরণ্যকে ভালবাসি, প্রকৃতিকে ভালবাসি—আর বিশ্বাস কর কুহু, তোমাকেও—

কুহু অনেকক্ষণ জবাব দিল না। কী ভাবছে সে? তার হাতটি তখনও ধরা আছে ক্যাভিয়ের মুঠিতে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললে—আর য়ু সিরিয়াস?

—নিশ্চয়। বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

—কেমন করে হবে? আপনি খানদানি ব্যারন-বংশের ছেলে, আমি মাহুতের মেয়ে, আমি কালো, আমি—

—প্লীজ, অমন করে বল না!

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় কুহু। বলে, আচ্ছা, আসুন তো আমার সঙ্গে। দেখি আপনি সত্যি কথা বলছেন কি না!

ক্যাভিয়েকে হাত ধরে সে টেনে নিয়ে আসে যেখানে আপন মনে গাছপাতা

চিবাচ্ছিল বড়ামাঈ। ক্যাভিয়েব হাতটা ছেড়ে দিয়ে হাতীটার শুঁড়ে, পায়ে হাত বুলিয়ে আদব কবে। তারপব হাতীটাকে প্রশ্ন কবে, বডমা, একটা কথা জানতে এলাম। সত্যি কথা বলবে। এই ব্যাবন-সাহেব বলছেন—উনি আমাকে ভালবাসেন, আমাব কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি বল তো উনি কি আমাকে সত্যিই ভালবাসেন?

ক্যাভিয়ে একেবাবে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বডামাঈ ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে পবিষ্কাব জানাল- না।

—উনি আমাব সঙ্গে বসিকতা কবছেন, নয়? দু'দিন পবেই আমাকে ডিভোর্স কবে কোন টুকটুকে মেমসাহেবকে উনি বিয়ে কববেন,—তাই না?

বডামাঈ এবাব উপবে নিচে মাথা দুলিয়ে বলল—হ্যাঁ।

কুন্থ এবাব তাব প্রণয়াব দিকে ফিবে বলল, ছিঃ ব্যাবন-সাহেব। সবল একটা গাঁয়েব মেয়েকে এভাবে 'সিডিউস্' কবতে হয়?

ক্যাভিয়ে স্তম্ভিত। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। এ কী ঈশপেব দুনিয়ায় এসে পডেছে সে। মানুষেব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কবছে হাতী। কিন্তু এ যে ওব প্রত্যক্ষ কবা ঘটনা। হাতী কি মানুষেব ভাষা এমনভাবে বুঝতে পাবে? বোধ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এমন একটা কঠিন প্রশ্নেব মীমাংসা সে কবে দিতে পাবে? হঠাৎ নজব হল সে একা দাঁডিয়ে আছে বডা হাতীটাব সামনে নিমেষমধ্যে ক্যাভিয়েকে লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক প্রমাণিত কবে গজেন্দ্রসম্রাজ্ঞী যথাবীতি মাছি তাডাতে ব্যস্ত হয়ে পডেছেন। তালে তালে দুলছেন ডাইনে-বাঁয়ে সামনে পিছনে। কুন্থ ফিবে গেছে গণেশ-সর্দাবেব কাছে মালপত্র গুছিয়ে তুলতে। গণেশ অস্তসূর্যেব দিকে মুখ কবে নমাজ পডছে।

ফেবাব পথে ওবা-দুজনে আব কোন কথা হল না। অতবড একটা সাম্রাজ্যে এডাহাংকে নস্যাৎ কবে কিভাবে তাব প্রেমেব ঐকান্তিকতা ঐ মেয়েটাকে বুঝাবে সে ভেবে তা ভেবে উঠতে পাবে না বেচাবি।

পবেব দিন ও গুরুঙ্কাবনাথেব শবণাপন্ন হল, পণ্ডিতজী, আচ্ছা বলুন তো হাতী কি মানুষেব ভাষা বুঝতে পাবে?

—তা কিছুটা পাবে বই কি। মাহুত তাকে বসতে বলে, উঠতে এগিয়ে যেতে, পিছিয়ে আসতে, হাঁটতে, দৌডাতে, শুয়ে পডতে বলে—সেই শব্দের অর্থগ্রহণ হাতী কবতে পাবে। সুতরাং ওদেব শ্রবণশক্তি এবং শব্দেব অর্থ গ্রহণ ক্ষমতা কিছুটা আছে মানতেই হবে।

—কিন্তু সে তো ছোট ছোট আদেশ। নিত্য শ্রবণে সেটা অভ্যাসের পর্যায়ে পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, কোন হাতীকে বেশ বড় একটি জটিল প্রশ্ন করলে সে কি তার জবাব দিতে পারবে?

—হঠাৎ এ-কথা জানতে চাইছেন কেন?

বাধ্য হয়ে ক্যাভিয়ে তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে জানাল। কুহু ঠিক কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তা গোপন রেখে মোটামুটি ঘটনাটার একটা বর্ণনা দিল। প্রশ্নটা কী ছিল তা জানতে চাইলেন না পণ্ডিতজী। তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন। শেষে হাসি থামিয়ে বলেন, কুহু আপনার 'লেগ পুলিং' করেছে!

—মানে?

—তাহলে আপনাকে একটা গল্প বলি। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। আমেরিকার ওহিও স্টেটের ক্লীভল্যাণ্ডে একটা সার্কাসে তখন খেলা দেখাত একটা হাতী—তার নাম 'পিকানিনি'। একদিন ক্লীভল্যাণ্ডের মেয়রের সঙ্গে সার্কাসের মালিকের তর্ক হচ্ছিল— পিকানিনি কত জোরে দৌড়াতে পারে! সার্কাসের মালিক বললেন—আধঘণ্টায় সে অন্তত তিন মাইল দৌড়ে যেতে পারে। অতবড় জীবটা আধঘণ্টায় তিন মাইল দৌড়তে পারবে এটা বিশ্বাসই হল না মেয়র-সাহেবের। অগত্যা দুজনে বাজি ধরলেন। বেশ মোটা অঙ্কের বাজি। শহরের অনেক লোক দেখতে এল হাতীর দৌড়। পিকানিনি তার মাহুতকে পিঠে নিয়ে দৌড় শুরু করল। স্টপ ওয়াচ হাতে রেফারি সময়ের হিসাব রাখছেন। মাত্র আট মিনিটের ভিতর পিকানিনি প্রথম মাইল অতিক্রম করল। আশা-নিরাশায় দু'পক্ষই তখন দোদুল্যমান। প্রথম মাইল আট মিনিটে হলে অঙ্কের হিসাবে তিন-আটে চব্বিশ মিনিটে সে তিন মাইল অতিক্রম করতে পারবে না; কারণ ক্রমশঃ সে হাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু দেখা গেল—দ্বিতীয় মাইল অতিক্রম করছে পিকানিনি সমান বেগে। মেয়র-সাহেবের ইঙ্গিতেই কিনা জানা যায় না, এই সময় হঠাৎ ছুটে এসে বাধা দিলেন 'সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশান অফ ক্রুয়েলটি টু এ্যানিম্যাল্‌স্'-এর কর্মকর্তা! কী ব্যাপার? ব্যাপার গুরুতর! মাহুত হাতীর মাথায় ডাঙশ মেরেছে!

কোথায় বাজি জিতবে, না মামলায় ফেঁসে গেল সার্কাসের মালিক। কিন্তু সেও ঘাসের বিচি খায় না। উল্টো মামলা আনল সে ও-পক্ষের বিরুদ্ধে। নাটক জমে উঠল। মামলা উঠল আদালতে। এ মামলাটি ইতিহাস-বিখ্যাত—কারণ S. P. C. A.-র আনা মামলায় বিবাদী পক্ষের ডিফেন্স-কাউন্সিলার

যখন তাঁর এক নম্বর সাক্ষীর নাম হাঁকলেন তখন পিলে চমকে গেল সকলের !
এক নম্বর সাক্ষী—মিস্ পিকানিনি !

উকিল বিচারককে বললেন, ধর্মাবতার, আপনার আদালত-ঘরের দরজা মাপে এত ছোট যে, আমার এক নম্বর সাক্ষী আদালতে প্রবেশ করতে পারছেন না। এ সমস্যার বিষয়ে আমি কোর্টের রুলিং চাইছি !

বিচারক আশঙ্কা করেননি এমন একটি অতিকায় সাক্ষীর সম্ভাবনা থাকতে পারে ; তবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ন্যায়াধীশ। মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না যেতে পারেন তখন পর্বতকেই বাধ্য হয়ে মহম্মদের কাছে এগিয়ে আসতে হয়। বিচারক নিজেই উঠে এলেন আদালত প্রাঙ্গণে। সামিয়ানা খাটিয়ে বসলেন তিনি জাঁকিয়ে। মোটা মোটা এক-গাছের খুঁটি পুঁতে তৈরী করা হল মজবুত সাক্ষীর মঞ্চ। তাতে উঠে দাঁড়াল এক নম্বর সাক্ষী, পিকানিনি। শুঁড় দিয়ে বাইবেল স্পর্শ করে শপথ নিল। হাতীর মাহুত তাকে শান্ত করবার জন্ত শুঁড়ে পায়ে হাত বুলাতে থাকে।

উকিল প্রশ্ন করলেন, তোমাকে মাহুত ডাঙশ মেরেছিল ?

পিকানিনি ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে জানাল, না !

—তোমার দৌড়াতে কোন কষ্ট হচ্ছিল ?

যথারীতি জবাব, না !

—তুমি কি আধঘণ্টায় তিন-মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতে ?

উপরে-নিচে মাথা নেড়ে পিকানিনির সাফ জবাব, হ্যাঁ !

—তার মানে, ঐ মেয়রটা একটা জোচ্চোর ?

এবারও পিকানিনি জানাল, হ্যাঁ !

ধসে গেল মামলার বনিয়াদ ! জুরী মহোদয়গণ সম্পূর্ণ একমত ! খালাস পেল মাহুত আর সার্কাসের মালিক ! বাদী পক্ষকে মিটিয়ে দিতে হল বাজির প্রতিশ্রুত টাকা। শুধু কি তাই ? আদালত এলাকায় যত কনফেকশনারির দোকান ছিল তাদের ভাঁড়ার হল বাড়ন্ত ! আদালতের শত শত দর্শক ছুটি-চারটি কেক-রুটি খাওয়াল পিকানিনিকে—তার মামলা জেতার পুরস্কার !

উপসংহারে পণ্ডিতজী বললেন, এটা হচ্ছে মাহুতদের একটা কৌশল। প্রায় ম্যাজিকের মত। প্রশ্ন করবার সময় যদি হাতীর শুঁড় স্পর্শ করা হয় তখন জবাব হবে—'হাঁ' ! যদি পা স্পর্শ করা হয় তখন জবাব হবে—'না' ! কুহুও এ খেলা নিশ্চয় শিখিয়েছে বড়ামাঈকে !

রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। হল কী ? কুহু কেন এ-জাতীয় উত্তর

সংগ্রহ করল তার বড়মাঙ্গীয়ের কাছ থেকে? ক্যুভিয়েকে প্রত্যাখ্যান করার এমন বক্রপন্থা নিল কেন সে?

পণ্ডিতজী বলেন, আপনি আমাদের 'মিত্রদেব'-এর মূর্তিটি দেখেননি। চলুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি সম্বন্ধে ক্যুভিয়ের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। মন্দিরে গিয়ে মূর্তিটি দেখে এটুকুই মাত্র বুঝল যে, এটি দেবীমূর্তি নয়। পাথরের খোদাই করা মূর্তি—পদ্মাসনে বসে আছেন এক দেবতা। তাঁর মাথায় মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ, কানে কর্ণাভরণ। দু'পাশে উড্ডীয়মান দুই গন্ধর্ব এবং উপরে একসারি অনুরূপ পদ্মাসন পুরুষমূর্তি, সংখ্যায় সাতটি।

ক্যুভিয়ে সরলভাবে প্রশ্ন করল, মিত্রদেব কিসের দেবতা?

পণ্ডিতজী বললেন, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন শুনেছি, তার ভিতর মিত্রদেব-এর নাম আমি পাইনি।

—তাহলে?

—আমার বিশ্বাস এটি বুদ্ধমূর্তি।

—বুদ্ধমূর্তি? কিন্তু ইতিপূর্বে কোন বুদ্ধমূর্তিকে এমন গহনা-পরা অবস্থায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!

পণ্ডিতজী খুশি হলেন, বলেন, আপনি হিন্দু না হয়েও যে প্রশ্নটি করেছেন সে প্রশ্ন অনেক হিন্দু দর্শনার্থী আমাকে করেননি। ভেরি পার্টিনেণ্ট কোশ্চেন। আমার ধারণা—এটি গৌতম বুদ্ধের মূর্তি নয়, আগামী-বুদ্ধ মৈত্রেয়র মূর্তি। ঐ মৈত্রেয় নামটাই অপভ্রংশে হয়েছে—মিত্রদেব।

পণ্ডিতজী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। গৌতম বুদ্ধের আগে ছয়জন বুদ্ধ এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আগামী-বুদ্ধ হচ্ছেন মৈত্রেয়। হিন্দুদের যেমন দশাবতারের নয়জন ইতিমধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, বাকি আছেন কল্কী,—তেমনি বৌদ্ধ-শাস্ত্রমতে আগামী যুগের বুদ্ধ হচ্ছেন মৈত্রেয়। যেহেতু তিনি এখনও অনাগত, তাই তিনি এখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। ফলে আটজন বুদ্ধের মধ্যে একমাত্র মৈত্রেয় বুদ্ধকে সালঙ্কাররূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ক্যুভিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গেল। বললে, আচ্ছা, এই ফাঁসি-শিকার নিয়ে যে কিংবদন্তীটা সেদিন শোনালেন—সেই সোমুত্তর-এর অলৌকিক উপাখ্যান, ওটা আপনি বিশ্বাস করেন?

পণ্ডিতজী অভ্যাসমত তাঁর চশমার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, ব্যারন ক্যুভিয়ে, আপনি কি বিশ্বাস করেন—কোন একজন মরমানুষ জলের পিপেতে

হাত দিলে জলটা মদ হয়ে যেতে পারে? কিংবা কোন কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করা মাত্র তার রোগ নিরাময় হয়ে যেতে পারে?

হ্যাভিয়ে লজ্জিত হয় না। উত্তরে বলে, যীসাস ক্রাইস্ট এবং গৌতম বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল কি ছিল না সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে আমি প্রশ্ন করছি —জীববিজ্ঞানী হিসাবে ষড়দন্ত হস্তীর অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন?

ওঙ্কারনাথজী বললেন, আসুন—আমার ঘরে এসে বসুন।

ঘরে ফিরে এসে পণ্ডিতজী বললেন, এবার বলুন কি বলছিলেন?

—বলছিলাম—আপনি জীববিজ্ঞানী হিসাবে ছয়-দাঁত-ওয়ালা হাতীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারেন?

সংক্ষেপে পণ্ডিতজী বলেন, পারি!

—অলৌকিক কাহিনীর অনুষঙ্গ হিসাবে নয়, ধর্মের এলাকায় নয়, বিজ্ঞানী হিসাবে—

পণ্ডিতজী বললেন, তার আগে বলুন তো, আপনি কি চার-দাঁত-ওয়ালা হাতীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন? এমন হাতী যার চারটে গজদন্ত আছে?

—না! কারণ এমন হাতীর অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না!

—জাস্ট এ মিনিট!—পণ্ডিতজী উঠে যান। আলমারি থেকে একটি বই বার করে এনে বলেন, পড়ে দেখুন—

বইটির নাম The Dynasty of Abu. বইটিতে লেখা ছিল—১৯৪৭ সালে কঙ্গোর অরণ্যে একজন শিকারী এমন একটি দুর্লভ হাতী শিকার করে-

ছিলেন যার চারটি বিরাট বিরাট গজদন্ত ছিল। এক একটি দাঁতের ওজন ছিল প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড। ঐ চারটি দাঁতসমেত তার মাথার কঙ্কালটা বর্তমানে
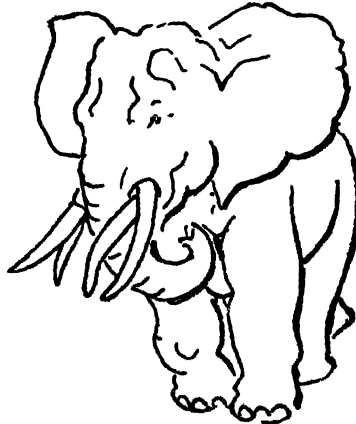
রাখা আছে ব্রাসেলস্ মিউজিয়ামে। চার-দাঁত-ওয়ালা হাতীর একটি ছবিও দেওয়া ছিল বইটাতে।

বিবরণটা পাঠ করে ক্যুভিয়ে বলল, এবার আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি চার-দাঁত-ওয়ালা হাতী ব্যতিক্রম হিসাবে বাস্তবে থাকতে পারে।

পণ্ডিতজী এবার আর একটি গ্রন্থ বাড়িয়ে ধরে বললেন, এটা পড়ে দেখুন এবার। ফোসবৌলের জাতকার্থনামা। এখানে ষড়দন্ত জাতক-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর এই দেখুন সেই হাতীর ছবি—অজন্তা গুহার চৈত্যে শিল্পীরা এঁকেছিলেন প্রায় দু'হাজার বছর আগে।

ক্যুভিয়ে হেসে বলল, মাপ করবেন পণ্ডিতজী। দুটো কি এক জিনিস?

—কেন নয়? আপনি যদি পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় চার-দাঁত-ওয়ালা হাতী মেনে নিতে পারেন, তবে ছয়-দাঁত-ওয়ালাই বা মানবেন না কেন? দুটোই ছাপা বই থেকে পড়ছেন, দুটোরই ছবি দেখছেন—
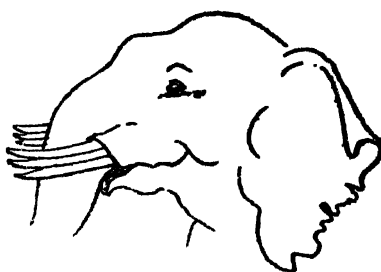
-কিন্তু অজন্তা-শিল্পী তো বাস্তবে ঐ হাতী দেখেননি, কল্পনায় দেখেছেন।

—চার-দাঁত-ওয়ালা হাতীর ক্ষেত্রেও তাই। শিকারীর সঙ্গে শিল্পী আফ্রিকার জঙ্গলে যাননি। তিনিও কল্পনায় ঐ দণ্ডায়মান হাতীটি দেখেছেন!

ক্যুভিয়ে কী যুক্তি দেখাবে ভেবে পেল না। এবার সে অন্যদিক থেকে আক্রমণ করল, আচ্ছা, আর একটা কথা। আপনাদের পূর্ব-পুরুষেরা কেন এভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে ফাঁসি-শিকারে যেতেন?

—আগে বলুন, প্রভু যীশু কেন স্বেচ্ছায় অতবড় ক্রুশকাষ্ঠটা বহন করেছিলেন?

পণ্ডিতজীর যুক্তি-তর্কের অবতারণা সেই সক্রেটিসের ধরনে। পণ্ডিতজী জবাব দিতেন প্রশ্নের মাধ্যমে।

ক্যুভিয়ে ওঁর প্রশ্নটা একটু তলিয়ে দেখে বুঝতে পারল এর মধ্যে হয়তো কোন নিগূঢ় সত্য আছে।

পণ্ডিতজী বলতে থাকেন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি ব্যারন-সাহেব, কিন্তু ঐ উপাখ্যানটিকে আমি উড়িয়ে দিতে পারিনি। শ্রদ্ধার সঙ্গে এ নিয়ম মেনে নিয়েছি। এ কাহিনী কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের কল্পনাবিলাস নয়, এটা আমাদের ধর্ম। মাইণ্ড য়ু—'ধর্ম', যার প্রতিশব্দ 'রিলিজন' নয়।

—তবে ধর্মের অর্থ কি?

—'মবি ডিক'-এর তিমি-শিকারীর কাছে তিমি-শিকার ছিল ধর্ম, হেমিংওয়ের বৃদ্ধের কাছে মৎস্য-শিকার ছিল ধর্ম—তাদের রিলিজন ছিল ক্রীশ্চানিটি।

—আপনার মতে তাহলে 'ধর্ম' কি জীবিকা?

—না! 'ধর্ম' হচ্ছে তাই, যা জীবনকে ধরে রাখে। পাশবৃত্তি মাত্রেই ধর্ম নয়, জৈবিক বৃত্তির 'জাস্টিফিকেশন' হচ্ছে 'ধর্ম'!

ঠিকমত অর্থগ্রহণ হল না ক্যাভিয়ের; কিন্তু সে নীরবে শুনতে থাকে। পণ্ডিতজীর মতে ওঁদের বংশের এই আদি-উপকথার উৎসমূলে আছে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। যে প্রস্তর-মূর্তিটি বংশানুক্রমিকভাবে ওঁদের দেব-দেউলে পূজা পেয়ে আসছে সেটি মহাযানী বৌদ্ধধর্মের। আর ঐ উপাখ্যানটির উপর ষড়দন্ত-জাতকের প্রভাবও নাকি অনস্বীকার্য। ছদ্দন্ত-জাতকেও সোনুত্তর ছিলেন কাশীশ্বরের মৃগয়াধিপতি—তাঁর হাতেই বোধিসত্ত্ব ষড়দন্ত-গজরাজ নিহত হয়েছিলেন। বস্তুত জাতক-কাহিনীর প্রথমাংশের সঙ্গে এই উপকথার প্রথম দিকটা একেবারে অভিন্ন—শেষের দিকে দুটি কাহিনী ভিন্নপথে মোড় নিয়েছে।

পণ্ডিতজীর ধারণা ওঁদের বংশের আদিপুরুষ ছিলেন একজন হস্তিশিকারী। কোন একজন বৌদ্ধ-অর্হতের প্রভাবে তিনি সদ্ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু জাত-ব্যবসা ছাড়তে পারেননি—সেটা যে বংশানুক্রমিক উপজীবিকা! তবু অহিংসা যাঁর পরমধর্ম তিনি হস্তিশিকারী থাকেন কেমন করে? কিন্তু দেশটা ভারতবর্ষ! এই ধর্মসহিষ্ণু দেশে সব সমস্যারই সমাধান খুঁজে পাবে। বড়গোঁহাই-পরিবারের আদিপুরুষ গুরুর কাছে আদেশ পেলেন—জাতব্যবসা তোমাকে ছাড়তে হবে না, কিন্তু অহিংসা যে পরমধর্ম এ সত্যও মনে-প্রাণে বুঝে নিতে হবে। বুঝব কেমন করে? বুঝবে ঐ জীবের সমতলে এসে দাঁড়ালে। বল্লম নয়, তীর-ধনুক নয়, দেহরক্ষীবাহিনী নয়—আসতে হবে নিরস্ত্র! সেদিন তুমি জমিদার নও, মালিক নও, মৃত্যুভয়কাতর মরণশীল জীবমাত্র! 'আমার হাতে পাশ, তোমার হাতে বজ্র'—এই সেদিন পূজার মন্ত্র! মৃত্যুভয় যে কী জিনিস তা সর্বদেহমনে অনুভব কর—বুঝে নাও ওদের দুঃখ—ঐ যারা নিত্য

তোমার লক্ষীর ভাঁড়ারে ধনসম্পদের যোগান দিয়ে চলেছে, মৃত্যু মুঠোয় নিয়ে—ঐ সব উলঙ্গ ফান্দিয়ার, ফাইদার, মাহুত, মাঝি, খিদমদ্গারের দুঃখ। জগতের প্রভু ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও যেমন একদিন কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ক্রুশকাঠ তেমনি করে নতমস্তকে তুলে নাও এই বৎসরান্তিক প্রায়শ্চিত্তের গুরুভার। এই হচ্ছে আদিপুরুষের নির্দেশ। বলছেন—এই তোমার ধর্মের অনুশাসন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার দম্ভে জীববিজ্ঞানী ওঙ্কারনাথজী এই অনুশাসনকে অশ্রদ্ধা করতে পারেননি।

বড়ুয়াকাকুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত ক্যাভিয়ে এসেছিল কাঠচেরাইয়ের গুদাম দেখতে। কুহু নিজেই তাকে নিয়ে এল বড়ামাঈয়ের পিঠে। গণেশ-দাদু আসেনি। সেদিন সেই পিকনিকের পর আর গণেশ-দাদু ক্যাভিয়ের কাছে আসছে না। বোধকরি কুহুর সঙ্গে তার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। কারণটা অনুমান করতে পারা যায়। কুহুর সেদিনকার দুঃসাহসিকতায় আহত হয়েছে বৃদ্ধ মাহুত। কুহু লেখাপড়া শিখেছে, কর্তামশায়ের আদরের মেয়ে; কিন্তু তবু সে তো মাহুতকন্যা! কোন্ আক্কেলে সে পরপুরুষের হাত ধরে চুইঘরে ঢুকল? এতে বুড়াবাবা অভিসম্পাত দেবেন না? মিত্রদেব ক্ষুণ্ণ হবেন না? অভিমান করতে পারে বটে গণেশ।

বড়ুয়াকাকু ওদের কারখানাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। প্রায় বিঘে আষ্টেক জায়গা মোটা মোটা শালের খুঁটি দিয়ে ঘেরা। গোটা দুই কাঠচেরাই-এর করাতকল বসেছে। ক্রমাগত গর্জন করছে তারা। ডাইনামো বসানো হয়েছে। বিদ্যুৎ-চালিত কল। একদিকে গাদা দেওয়া আছে কাঠের গুঁড়ি, অপর দিকে চেরাই করা কাঠ, বিভিন্ন সেকশান বিভিন্ন দিকে লাদ করা। জঙ্গল থেকে ক্রমাগত কাঠ আসছে লরী বোঝাই হয়ে—আবার চলেও যাচ্ছে শহরাঞ্চলে, গেট-পাশ দেখিয়ে।

অফিসঘরে ওদের আপ্যায়ন করে বসিয়ে বড়ুয়াকাকু চায়ের ফরমায়েশ করলেন।

কুহু প্রশ্ন করে, চন্দনের কথা সেদিন কি বলছিলেন যেন?

বড়ুয়াকাকুর রুদ্ধ আক্রোশের লকগেট খুলে গেল। অনর্গল অভিযোগের বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম হল কুহুর। চন্দন সময়ে আসে না, যখন তখন চলে যায়, কাজে মন নেই, ধমক দিলে হাসে। ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

—কই ডাকুন তো ওকে!

বড়ুয়াকাকুর আদেশে একজন ওকে ডেকে নিয়ে এল। একটা কাঁচা পেয়ারা চিবাতে চিবাতে এসে দাঁড়াল আসামী। তার ভঙ্গিতে বেশ একটা ঔদ্ধত্য। বললে, কি হল আবার? ডাকছিলেন কেন?

কুহু ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, উনি ডাকেননি, আমি ডাকছিলাম।

—ও! তা কেন?

—পেয়ারা খাচ্ছ কেন অমন অসভ্যের মত?

একগাল হাসলে লোকটা। বললে, পেয়ারা বুঝি কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে হয়?

আপাদমস্তক জ্বলে গেল কুহুর। বললে, ফেলে দাও বলছি! ফেলে দাও—

পেয়ারাটার যে অংশটুকু ওর হাতে ধরা ছিল তা নিতান্তই ভগ্নাংশ। ফেলে দিল সেটা। মাটিতে নয়, মুখ-বিবরে।

- তুমি কাজ ফেলে রেখে কোথায় যাও?

—যাই না তো কোথাও!

—আজ সকাল বেলা বারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলে? কারখানায়?

—না তো! অন্য কাজ করছিলাম।

—কী অন্য কাজ? কে বলেছে সে কাজ করতে?

—কি কাজ সেটা আপনাকে বলতে পারব না। তবে কাজটা দিয়েছেন মালিক নিজে!

—কী কাজ তা বলবে না?

—না। আপনাকে বলা বারণ। মালিককে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

রাগে ফুলছিল কুহু। লোকটা একগাল হেসে বললে, এবার যাই মেমসাহেব? অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে!

কুহু উঠে দাঁড়ায়। বলে, শোন! তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম। কাল থেকে আর এখানে আসবে না। বুঝেছ?

—বুঝেছি! একেবারে শনিবারে আসব হপ্তা নিতে।

বড়ুয়াকাকুর দিকে ফিরে বলে, আপনি যেন আবার মাইনে-কাইনে কাটবেন না স্যার। পুরো হপ্তার মাইনে শনিবারে এসে নিয়ে যাব। মেমসাহেব আমার ছুটি নিজে মঞ্জুর করে গেলেন।

এর কী জবাব?

লোকটা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, ভালকথা মনে প'ল। মেমসাহেব! আপনি অমন হাতীর শুঁড়ে পা দিয়ে ওঠা-নামা করবেন না। দড়ির মই আছে, তাই বেয়ে—

কথাটা তার শেষ হল না। হঠাৎ এক পা এগিয়ে আসে কুহু। ঠাস করে ওর গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসে। লোকটা এজন্য নিশ্চয় প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সামলে নিল সে মুহূর্তে। ঠিক একই সুরে শেষ করল তার বক্তব্য, দড়ির মই বেয়ে ওঠা-নামা করবেন। হাজার হ'ক আপনি তো মেমসাহেব। না হলে উল্‌টে পড়বেন কোন দিন। বুঝলেন ?

ধীরে-সুস্থে বার হয়ে গেল চন্দন।

বড়ুয়াকাকু বললেন, মালিক ফিরে এলে এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটা একেবারে অসহ্য !

কুহু দৃঢ়স্বরে বলে, না। ওকে কাল থেকে ঢুকতে দেবেন না। আজ পর্যন্ত হাজিরা দিয়ে বিদায় করে দেবেন।

—কিন্তু ও যদি মারধোর শুরু করে ?

—কী বলছেন আপনি ? আপনার এখানে বিশ-ত্রিশজন লোক আছে না !

এরপর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে কি কি করণীয় আছে তার নির্দেশ দিল কুহু। অনেকক্ষণ আলোচনা হল এ বিষয়ে। চা-পানান্তে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। তিনজনে এগিয়ে গেলেন বড়ামাঈয়ের দিকে। দড়ির মই বেয়ে ক্যাভিয়ে উঠে গেল। কুহু হাতীর শুঁড়ে পা দিতে যাবে—অমনি ওপ্রান্ত থেকে কে যেন বলে উঠল,—আ-হা-হা। মেমসাহেব। পড়ে যাবেন। আমি বারণ করছি !

কুহু ঘুরে দাঁড়ায়। ওখান থেকে প্রায় হাত দশেক দূরে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চন্দন। তার হাতে একগাছা দড়ি। কুহু কি একটা কথা বলতে গেল, বলল না। বড়ামাঈয়ের শুঁড়ে একটা থাবড়া মারল। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বড়ামাঈ শুঁড়টা এগিয়ে দিল—কুহু তার উপর রাখল তার ডান পা-টা।

আর তখনই ঘটল ঘটনাটা।

ক্যাভিয়ে তখন হাতীর পিঠে বসে, বড়ুয়াকাকু মাটিতে আর কুহু সবে উঠবার উপক্রম করছে। শূন্যপথে একটা দড়ির ফাঁস ঘুরতে ঘুরতে এল। গলে পড়ল কুহুর মাথা দিয়ে—টান পড়ল দড়িতে। কুহু সঙ্গে সঙ্গে নাগপাশে বন্দী। চলৎ-শক্তি হীন ! সকলে স্তম্ভিত। দড়ির অপরপ্রান্ত ধরা আছে চন্দনের হাতে।

দুরন্ত ক্রোধে কুহু ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটা একগাল হেসে বললে, পড়ে যাবেন বললাম না ? ছিঃ ! কথা শুনতে হয় ! ঐ সাহেবের মত দড়ির মই বেয়ে উঠুন।

কুহু চীৎকার করে উঠে, এই, ধর তো তোরা বদমাশটাকে !

আদেশ মাত্র পাঁচ-সাতজন জোয়ান ছুটে যায় চন্দনের দিকে। লোকটা বিদ্যুৎগতিতে তুলে নেয় তার তীর-ধনুক। সেও চীৎকার করে ওঠে, খবর্দার!

লোকগুলো চকিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। অব্যর্থ-সন্ধানী চন্দন-সর্দারকে ওরা হাড়ে হাড়ে চেনে। লোকটা দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, গোঁয়ার। অনায়াসে সে আক্রমণকারীদের একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতে পারে!

ক্যাভিয়ে লক্ষ্য করে দেখল লোকটা এদিকে ফিরেই এক-পা এক-পা করে পিছু হটছে। তার বাঁ-হাতে ধনুক আর সেই ধনুকে লাগানো তিন-তিনটে তীরের প্রান্ত ধরা আছে ডান হাতে। ও কি একসঙ্গে তিনটে তীর ছুঁড়তে পারে? ক্যাভিয়ে তা জানে না; জানে তার সহকর্মীরা।

কুহু ততক্ষণে খুলে ফেলেছে তার নাগপাশ, কিন্তু তার আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ঐ দুর্ধর্ষ পাগলটা। অরণ্যের প্রাণী মিশে গেছে অরণ্যে!

ক্যাভিয়ে হিসাব করে দেখল এক মাসের উপর সে এসেছে। আর থাকা ভাল দেখায় না। লালচাঁদজীর সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা কম। বেশ বোঝা যায় তিনি পুরোপুরি অরণ্যচারী হয়ে গেছেন। হয়তো ঘনঘোর বর্ষার আগে তিনি ফিরবেন না। সভ্যজগতে কেউ তাঁর সংবাদই রাখে না। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করেই বা কি হবে? গজমুক্তার অস্তিত্ব? সেটার সত্যতা যাচাই করে কি লাভ হবে ক্যাভিয়ের! বস্তুত এ অরণ্যদেশে এক গজমুক্তার আকর্ষণে এসে সে অন্য এক গজমুক্তার মোহে আটকে পড়েছিল। সে মোহ তার ছুটে গেছে। বিশ বছরের ব্যবধানটা দুরতিক্রম্য। কী চমৎকার কৌশলে এই অপ্রিয় সত্যটা বুঝিয়ে দিল কুহু। বলল না—আমি আজও লুকোচুরি খেলতে ভালবাসি, বলল না—নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার খেয়াল আমার আজও আছে, অথচ তোমার সে বয়স নেই। তোমাকে এখন 'দিনে দিনে টানিছে কে নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে'। ঠিক তাই। ক্যাভিয়ের প্রয়োজন এ দুনিয়ায় শিথিল হতে শুরু করেছে—তাই কুহু এঁকে দিল তার ললাটে বর্জনের ছাপ।

গুছিয়ে নিল জিনিসপত্র। এবার নোঙর তুলতে হবে।

না। অভিমান নেই কোন। এই ঠিক হয়েছে। এই ভাল হয়েছে। ক'দিনের মধুর স্মৃতি নিয়ে সে ফিরে যাবে নিজের দেশে। এখানকার ঐ মাহুতদের জীবনের গল্প, ঐ মিত্রদেব, বুঢ়াবাবা, এই স্বচ্ছতোয়া গদাধর আর চুইখরের পরিবেশ অক্ষয় হয়ে থাকবে তার স্মৃতিতে। স্মৃতি যখন ঝাপসা হয়ে আসবে তখন উল্টে দেখবে তার ফটো এ্যালবাম। হাজার হাজার মাইল দূরে

নির্বান্ধব ঘরে পর্দা টাঙিয়ে সে আবার দেখবে তার মূর্তি ক্যামেরায়—কুহু হাতীর শুঁড়ে পা দিয়ে উঠছে, বনভোজনের আসরে রান্না করছে—দেখবে, এখানকার অরণ্যচারীদের।

শোনা গেল চন্দন সেই যে চলে গেছে তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ। তার সংসার বলতে কিছু ছিল না। একা মানুষ, এসেছিল জঙ্গল থেকে, নিশ্চয় ফিরে গেছে সেখানেই। অদ্ভুত লোকটা কিন্তু। কেন সে এসেছিল এখানে? কি চেয়েছিল সে?

যাবার জন্য প্রস্তুত হল ক্যাভিয়ে, কিন্তু যাওয়া তার হল না।

পরদিন এল একটা অদ্ভুত সংবাদ।

বড়কেন্দুলিয়া গ্রাম থেকে এক পত্রবাহক এসে পৌছল গৌড়পুরে। চিঠির প্রাপক চন্দন আর প্রেরক স্বয়ং লালচাঁদ বড়গোহাই। সে-চিঠি খুলে ফেলল কুহু। সংক্ষিপ্ত পত্র। কর্তামশাই চন্দনকে সংবাদ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে সে যেন বড়ামাঙ্গীকে নিয়ে বড়কেন্দুলিয়ায় মিলিত হয়। লালচাঁদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—তাঁর জীবনের শেষ ফাঁসি-শিকারে যাবেন তিনি। এবার তিনি সাকরেদ, ফাঁসিয়াড় হবে চন্দন। আশা করেছেন, এতদিনে চন্দন নিশ্চয় গণেশ-সর্দারের তত্ত্বাবধানে পাকা ফাঁসিয়াড় হয়ে উঠেছে।

খবরটা দিয়ে গেল কুহু নিজেই! চিঠিখানাও দেখাল।

এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রই তাহলে হচ্ছিল এতদিন! এজন্যই চন্দন ছিল কর্তামশায়ের পেয়ারের লোক। আর আশ্চর্য মানুষ ঐ গণেশ-সর্দার—এতবড় খবরটা সে বেমালুম চেপে আছে কর্তামশায়ের আদেশে!

গণেশ-সর্দারের কাছে কুহু কোন কৈফিয়ৎ চাইল না। ক্যাভিয়েকে শুধু বললে, আমি আজ বড়কেন্দুলিয়া যাব। আপনি যাবেন?

মুহূর্তে মত বদলে গেল ক্যাভিয়ের। বললে, নিশ্চয়!

গণেশও যেতে চেয়েছিল। রাজী হল না কুহু।

বড়কেন্দুলিয়া এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। ভোর-ভোর রওনা হলে সন্ধ্যের আগেই পৌছবে সেখানে। সেই রকমই ব্যবস্থা হল। ক্যামেরা আর বন্দুক নিয়ে ভোর-রাতে উঠে ক্যাভিয়ে হাজির হল। রওনা হল ওরা। খবরটা পণ্ডিতজীকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন শুধু।

এই দীর্ঘ অরণ্যপথের কথাটাও ক্যাভিয়ে কোনদিন ভুলবে না। মহা অরণ্যের গভীরে একটি পুরুষ আর একটি রমণী—আর একটি পোষা হাতী। ত্রিসীমানায় জনপ্রাণী নেই। দুঃসাহসী বলতে হবে কুহুকে। অনেক আধুনিকাই এ

দুঃসাহস দেখাতে রাজী হবে না। কথাটা বলেও ফেলল ক্যাভিয়ে, এভাবে যেতে ভয় করছে না আপনার ?

—ভয় করবে কেন ? বসে আছি হাতীর পিঠে। আপনার হাতে বন্দুক। বন্যজন্তুরা এদিকে আসবেই না !

—কিন্তু আমিও তো হঠাৎ বন্যজন্তু হয়ে উঠতে পারি ?

কুহু একটু অবাক চোখে তাকায়। তারপর খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে, আপনি তো জংলী নন ! আপনি যে সভ্য মানুষ ! আপনার বিবেক আপনার ভদ্রতাজ্ঞান আমাকে বাঁচাবে !

—কিন্তু তুমিই তো সেদিন বলেছিলে—আমি তোমাকে 'সিডিউস্' করতে চেয়েছিলাম !

মুচকি হেসে কুহু বলে, বলেছিলাম নাকি ? তাহলে ভুল বলেছিলাম। আপনি সে জাতের মানুষ নন। তাহলে তো সেদিন চুইঘরেও আপনি বর্বর হয়ে উঠতে পারতেন।

ওরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌছল সূর্যাস্তের আগেই।

গ্রামপ্রান্তে একটা চালাঘরে শুয়ে ছিলেন লালচাঁদ। তাঁর সামনে একটা মাটির কলসী আর নারকেল মালা। উৎকট একটা গন্ধ। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে ছোটামাঈ—সারিন। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য কর্তামশায়ের পদসেবা করছে চন্দন ! চিঠি সে পায়নি, কিন্তু এসে জুটেছে ঠিকই।

তাকে দেখে নিথর হয়ে গেল কুহু। সারাদিনের হাসিখুশি মেয়েটি একেবারে বদলে গেল। বেশ বোঝা যায়—যে সঙ্কল্প নিয়ে সে এগিয়ে এসেছিল তার বনিয়াদটাই ধ্বসে গেছে। চন্দন নিরুদ্দেশ—এ সংবাদটাই লালচাঁদকে নিবৃত্ত করার পক্ষে ছিল ব্রহ্মাস্ত্র—এখানে এসে কুহু দেখল তার ব্রহ্মাস্ত্রটা ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে তার প্রতিপক্ষের তূণে।

—এ কে ?—উঠে বসেন লালচাঁদ।

কুহু সংক্ষেপে ক্যাভিয়ের পরিচয় দিল। ক্যাভিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল।

লালচাঁদ বললেন, বস।

প্রথমেই 'তুমি' সম্বোধন। বিনা দ্বিধায়। বসল ক্যাভিয়ে একটা কাঠের উপর। লালচাঁদ বললেন, ফাঁসি-শিকার দেখতে এসেছ ? বেশ, দেখে যাও। আজ ভোর-রাতেই যাব সেখানে। তোমাদের দুজনকে এখানে থাকতে হবে। বুনো হাতীর দলটা আছে এখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। সেখানে তোমাদের

যাওয়া হবে না। তবে হাতীটাকে ধরার পরেই তোমাদের খবর পাঠাব। তোমরা তখন যেও।

কুহু বললে, তার প্রয়োজন হবে না। আমি এখনই ফিরে যাব। শুধু এখান থেকে নয়, গৌড়পুর থেকে। আমি চলে যাচ্ছি। সে কথাটাই তোমাকে জানাতে এসেছিলাম।

লালচাঁদ অবাক হয়ে বলেন, কোথায় যাচ্ছিস তুই?

মর্মভেদী দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে কুহু বললে, কোথায় যাব তা তো তোমাকে জানিয়ে যাব না। তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি।

—মুক্তি! কিসের থেকে মুক্তি?

—মৃত্যুশয্যায় আমার মাকে দেওয়া তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে।

এবার সোজা হয়ে উঠে বসেন লালচাঁদ। কঠিন স্বরে বলেন, পাগলামি করিস না মামণি!

কুহু কঠিনতর স্বরে বলে, পাগলামি আমি করছি? তোমার পাগলামিতে আমার মা ঘর ছেড়েছিলেন। সে পাগলামি বন্ধ করেছিলে তুমি, তাই আমিও গৌড়পুরে ছিলাম তোমার মেয়ের পরিচয়ে। আজ আবার সেই পাগলামি শুরু করেছ তুমি। তাই মায়ের ভূমিকাটাই আমাকে নিতে হচ্ছে। তুমি আজ যদি ফাঁসি-শিকারে যাও আমিও চলে যাব যেদিকে দু' চোখ যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন লালচাঁদ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। তারপর বললেন, মামণি, তুই কি শুধু লক্ষ্মীর মেয়ে? পুণ্ডরীকের মেয়ে নস্?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল কুহু, তাঁর মৃত্যুর কথা কি তুমি ভুলে গেছ বাপি? কী মর্মান্তিক মৃত্যু! কী ভীষণ মৃত্যু! তাঁর নাম করেই আমি তোমাকে শেষবার মিনতি করছি—এই বুড়ো বয়সে তুমি এ-কাজ করতে যেও না!

—বুড়ো? না রে! তা দু' কুড়ি পনের বয়স হল বইকি! এই বয়সেই শেষ শিকারে এসেছিলেন আমার বাবা—সূর্যকান্ত বড়গোহাই। আমারও এটা জীবনের শেষ শিকার। এর পর থেকে চন্দন হবে ফাঁসিয়াড়, সাবরেদ ও জোগাড় করে নেবে—কি বলিস চন্দন?

চন্দন কোন জবাব দিল না। দিল কুহু, বললে, তার মানে তোমার বংশের ধারা তো এমনিতেই লুপ্ত হয়ে গেল। চন্দন তোমার বংশের কেউ নয়!

হাসলেন লালচাঁদ। বললেন, সে কথাও ভেবেছি রে আমি! না মামণি, তোর ভয় নেই—আদি পুরুষের সেই নির্দেশ আমাদের বংশে শেষ হবে না।

বড়দার ছেলেরা শহরে হয়ে গেল। মেজদা বিয়ে করল না—কিন্তু আমি সে ধারাকে বাঁচিয়ে রাখব। আমার সন্তান সে ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবে!

স্তম্ভিত হয়ে যায় কুহু। অস্ফুটে শুধু বলে, তোমার সন্তান? মানে?

—চন্দনকে আমি দত্তক নেব। বলভদ্র রাজী হয়েছে। ও হবে আমার বংশধর—চন্দন বড়গোঁহাই!

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কুহু নির্বাক বিস্ময়ে। তারপর দুরন্ত অভিমানে স্থান ত্যাগ করল সে। ছুটে বেরিয়ে গেল অরণ্যে।

লালচাঁদের কোন ভাবান্তর হল না। ক্যুভিয়েকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাঁধে ওটা কি? ক্যামেরা?

ক্যুভিয়ে সে কথার জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, আপনি গজমুক্তা কখনও স্বচক্ষে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি। এক লক্ষ হস্তীর মধ্যে একটি হয় ঐরাবৎ শ্রেণীর, এক লক্ষ ঐরাবতের মধ্যে একটির মাথায় জন্মায় গজমুক্তা! দেখবে তুমি?

—দেখাতে পাবেন?

—দেখাব!

অন্ধকার ঘনিয়ে এল ক্রমে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী। বেশ রাতে চাঁদ উঠবে। সমস্ত অরণ্য এখন ঘন অন্ধকারের যবনিকায় অবলুপ্ত। আজও আকাশ মেঘলা। গুমট গরম। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে, হয়নি এখনও। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না একটাও। মুঠো মুঠো জোনাকী জ্বলছে।

ক্যুভিয়ে বলে, কুহু দেবী কোথায় গেলেন খোঁজ নেওয়া উচিত নয় কি?

—যাবে আবার কোথায়? এইটুকু তো গ্রাম। বিশ-বাইশ ঘর আদিবাসীর আস্তানা। আছে কারও ডেরায়। ভারি অভিমানী মেয়েটা। রাগ পড়লে আপনিই আসবে। চন্দন, তুই বরং সাহেবের থাকার ব্যবস্থাটা করে দে!

চন্দন টর্চ দেখিয়ে নিয়ে এল ওকে। পৌছে দিল একটা ছাপড়ায়। ছোট ঘর। তার ভিতর সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না। উপরে গোল-পাতার ছাউনি। আকাশে তারা থাকলে ঝাঁজরা ছাদের ভিতর দিয়ে বোধকরি তা দেখা যেত। বৃষ্টি হলে অঝোর ধারে জল পড়বে নিশ্চয়। ঘরের কোণে মাটির কলসীতে খাবার জল রাখা আছে। মেঝেতে খড়ের বিছানা। তাতেই শুতে হবে রাত্রে। আহারাদি কী জুটবে, আদৌ জুটবে কিনা বোঝা গেল না। তা না যাক, কিন্তু কুহু গেল কোথায়? বাধ্য হয়ে ঐ চন্দনকেই প্রশ্নটা করল ক্যুভিয়ে। ছেলেটা যেন টেপ-রেকর্ডার মেশিন। অম্লান-বদনে বলল ঠিক যে

ক'টা কথা তার কর্তামশাই একটু আগে বলেছেন : যাবে আবার কোথায় ? আছে কারও ফেরায় ! এইটুকু তো গ্রাম !

চন্দন তার প্রভুর বাছে ফিরে গেল।

ক্যুভিয়ে ক্যামেরা আর বন্দুকটা নামিয়ে রাখল। এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে কেমন যেন বিবেকে বাধছিল তার। টর্চটা হাতে নিয়ে বার হল পথে। ইতিমধ্যে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। একটু ঘোরাঘুরি করে বুঝল এ নিতান্তই অরণ্যে রোদন। এই গাঢ় অন্ধকারে মেয়েটিকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। আবিষ্কার করল বড়ামাঈকে। সে দাঁড়িয়ে আছে সারিনের কোল ঘেঁষে। তার মানে কুহু ফিরে যায়নি। যাওয়ার কথাও নয়। যাবার আগে সে অন্তত ক্যুভিয়েকে একটা খবর দেবে।

ঘরে বাতি নেই। টর্চটা নিবিয়ে দিলে নীরন্ধ্র অন্ধকার। কিন্তু উপায় নেই। সারারাত টর্চ জেলে তো আর থাকা যায় না। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল ক্যুভিয়ে। এমন অবস্থায় সে ইতিপূর্বে কখনো যে রাত কাটায়নি তা নয়। বন্যজন্তুর ভয় নেই। পাশেই শোয়ানো আছে তার লোডেড রাইফেল। একমাত্র ভয় সাপের। কিন্তু কি আর করা যাবে ? আহার জোটার কোন সম্ভাবনা নেই। কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে দেখে কোন গ্লাস নেই। কলসীটা চাপা দেওয়া ছিল একটা নারকেলের মালায়। তাতে করেই জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। আজ রাতে আর কিছু করণীয় নেই। কাল সকালে উঠে যা হয় করা যাবে। রাতটা ভালয় ভালয় কাটলে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিল শরীর। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই। মাঝরাতে হঠাৎ মনে হল কি একটা জন্তু ওকে জড়িয়ে ধরেছে ! লোম-ওয়ালা একটা ভালুক যেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ক্যুভিয়ে। হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা ধরতে যায়। ঠিক তখনই বুঝতে পারে—লোম নয়, ওটা মাথার চুল। কুহু এসেছে অন্ধকারে। গলাটা জড়িয়ে ধরেছে ওর !

—তুমি ! কী ব্যাপার ?

কুহু ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে, চুপ ! শব্দ কর না। ওঠ ! চল, পালাতে হবে।

—কেন ? কী হয়েছে ?

হাত বাড়িয়ে টর্চটা জেলে ফেলে। আলোর স্পর্শে কুহু সরে বসে। বলে, আমি…আমি খুন করেছি !

—খুন! কী বলছ তুমি?

টর্চের আলোয় নজরে পড়ে কুহুর ডান হাতের তালুতে রক্ত! তার কাপড়েও রক্তের ছোপ! পূর্ব-মুহূর্তে কুহুর বাহুপাশে যে অদ্ভুত অনুভূতিটা জেগেছিল সেটা নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। দুরন্ত আতঙ্কে ক্যাভিয়ে ওর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দেয়, বলে, কি হয়েছে? কাকে খুন করেছ? কেন?

—ঐ জানোয়ারটাকে! আমি···আমি কি করব? ও কেন আমার জামা ছিঁড়ে দিল, কেন অসভ্যের মত আমাকে—

স্তিমিত আলোয় নজরে পড়ে কুহু রীতিমত বিস্রস্তবাসা। তার চুল আলু-থালু। ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে ফালা-ফালা হয়ে। দেখা যাচ্ছে তার অধোবাস। হাতে, গায়ে, কাপড়ে রক্তের দাগ।

অতি সংক্ষেপে ঘটনাটা ব্যক্ত করল মেয়েটি। সে আশ্রয় নিয়েছিল আদি-বাসীদের একটা পরিত্যক্ত ঢেঁকিশালে। ঠিক খুঁজে খুঁজে চন্দন সেখানে হাজির হয়েছিল। তারপর কি ঘটনা ঘটেছে তা বিস্তারিত বলে নি কুহু; কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধা হল না। একটা ধস্তাধস্তি—নারী-মাংসলোলুপ একটা দুর্বৃত্ত-জোয়ানের আক্রমণ আর কুহুর আত্মরক্ষার প্রয়াস!

—চন্দন বেঁচে আছে? সে কোথায়?

—জানি না। আমার কাছে একটা ছোরা ছিল, সব সময়েই থাকে, অন্ধকারে সেটাই আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম। জানি না, কোথায় লেগেছে ওর! ছুটে বেরিয়ে গেছে···তারপর আমি এখানে চলে এসেছি! চল, আমরা পালিয়ে যাই···এক্ষুণি! ওরা জেগে ওঠার আগেই!

ক্যাভিয়ে বলে, কুহু! তুমি যা করেছ তাতে আইনের সমর্থন আছে। ভয় নেই। যে কোন মেয়ে নিজের শ্লীলতা রক্ষার জন্য ও কাজ করতে পারে! কিন্তু আমি ডাক্তার; আমি তো এভাবে পালাতে পারব না। আমাকে খুঁজে দেখতে হবে ওর কোথায় লেগেছে, কি করা উচিত!

কুহু ওর বাহুমূল চেপে ধরে। বলে, কিছু দেখতে হবে না তোমাকে। তুমি চলে এস। আমরা এক্ষুণি রওনা হব বড়ামাঈকে নিয়ে। শুনলে না—বাপি ওকে দত্তক নিতে চায়! বড়ামাঈকে নিয়ে আমরা যদি রাতারাতি পালিয়ে যাই তবেই উচিত শিক্ষা হবে ওদের। দু-দুটো কুম্‌কি ছাড়া ফাঁসি-শিকার হয় না।

—কিন্তু গৌড়পুরে ফিরে গেলে—

—ওখানে যাবই না! আমরা তো নিরুদ্দেশ হয়ে যাব! তুমি আর আমি!

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে ক্যান্ডিয়ে। তারপর বলে, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে বল তো?

—ঐ যেখানে বড়ামাঈ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই একটা অর্জুন গাছের নিচে একটা চালাঘরে।

—কী আশ্চর্য। আমি তো ওটা খুঁজে দেখেছি—

—জানি। তুমি যখন খুঁজতে গিয়েছিলে তখন আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি কি এইসব বাজে কথা বলেই সময়টাকে শেষ করবে? উঠে এস শিগ্‌গির। চল, এখনি পালাতে হবে।

এতক্ষণে মনঃস্থির করেছে ক্যান্ডিয়ে। বলে পাগলামি ক'র না কুন্থ। রাত শেষ হবার আগে কোথাও যাব না আমি। এখানে তোমার রাত কাটানো ঠিক নয়। যেখানে ছিলে সেখানেই গিয়ে বাকি রাতটুকু অপেক্ষা কর। ছোরা তো তোমার সঙ্গেই আছে। কাল সকালে লালচাঁদজীকে বলে আমরা ফিরে যাব। কাল দিনের আলোয় আর একবার বরং বড়ামাঈকে জিজ্ঞাসা করে দেখ আমাকে বিবাহ করাটা তোমার পক্ষে উচিত হবে কি না।

কুন্থ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, ভোররাত্রে ওরা তাহলে ফাঁসি-শিকারে যাক?

—না। সেটা আর এখন সম্ভব নয়। চন্দন যদি বেঁচে থাকে তবে তার পক্ষে আজ ভোররাত্রে শিকারে যাওয়া অসম্ভব। তুমি যাও এবার।

—যাচ্ছি। যাচ্ছি।—উঠে দাঁড়ায় কুন্থ। কিছু একটা কথা বলতে যায়। শেষ পর্যন্ত বলে না। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়।

হাত-ঘড়িতে দেখে রাত তখন সাড়ে বারোটা। আকাশের মেঘলা ভাবটা কেটেছে। দু-একটি তারা ফুটেছে আকাশে। চাঁদ তখনও ওঠেনি। উঠেছে হাওয়া। গাছ-পাতায় সর-সর শব্দ হচ্ছে। বহু দূরে কী একটা জন্তু ডেকে উঠল—শেয়াল, না হায়েনা? ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে একটানা।

আর ঘুম এল না কিছুতেই। ওর কি উচিত ছিল চন্দনকে খুঁজে দেখা? তা কেন? চন্দন জানে সে ডাক্তার, জানে—কোথায় রাত কাটাচ্ছে সে। প্রয়োজনবোধে চন্দনই তো আসবে তার কাছে! হেঁটে চলে বেড়াবার মত ক্ষমতা তার আছে, না হলে কুন্থর ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারত না।

কুন্থকে কি প্রত্যাখ্যান করেছে সে? না, তা করেনি, কিন্তু জাঁ ক্যান্ডিয়ে আজ আর ছেলেমানুষ নয়। উত্তেজনার বশে একটা হঠকারিতা করে বসার

মত্ত বয়স আর নেই তার। কুহু আজ দেহেমনে উত্তেজিত। লালচাঁদের কাছে আঘাত পেয়েছে, পেয়েছে চন্দনের কাছে। সম্ভবত সেই তাড়নায় সে ছুটে এসেছিল ওর কাছে—জখম-হওয়া জাহাজ যেমন বাছ-বিচার না করে নিকটতম বন্দরে নোঙর ফেলতে ছুটে আসে। কুহুকে সে বাকি রাতটুকু তার নিজের ঘরে আশ্রয় দিতে পারেনি। ঠিকই করেছে। সাময়িক উন্মাদনায় কুহু যা করতে চেয়েছিল তাতে ক্যাভিয়ের সায় দেওয়া সম্ভবপর নয়। রাত পোহালে শান্ত-সমাহিত চিত্তে কুহু যদি ওকে গ্রহণ করতে রাজী থাকে তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? কিন্তু তাই বলে ও চায় না অপরিণামদর্শী একটি মেয়ের স্নায়বিক উত্তেজনার সুযোগে তাকে এভাবে বাধ্য করতে। একটি রাতের মর্যাদার জন্য ঐ সবলা গ্রাম্য মেয়েটি সারা জীবন হা-হুতাশ করুক এটা ক্যাভিয়ের বরদাস্ত হবে না।

প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। চাঁদ উঠল আকাশে। গোল-পাতা-ছাওয়া আদিবাসীদের একটি ঘরের ভিতর কেটে গেল একটা অবাক রাত। দরজায় ঝাঁপ নেই। একমুঠো অরণ্যের আভাস ধরা পড়েছে প্রবেশ-পথের ফ্রেমে। একসারি প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি গাছ। রাতচরা একটা পেঁচা মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করছে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে—ঝিঁঝি পোকাটা হয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা স্থান ত্যাগ করেছে, কিংবা কে জানে হয়তো ঐ পেঁচাটার উদরে প্রবেশ করেছে এতক্ষণে।

আবার হাতঘড়িতে সময়টা দেখল। রাত সাড়ে চারটে। কী খেয়াল হল ক্যাভিয়ের—উঠে পড়ল। বন্দুকটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে হাতে তুলে নিল টর্চটা। স্থির করল—এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে আর থাকবে না। উঠে গিয়ে বসে থাকবে বনের একেবারে মাঝখানে। রাত্রির বুক চিরে এই অরণ্যের একান্তে কেমন করে প্রভাত জেগে ওঠে তার রূপটি দেখবে। সে একটা ভারি অদ্ভুত অনুভূতি। তিল তিল করে ফর্সা হয়ে আসে পূবের আকাশ। টুপটাপ করে তারাগুলো ডুবে যায় আলোর বন্যায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় কোন পাখির। ডাক দেয় সে আর পাঁচজনকে। অমনি কলকণ্ঠে সমস্ত অরণ্য রামকেলীতে মুখর হয়ে ওঠে। কুয়াশার কম্ফার্টার জড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তের গাছগুলো তখনও আলসেমি ভেঙে জেগে ওঠেনি. পুবপারের গাছের মাথায় মাথায় প্রথম আবীরের ছোপ! ভোরের একটা ফুরফুরে হাওয়া ফুলপটীতে প্রসাধন সেরে ফুলবাবুটির মত মনিং-ওয়াকে বার হয়। এ অনুভূতি সর্বাঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করেছে ক্যাভিয়ে—

বারে বারে—হিমাচল প্রদেশে, আফ্রিকায়। আজও সেই অনুভূতির স্বাদটি গ্রহণ করতে ইচ্ছে হল।

পায়ে পায়ে চলতে থাকে ঝরাপাত। মশ্‌মশিয়ে। হাতী দুটো আর দাঁড়িয়ে নেই। শুয়েছে। ওরা চব্বিশঘণ্টার ভিতর মাত্র ঘণ্টা তিনেক শুয়ে থাকে। বাকি সময় খাড়া দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কি খেয়াল হল। বাঁয়ে মোড় ঘুরল। ইচ্ছে হল দেখে যায় কুহুকে। সে কি ঘুমোতে পেরেছে বাকি রাতটুকু? যদি জেগে বসে থাকে তবে তাকেও ডেকে নেবে। যুগলে বরণ করবে আজকের প্রভাতটিকে। কাল রাতে বোঝা গেছে কুহুর মত পরিবর্তন হয়েছে। ক্যাভিয়েকে সে তার জীবনের ভোগে আমন্ত্রণ করতে চায়। সেদিন তো সে স্পষ্টই বলেছিল: 'সো হোয়াট?'—বিশ বছরের ব্যবধানটাকে মেয়েটি সেদিন আমল দেয়নি। এমন কিছু বুড়ো হয়ে পড়েনি ক্যাভিয়ে। তাছাড়া ওরা দুজনেই অরণ্যকে ভালবাসে—প্রকৃতিকে ভালবাসে। কুহুকে সুখী করবে সে। দরকার হয় আবার নতুন করে লুকোচুরি খেলবে—অসময়ে জলস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জীবনকেই শুধু নয়, যৌবনকে ফিরে পাবে সে ঐ মেয়েটির প্রেমের সঞ্জীবনীতে।

ঘরটি চেনাই ছিল। এরও প্রবেশ-পথে কোন ঝাঁপ নেই। দ্বারের কাছে এগিয়ে এল ক্যাভিয়ে। সন্তর্পণে টর্চটা জ্বালল, যাতে ঘুমন্ত কুহুর চোখে আলো না পড়ে। আর তখনই যেন প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল জাঁ ক্যাভিয়ে।

ছোট্ট ঘরটা। যে ঘরে ও এতক্ষণ শুয়ে ছিল তার চেয়ে বড় নয়। মেঝেতে এখানেও বিচালির বিছানা। আর সেই বিছানায় শুয়ে আছে কুহু। একা নয়—ওরা দুজন! কুহু আর চন্দন। দুজনেই ঘুমে অচেতন। জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে নিশ্চিন্ত আরামে। কুহুর গায়ে অধোবাসটা নেই, ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। চন্দনের কবাট-বক্ষের চাপে ওর কোমল বুকের পীনোন্নত কামনার যুগল-দুর্গ নিষ্পেষিত। রতিক্লান্তা রমণীর ঐ আশ্লেষ-শয়নের ভঙ্গিটায় প্রথমটা চমকে উঠেছিল ক্যাভিয়ে। তারপর একটা বেদনার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। কুহুর একটি নিরাবরণ বাহু হাতীর শুঁড়ের মত জড়িয়ে ধরেছে চন্দনের গলা। চন্দনের আহত হাতটা কুহুর পিঠে। হ্যাঁ, আহত হাতটা! তার বাহুমূলে সবুজ বুঁটিদার একটা ছিটের কাপড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেটা চিনতে ভুল হয়নি ক্যাভিয়ের। গতকাল সারাটা দিন ঠিক ঐ রঙের একটা ব্লাউজই যে সে দেখেছে দীর্ঘ পথযাত্রায় তার সঙ্গিনীর গায়ে।

টর্চের আলোটা নিবিয়ে দেয়। ঘনীভূত হয় অন্ধকার। পায়ে পায়ে ফিরে

আসে তার রুদ্ধ ঘরের নিঃসঙ্গ একান্তে। প্রভাতটা হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল— ব্যক্তিটাই যেন নিষ্প্রভাত।

ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর পড়ল। রাত সাড়ে এগারোটা। চৌরঙ্গী টেরেসের এ্যাপার্টমেণ্টে গল্প শুনছিলাম ড: ক্যাভিয়ের কাছে। এবার আমাকে উঠতে হবে। আমাকে ঘড়ির দিকে নজর দিতে দেখে বলে ওঠেন, অনেকটা রাত হয়ে গেল আপনার, নয়?

ভদ্রতার খাতিরে বলতে হল, হোক। বলুন আপনি।

ক্যাভিয়ে তার পানপাত্রের তলানিটুকু গলাধঃকরণ করে বলেন, গল্পের বাকিও নেই কিছু।

—সে কি? শেষ ফাঁসি-শিকারটা হয়েছিল কিনা তাও তো বলেননি এখনও।

—আচ্ছা, সংক্ষেপে শেষ করে দিই

সংক্ষেপেই শেষ করেছিলেন উনি।

চন্দনের আঘাতটা এমন কিছু মারাত্মক ছিল না। ফাঁসি-শিকার মুলতুবি রাখতে হয়নি। ভোররাতে ওঁরা দুজনে রওনা হয়ে গেলেন—

বাধা দিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছিলাম, কুহু যে আপনার সঙ্গে এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে—

উনিও আমাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, না, মঁসিয়ে সান্যাল। ভুল করছেন আপনি। সে কোন দিনই আমাকে কথা দেয়নি। বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর চুপ করে কী যেন ভাবেন। শেষে অনেকটা আপন মনেই যেন বলে ওঠেন, আঘাত আমি পেয়েছিলাম—অস্বীকার করব না। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি কুহু ঠিকই করেছিল। আমারই ভুল। আমার ধারণা হয়েছিল —অরণ্যকে আমরা দুজনে বুঝি একই দৃষ্টিতে দেখি, একইরকমভাবে ভালবাসি। কথাটা ঠিক নয়। আমি অরণ্যের বুকে সভ্যতার একটা ছোট্ট দ্বীপ বানাতে চেয়েছিলাম—অরণ্য-সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে চাইনি! আমার কল্পলোকের অরণ্য-কুটিরের অনুষঙ্গ হচ্ছে একটি জীপ, তার ভিতরে থাকবে ট্রানজিস্টার, ফ্রিজ, মুভি ক্যামেরা, বাইনো আর টেপ-রেকর্ডার। আমি বহিরাগতের মত অরণ্যে উপনিবেশ গড়তে চেয়েছিলাম।—আর ও ছিল অরণ্যের

ঘিরে বসেছে সবাই। একটু দূরে দূরে। হাওয়াটা যেন বন্ধ না হয়। কিছু করার নেই। সভ্য-জগৎ ওখান থেকে বহু দূরে। স্ট্রেচারে করে ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। মৃত্যুই এক্ষেত্রে মুক্তির একমাত্র পথ। শুধু এভাবেই এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

কুহু দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কোন শব্দ হচ্ছে না। শুধু পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে মাঝে মাঝে। লালচাঁদজী তাঁর বাঁ হাতখানা রাখলেন ওর খোঁপার উপর। তাতে ওর কান্নার বেগটা গেল বেড়ে।

হাত নেড়ে ক্যাভিয়েকে ডাকলেন। ক্যাভিয়ে ওঁর মুখের কাছে মুখটা আনল। বললেন, ইনজেকশান আছে? ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার? ঘুমের মধ্যে মরতে চাই।

ক্যাভিয়ে নিরুপায়ের মত মাথা নাড়ল। ডাক্তারী ব্যাগটা সে সঙ্গে আনেনি। মারাত্মক ভুল হয়েছে বলতে হবে। চন্দন একটা বড় গাছের পাতা দিয়ে ওকে বাতাস করছিল। মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিল। গ্রামের বাসিন্দারা সজলচোখে যুক্তকরে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—তাদের লালচাঁদ, তাদের দেউতা দেহ রাখছেন।

লালচাঁদ অস্ফুটে বললেন, তাহলে অন্তত ঐ রাইফেলটা দিয়ে—

শিউরে উঠল জাঁ ক্যাভিয়ে। সে যে অসম্ভব। ভাঙা শিরদাঁড়া নিয়ে উনি আর কোনদিন সোজা হয়ে উঠে বসতে পারবেন না। মৃত্যু অবধারিত। কমপক্ষে তিনঘণ্টার মধ্যেই—কিন্তু কে জানে হয়তো সারা রাত ঐ অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে হবে তাঁকে। তার চেয়ে অনেক—অনেক ভাল রাইফেলের নলটা ওঁর রগে লাগিয়ে ট্রিগার টেনে দেওয়া! কিন্তু ক্যাভিয়ে তো জংলী নয় সে যে সভ্য-জগতের প্রতিভূ।

হিক্কা উঠল একবার। একঝলক রক্ত বার হয়ে এল।

যাক, বাঁচা গেছে। ইণ্টারনাল হেমারেজ শুরু হয়েছে। তাহলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে! আঁচল দিয়ে কুহু মুছিয়ে দিল মুখটা। হঠাৎ কি খেয়াল হল লালচাঁদের। চোখের ইঙ্গিতে আবার ক্যাভিয়েকে ডাকলেন। আবার হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়ল ডাক্তার। কর্তামশাই হাসলেন। রক্তাক্ত হাসিটা। অস্ফুটে বললেন, গজমুক্তা।

আশ্চর্য। মৃত্যু-মুহূর্তেও তাঁর মনে আছে সে প্রতিশ্রুতির কথা।

ক্যাভিয়ে যেন প্রতিধ্বনি করল, গজমুক্তা?

অবশ ডান হাতটা তুলে উনি দেখিয়ে দিলেন ওঁর গিন্নিকে!

আকৈশোরের জীবনসঙ্গিনী বৃদ্ধা বড়ামাঈ। পাথরের মূর্তির মত সে স্থির হয়ে আছে। তার নরম তলপেটে দেহভার রক্ষা করে পড়ে আছেন লালচাঁদ। অবোধ জন্তুটা কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছে—তার মালিক তার প্রভু ওরই কোলে মাথা রেখে অন্তিম শয়ানে শুয়েছেন। কেমন করে সে যেন বুঝতে পেরেছে যে, তার বিন্দুমাত্র নড়াচড়া তৎক্ষণাৎ এ বিয়োগান্ত নাটকের শেষ যবনিকাপাত ঘটাবে। তাই সে তিলমাত্র নড়ছে না। ওর চোখের কোণে মাছি বসছে তবু সে কান নাড়াচ্ছে না।

লালচাঁদের কৈশোর যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব কেটেছে এরই সাহচর্যে। ওকে একদিন লালচাঁদের মা বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। লালচাঁদ তো শুধু ওর মালিক নন, তিনিই যে ওর স্বামী। আজ তারই কোলে মাথা দিয়ে সেই মালিক, সেই খেলার সাথী বিদায় নিচ্ছেন। তাই পাথর হয়ে গেছে বড়ামাঈ।

পাথর? না। পাথরের মূর্তি নয়। নিথর হয়ে পড়ে আছে বটে, কিন্তু ওর মুদ্রিত দু'চোখে নেমেছে জলের দু'টি ধারা। বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ছে মাটিতে। সেকি! হাতী কাঁদে? এমন নিঃশব্দে? এমন অঝোর ধারায়? কই, একথা তো জানা ছিল না।

জানবে কেমন করে? ঐ বৃহদায়তন কদাকার প্রাণীটাকে কোনদিন তেমন করে ভালবেসেছ, যে জানবে? এক লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনই হাতীর বিষয়ে উৎসাহিত হয়, আর ঐ এক লক্ষ হস্তীপ্রেমিকের মধ্যে একজনই তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শেখে। শুধু সেই জানতে পারে ওর গণ্ডকুম্ভই সেই অমৃতকুম্ভ। প্রেমের উৎসমুখে সে-অমৃতকুম্ভে জন্ম নেয় সুদুর্লভ স্বাতীর বেদন-বিন্দু। অমন মানুষের মৃত্যুতে সেই গণ্ডকুম্ভে বিনিসুতোর মালার বাঁধন খুলে যায়—ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে গজমোতির মালা—তাকেই তো বলি গজমুক্তা।